স্বর্গের আগের স্টেশন

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন । কলকাতা-৯

কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়

তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়কে

'স্বর্গের আগের স্টেশনটা কেমন ?

কলকাতার এত কাছে এত সুদূর সব জায়গা আছে তা না দেখলে—সেখানে না থাকলে বিশ্বাস হবে না। সব দেশেই সিমেণ্টে বাঁধানো জায়গা কম। বেশির ভাগটা মাটি। তাতে গর্ত থাকে। গর্তে সাপ থাকে। গাছে আতা ঝোলে। বর্ষায় কচু পাতা অঝোরে ভেজে। ট্রেন-ফেল মানুষ কলকাতা না গিয়ে জুতোর দোকানের বেঞ্চে বসে দই চিঁড়ের ফলার করে। অথচ দু-পা হেঁটে গেলেই বাড়ি।

ধরা যাক -এমন একটা জায়গা, কলকাতা থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে চল্লিশ মিনিট। লেভেলক্রসিংয়ের একদিকটায় ফাঁড়ি, ডাক্তারখানা, কাপড়কল, ডাকঘর, ছবিঘর, বাঁধাইখানা। আরেকদিকটায় গমকল, ধানের গোলা, খাল, কাঠের পোল, ইরিগেশনের বাঁধ।

দুটো দিকই কিন্তু খানিক এগিয়ে বড় বড় ধানকাটা মাঠের ভেতর হারিয়ে বসে আছে। সেখানে দিগন্তে সেই বনরাজিমালা—আসলে তাল নারকেলের মাথায় মেঘের পটি দেওয়া আকাশ। তার নিচে মাটির ঘর, খড়ের চাল। সে চালে হলুদ রংয়ের বুড়ো লাউ। বিচি রাখার জন্যে কাটা হয় নি। খোল দিয়ে গুবগুবি হবে।

এখানে হাসপাতালের নাম কলেজ। হাতুড়ে ডাক্তারের নাম বদ্যি। দুর্গা-পুজোর নাম বড় পুজো। গোহালে খয়াটে গাই। এঁড়ে বেশি। বাড়ির বউরা আর গাই সমানে পোয়াতি হয়। লোক বাড়ছে। গরু-বাছুর বাড়ছে। মাঠে ঘাস কম। ধান কম। গাদ সমেত তেলো তাড়ি খেয়ে তিরিশ বছরের জোয়ানের চেহারা পাকিয়ে যাচ্ছে। লিভার জখম। কাজ নেই। জমি নেই। উৎসব বলতে পঞ্চাননতলায় বোশেখ মাস জুড়ে হরিনাম।

অথচ চাহিদা সামান্য। খাটতে চাই। বর্ষা চাই। দুটো ধানচারা রুইতে চাই। গাইটা বাচ্চা দিয়ে দুধ দিক। পুকুরের মাছ বাড়ুক। বেগুনে যেন

পোকা না লাগে। কেরোচিন না হলেও আপত্তি নেই। তবে ক-ফোঁটা সর্ষের তেল খুব জরুরি। সরকার বাহাদুর একটা মিষ্টি জলের টিউকল বসিয়ে দিন। বাঁধের নোনা মাটি জল মিশিয়ে ফোটালেই নুন পাওয়া যাবে। হাঁড়ির তলানিতে। দৃশ্য বলতে চলে-যাওয়া ট্রেনের লেজ। আর আড়ে-বহরে এলানো মাঠের ওপর দিয়ে আগুপিছু দৌড়ন্ত বৃষ্টির কায়দা কাণ্ড।

জুতো পায়ে বাবুরা শহরে গিয়ে চাকরির ক্যাশ নিয়ে ফেরে। ভাগচাষীর কাছ থেকে ভাগের ধান পায়। ভালো ডাক্তার স্কুটার চড়ে। নিরাপদে বিয়োনের চুক্তিতে তুখোড় কম্পাউণ্ডার লেবার কেসের কলে যায়। বিয়ের বর মোজা পায়ে পাম্পসু গলায়। সারা স্টেশনের রিক্সা সাইকেল সেদিন তার ভাড়ায়। পঞ্চানন অপেরার বাজনদাররা দ্বিরাগমন অব্দি দম্পতির পেছনে নাছোড। ভালোমন্দ দুটো খেতে পাবে বলে।

পাতাল রেল, কমপিউটর, সত্যবদ্ধ অভিমান ইত্যাদির পনের মাইলের ভেতর এই আমাদের প্রাচীন মাটির ব্যাকরণ এবং ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ শোনে নি। রামকৃষ্ণদেবের কথা যাত্রায় আর ধান উঠলে সিনেমায় গিয়ে জেনেছে। অনেকেই ভিটের ভেতর মৃত্যুকে পোষে। বিষধরকে বড় একটা ঘাঁটায় না।

এখানেই খগেনকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। গায়ের রং ফর্সা। তখন গাঁয়ে টিউবওয়েল বসাচ্ছি। হাতে পয়সা নেই। পুরনো টিউবওয়েল তুলে বসিয়ে দিচ্ছিলাম। ফিলটার চাঁদা করে কিনে নিয়ে। জল নোনা। বার বার একটা লেয়ারে এতো বালি যে ফিলটার জখম। রাজনৈতিক দল বললো, শ্যামল বাঙাল ভোটে দাঁড়াবে।

বললাম, এটা তো রিজার্ভ সিট। গাঙ্গুলী দাঁড়াতে পারে না।

ওরা বললো, দিল্লীর জন্যে দাঁড়াবেন নিশ্চয়।

অত টাকা থাকলে তো মিষ্টি জলের ১২০০ ফুট টিউবওয়েল বসাতাম।

তাহলে আপনি সি. আই. এ.।

ভালো কথা। তাহলে তোমরা টিউকল বসাও।

সে আমরা বুঝবো। টিউকল বসানোয় আপনার স্বার্থ কি?

আমার ভালো লাগে।

নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।

চুপ করে রইলাম। গাঁয়ে যাদের কিছু নেই তারাই আমার সমর্থক।

তারাই খগেনকে এগিয়ে দিল। এ সত্যবাদী লোক। রাতে পাইপ পাহারা দেবে।

তখন এক দঙ্গল ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুরের সঙ্গে উঠি বসি। ঘড়িচাঁদ, ভবেন, শরৎ, পালান, পঞ্চানন, হাজরা, বেচো, ঘটি, নাড়ু, বজরা, কালো—আরও কত নাম। এদের না আছে গায়ে দেওয়ার জামা। না আছে পয়সা। একসঙ্গে চিতি কাঁকড়া ভাজা, তাড়ি, মুড়ি, জিলিপি, গুলের ডালনা খাই। ক্ল্যারিওনেটের পাশে বসে যাত্রা দেখি। পাতলা পায়খানা হয়। খুকির মা বলে, সাবান দিতে পারো না গায়ে। একদম বাঘের গন্ধ বেরোচ্ছে।

সাবান তো মাখি।

এই মাথার ছিরি! শার্টের কলারের অবস্থা দ্যাখো। শুধু ময়লা বেরোয়।

কি আর করা। আমার সঙ্গী-সাথীরা তো দাঁতই মাজে না। চুলদাড়ি কাটার রেওয়াজও কম। হাতে পায়ে বাঘের নখ। আমি তবু নখ, চুলদাড়ি কাটি। দু তিন দিনে একবার দাঁত মাজি। আর ওদের সঙ্গে জলে ঝাঁপাই। ফলা ধানের মাঠ দেখতে বারো মাইল হাঁটি। পয়োস্তি চর জমি কেমন—তাই দেখতে আকাশতলায় হাঁটতে হাঁটতে দিগন্তকে শুধুই পিছিয়ে দিই। চাকবেড়ে গাঁয়ে বর্ষা হচ্ছে। গাবতলায় এক বুড়ো পচা মাদুরের ওপর কাদায় মাখামাখি। বাড়ির লোকজন চেঁচিয়ে বলল, ওদিকে যাবেন না বাঙালমশাই।

তোমাদেরই চাচা। ভিজে-ভিজে মরে যাবে?

তুলে এনে লাভ নেই। ক্ষয়কাশে শেষ অবস্থা। এ-সিজিনে যদি এস্তেকাল ঘনায়ে আসে—

এরকম এক মহাভারতে দেখি একদিন সকালে একজন মেয়েমানুষ প্রকাশ্য রাস্তায় দুধ ভর্তি কেঁড়েতে পাম্প করে টিউকলের জল মেশাচ্ছে। সে আবার গর্ব করে বলল, আমি মাসকাবারী খদ্দেরদের দুধে পরিষ্কার জল ছাড়া মিশোই নে—

এই হলো গিয়ে খগেনের বউ। হাজরা বজরা ঘটির মা।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে খগেনের বাড়ি গেলাম। আমাদের বাড়ির পরে দ্বারিকপোতার চারশো বিঘের মাঠ। তারপর মিস্ত্রিপাড়া। জানো মিস্ত্রি। জিতেন মিস্ত্রি। মান্য মিস্ত্রি। কেউ গণ-কমিটির প্রেসিডেন। সপ্তাহে চার বস্তা চিনি ব্ল্যাক করে। মিষ্টির দোকানে সবচেয়ে ছোট রসগোল্লা চার

আনা পিস বিক্রি করে। কেউ তালের মোচ কেটে রস পাড়ে। আর জাল বোনে। কেউ বা সন্ধ্যে রাতে হেরিকেন জ্বেলে বন্দুক নিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাশে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। যদি ডাকাত আসে। ঘুমোয় দিনে দিনে।
এখানেই খগেনদের বাড়ি। কমন উঠোন। সবাই আলাদা। ঘটি শুধু খগেন আর বেপ্পতির ভাগে। হাজরা সপরিবারে একখানা ভাড়া ঘরে থাকে। পাশের ঘরখানায় বজরা একা। তার বউ সম্প্রতি আত্মঘাতী। চোখ কটা। চেহারায় একটা দুর্বিনীত ফর্শা ভাব। ঠোঁটে চাপা হাসি। গায়ে শহরের শার্ট। ঠুগনী জ্বেলে বিড়ি ধরায়। কব্জিতে হাতঘড়ি কখনো থাকে। কখনো থাকে না। ঘরের ছইয়ে পাইপগান গোঁজা। পায়ে রবার সোল বুট। তাতে জিভ ওল্টানো। ফিতে নেই। ফিতের বদলে পায়ের পাতায় নীল রঙের মোটা রগ সব সময় জাগন্ত। বাবুদের সঙ্গে উঠে বসে। ব্যাপারীদের সঙ্গে হাসে কাশে। ফাঁড়ির সেপাইদের মুখে পড়ে গেলে বজরা হাত তুলে নমস্কার করে। সর্ষের ঘানিতে হাফ শিশি ফ্রি পায়। বড ভাই হাজরার দিকে ক্ষ্যামাঘেন্না করে তাকায়।
খগেন বাড়ি ছিল। সে দু-হাত ধরে খেজুর পাতার খোলপেতে এনে বসালো। বড় কাঁধ। ফতুয়া ঢাকা গা। পায়ের পাতা বাঁকা। একথা-সেকথা হল। বেশির ভাগ কথায় ফিক ফিক হাসে। আমার চেয়ে তা বছর আঠারো-কুড়ি-র বড় হবে। শোনে বেশি। বলে কম। তবু তারই ভেতর বলে দিল, বাতাসের ভিতরি আরেক রকম বাতাস থাকে। আলোর ভিতরি আরেক রকম আলো।
এ বাতাস—এ আলো তখনো আমি চিনি নে। দেখিও নি তখনো। বললাম, সংসার নিয়ে তো তোমার কোনো ভাবনা নেই খগেন। [আমি বাবুক্লাশের লোক। তাই আমি বয়স্ক খগেনকে তুমি বলতে পারি। ওর কিন্তু আমাকে আপনি বলতে হচ্ছিল। অবিশ্যি ওর বড ছেলে হাজরা আমার বয়সী কিংবা সামান্য বড়। সে ভালোবেসে আমায় কখনো কখনো তাড়ির ঝোঁকে তুমি বলে থাকে।]
একদম নেই। আমি তো ঝাড়া হাত-পা।
কেন ঘটি? তোমার বউ?
ঘটিটার জন্যি কষ্ট হয় বাবু। ও এখনো বালক। বাকি সব তো প্রেতক।

তার মানে ?

হাজরা আলাদা। বজরা আলাদা। ওদের মা আলাদা। আমি আলাদা।

আলাদা বাড়ি ?

সব আলাদা বাবু। শুধু ঘটিটা কখনো আমার সঙ্গে খায়। কখনো ওর মায়ের সঙ্গে খায়। আর আমি তো গাছের রস ফলপাকুড়টা দিয়ে পেট ভরাই। একটা শোল মাছ ধরলাম খালে। সেটারে পোড়ায়ে খালাম। হলুদ লঙ্কা ডলে। বেশ খেতি।

আমি খাই নি কোনোদিন।

খাবেন তো পোড়াই একদিন।

চুপ করে আছি। গাছের রস মানে তাল আর খেজুর রস। ফলপাকুড় মানে বুনো আতা। গাছেই পেকে ঝুলে থাকে। বাদুড়ে খায় আর খগেন খায়। ভেতরটা মিষ্টি-টক-বালি। অনেকে বলে নোনা।

কোনো কাজ করো না খগেন ?

কে দেবে ? আমার পা যে বাঁকা। ভালো করে কইতি পারি নে।

ও। তাহলে চলে কিসে তোমার ? ওদের গর্ভধারিণীর টাকায়।

সেখানে হাত দিই নি কোনোদিন। বেম্পতি টাকা জমায়। নতুন গাই কিনবে। আমি সূর্যকিরণ—চন্দ্রকিরণ গায়ে লাগাই। চোগে লাগাই।

তাতে তো পেট ভবে না খগেন।

এই আপনাদের মতো লোক বিশ্বেস করে ডেকে নে যান। টিউকল পাহারা দি। ভিয়েনে বসে চিনি ছানায় নজর রাখি।

দারিকপোতার মাঠ অব্দি পৌঁছে দিতে হাজরা এগিয়ে এলো। খগেনদের পুকুর পাড়েই মাটির দেওয়াল-ঘেরা একখানা বড উঠোনের মেঠো বাডি। ভাঙনদশা। কে থাকে গো ?

কেউ না। এটাও আমাদের বাড়ি।

দু-খানা বসতবাড়ি ?

না। মাইতিমাসি এটা বাবারে দিয়ে যায়।

তোমরা থাকো না ?

মা থাকতে দেয় নি।

পরে একটু একটু করে যা কানে এলো—খগেনের যুবা বয়সে, নিঃসন্তান অল্পবয়সী মাইতি-বেধবা খগেনকে ভালোবেসে এ বাডিটা দান করে যায়।

দান করেছিল—আরও কিছু জায়গা জমি। ভাগচাষীরা সে জমিতে খগেনকে উঠতে দেয় নি। ও বাড়িতে খগেনকে ঢুকতে দেয় নি বেম্পতি।

একদিন সন্ধ্যেরাতে—বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাই হবে—জ্যোৎস্নায় সব ভেসে যাচ্ছিল—খালের জল ছেঁচা হচ্ছে। ঘাপটি-মারা মাছগুলো আটল পেতে ধরা হচ্ছিল। খগেন অন্ধকারে আটলে হাত গলিয়ে মাছ ভেবে যাঁকে বের করে আনলো তিনি আসলে মাছখোর একটি মাদি কেউটে। জ্যোৎস্নার ভেতর ঝাঁকুনি দিয়ে অসাড় সাপটাকে খগেন সিমেন্ট বাঁধানো বারান্দায় ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস আঁশটে গন্ধে ভরে গেল। আমাদের বাড়ির ছোট বউমা খেতে বসেছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠে বললেন, কী ঘেন্না! এক্ষুণি নিয়ে যাও।

খগেন অপরাধীর ভঙ্গিতে সেটাকে কুড়িয়ে নিল। মদ্দাটাও ধরা দেবে—

ওরা কথা বলতে বলতে জ্যোৎস্না ধরে খালপারে উঠে গেল। কথার টুকরোয় বোঝা গেল, সাপটার দাম কত হতে পারে তাই নিয়ে কথা হচ্ছে। বিষের দাম। চামড়ার দাম। জ্যান্ত বিক্রি করলে কত দাম। খগেনের মুখে কোনো কথা নেই। সবাই যেন মানিক কুড়িয়ে পেয়েছে।

বাঁধে উঠে আবছা আলোয় খগেন নশ্বর হাতের লতাটাকে আরেক ঝাঁকুনি দিয়ে খালের ওপারে ছুড়ে দিল। বুঝলাম, মদ্দাটাকে ধরার ইচ্ছে নেই খগেনের। অন্ধকারে আছাড় খেয়ে মেছুনি আবার কোমরে জোর ফিরে পাবে। পেয়েই আবার খালের জলে নামবে। এখন সেখানে হাঁটুজলে মাছ খলবল করে। তাতে গোড়ালি টিপে-টিপে খগেনরা গুলে মাছ ধরছে।

স্কুল কোড্ বিল নিয়ে মিছিল করার জন্যে শ্যামাপ্রসাদের কলেজ ফোর্থ ইয়ারে টেস্টের সময় ডিসকলেজিয়েট করে দিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সম্ভবত ওই বিলের প্রণেতা। কিংবা বোর্ডের সভাপতি। ঠিক মনে নেই। চাকরি খুঁজছি। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেই সময় পরাগদা—পরাগ চট্টোপাধ্যায় (বেদ নিয়ে বই লেখেন) আমাদের লেখালেখির শ্রোতা ও উৎসাহদাতা—তন্ত্র সাধনায় মাতেন! খ-পুষ্প ব-পুষ্প তাঁরই মুখে শুনি প্রথম। রাস্তায় এক রাজজ্যোতিষের সাইনবোর্ড দেখে ভেতরে ঢুকলাম। সেখানে সুগন্ধী এক ভদ্রলোক–খালি গা, পরণে ফিনফিনে ধুতি—পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবেন। বললেন, আজ রাতে আমার সঙ্গে ইছাপুর শ্মশানে দেখা করুন। একটা বস্তা হাতে নিয়ে যাবেন।

শেয়ালদা থেকে লাস্ট ট্রেনে গিয়ে হাজির। হাতে বস্তা। শ্মশানে তখন গোটা দুই চিতা নিভু-নিভু। শ্মশানবন্ধুরা ঢুলছে। ভদ্রলোককে পেয়ে গেলাম। অন্ধকারের ভেতর একটা ফাঁকা চিতায় দড়ির খাটিয়ায় শয়ান। কাছে যেতেই নাম ধরে ডাকলেন।

সেখানেই থেকে গেলাম তিন সপ্তাহ। দুর্গন্ধ ভৈরবী, নদীর জল ফুটিয়ে চা আর অবরে-সবরে মাঝনদীতে ভাড়ার পানসীতে বসে গুরুদেবের শ্যামা-সঙ্গীত। ফুরফুরে বাতাসে সে-গান ভাসে। শেষদিকে আমিও গুরুদেবের হাতের তুড়িতে পায়রা নামতে দেখি। বটের ঝুরি সাপ হয়ে যায়। ভালো বাংলায় ভৈরবী আমায় আকর্ষণ করে। সায়া সেমিজের তো বালাই ছিল না। আর নদীতে সে কি বাতাস। ঘটিগুলোয় জল ভরে রাখতে হতো। নয়তো জায়গা নড়ে যেত।

তো খগেনের কথায় ফিরে আসি। ফণিমনসা একা-একা ফাঁকা টিলায় বৃষ্টি ভেজে। তারই গায়ে আকাশ ভেঙে বাজ পড়ে। লোকে তাই ফণি-মনসাকে বাজবরণ বলে ডাকে। এই বাজবরণের আঠা পাহারাদার কুকুরকে খাইয়ে দিয়ে চোর-ডাকাত কুকুরের পেট পচিয়ে দেয় – তাকে বোবা বানিয়ে ফেলে। সে বোবার কাটান দিয়ে দিতো খগেন। শেকড়বাকড়ের গুণে। কুকুর আবার ভুগ্ ভুগ্ করে ডেকে উঠতো।

লোকে যে বদমাইসি করতো—তাতেও সরল বুদ্ধির ছিটে লেগে থাকে। স্বর্গের আগের স্টেশনে একদম কাঠ হারামজাদা খুঁজে পাওয়া কঠিন। হৃদয়ের চেম্বারে রক্ত যদি আবেগে বা রাগে গাঢ় হতে চায় তবেই মুশকিল। সে রক্ত পাম্প করা যায় না। হৃদ্‌রোগ দেখা দেয়। সে জন্যে রক্তকে মাত্রা বেঁধে তরল রাখতে হয়। এই তরল রাখা ওষুধের নাম ডিণ্ডিভেন। ডিণ্ডিভেন তৈরিতে চাই গোখরোর বিষ। রক্ত জল হয়ে যাওয়াই তো সাপে কাটা রুগীর আসল প্রবলেম।

খগেন কাজ পায় না। তবু বেম্পতির দুধ বেচা টাকায় ভাত খাবে না। বজরার ওয়াগন ভাঙার পয়সায় ওষুধ খাবে না। এক যদি হাজরা তার ব্যাঙ বেচা পয়সায় কিছু দেয় তা নেবে। তাতেও আপত্তি। জগতের ব্যাঙ সাবাড় করে দিলি!

বলেছিলাম, মানুষের কাজে সাপের বিষ লাগে। সাপ ধরে বিষ বেচে দাও। বিষ গালতে জানো তো?

তা জানি। কিন্তু অমন ধারায় ওদের সব ধরে ধরে অপমান করা কি ভালো?

তাহলে তো হাত-পা গুটিয়ে উইয়ের ঢিবি হয়ে থাকতে হয় খগেন। আর শুধু ধ্যান করা ছাড়া পথ থাকে না।

আমাদেরও তো বিষ আছে। আপনারে আমারে ধরে ধরে যদি পূর্ণিমে অমাবস্তেয় বিষ ঢালায় তো ভালো লাগবে?

আমরা তো আর সাপ নই খগেন!

গোখরো চন্দ্রবোড়ার কাছে তো আমরাও এক ধাচার সাপ।

এ লোককে বুঝিয়ে লাভ নেই। কপালে কষ্ট আছে। এখানকার ছবিঘর, ডাকঘর, স্টেশনঘরের মাথায় এক প্রকারের মায়া আছে। তাতে দুঃখী লোক সুখী হয়ে যায়। গরু হয় ছাগল। চোর হয় সাধু। সেই আকাশের শাদা কাজল এই মহাভারতের মানুষজন যুগ যুগ ধরে চোখে দিয়ে আসছে। খগেনও দেয়। তাই কোনো কষ্টই ওর কষ্ট নয়। ঠিক থাকার জেদে—সঠিক থাকার স্বাদে—আমরা যাকে বলি মানুষ হয়ে ওঠার সঙ্কল্পে—কোনোরকম নাটকীয় ঘোষণা ছাড়াই এসব মানুষ দিনে দিনে নিঃশব্দে পালটাতে থাকে। খগেনও পালটাচ্ছিল। বেঁচে থাকার জন্যে আমি ওকে হাবা গোসাপ ধরে চামড়া চালান দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। তাতে ও বললো, ও কাজটা লুভী লোকের। শেষে কি কোনোদিন মাটি চালান দেওয়ার কাজে নেমে দুনিয়াটা রসাতলে দেবে!

অ্যাতো যার আপ্তজ্ঞান তার মেজো ছেলে ওয়াগন-ব্রেকার। বউ দুধে জল মেশায়। তবে পরিষ্কার জল। বড় ছেলে হাবা। অপদার্থ। হাড়বা নশ্বর তাই ব্যাঙ ধরে-ধরে বেচে দেয়। ঘটি রস চুরি করে খায়। ভাগ্যিস বুদ্ধ থেকে মার্কস্ সবাই-ই মনুষ্যত্বের চেয়ে বয়সে ছোট। আর মনুষ্যত্বই আমাদের বড়দা বলে খগেন নশ্বরের মতো মানুষ এখানে-সেখানে থেকে যায়। আমি লক্ষ্য করছিলাম—খগেনের জীবনে ইচ্ছে কমে আসছে। 'রথের রশি' নাটকে রবীন্দ্রনাথ গুহাবাসী ইচ্ছাহীন সাধুর একটা দিক নিয়ে রসস্থ মানুষের কটাক্ষ করেছেন। এ খগেন সেরকম নয়। তার আর ইচ্ছে নেই। সে তার বুদ্ধিকে কোনোদিন উসকে দিয়ে ব্যায়াম করায় নি। তাই সবকিছু সে তলিয়েও বোঝে না। মৃত্যুর আগে আগে আমায় বলেছিল—আকাশ থেকে আকাশ তার শরীর অব্দি নেমে এসেছে। আকাশ এত দয়ালু। তাকে আর

কষ্ট করে ওপরের আকাশে উঠতে হবে না। নেমে-আসা আকাশেই সে মিশে যাবে।
মরেছিল অবশ্য এই সাধারণ আমাদের মতো। দম ফুরিয়ে। আকাশের সঙ্গে মেশামিশি তো এ চোখে দেখা যায় না।
তার ওয়াগন-ব্রেকার পুত্র কাছারিবাজারের কু-পল্লীর খদ্দের। আলিপুরে মামলার আসামী। তার বউ আলুর চপে ফলিডল ঢেলে আত্মঘাতী। তবু সে টেরি বাগায়। তার আসক্তির আর শেষ নেই।
এরকম সময় আমিও কিছুদিন কাজের ইচ্ছে হারিয়ে বসি। আমার বাড়ির উল্টোদিকে যুদ্ধের সময় ইটখোলা হয়েছিল। তাতে এখনো যমজ ঝামার পাহাড়। সে-পাহাড় থেকে বিকেলবেলা হয়তো কোনো প্রবীণ চর্বিওয়ালা চন্দ্রবোড়া হাওয়া খেতে বেরোলেন। চোখে কম দেখেন। স্মৃতিতে কয়লার ইঞ্জিনের কু-ঝিক-ঝিক এখনো টাটকা। মাথাখানা বিশাল। তাই দেখে বেজিদের কুচোকাঁচা ছানাপোনা এদিক-ওদিক দৌড়ে পালিয়েছে। দৌড়নোর সময় একখানা ঝামা ইট সরে গিয়ে চাঁদবুড়োর মাথায় পড়লো। শরীরটা ভার। মাথায় আরও ভার। ভেবেছিল সামনের পূর্ণিমায় বুনো আতা গাছের গোড়ায় দংশাবে। তাহলে বিষ ঝরে গিয়ে মাথাটা হালকা হবে। বিষ হলো গিয়ে সর্পজাতির সম্ভ্রম। মস্তকের মুকুট। একি যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঢালা যায়! না উচিত? সুন্দর পৃথিবী মানুষ নামে সাপে ভরে গেল।
ফেলা আর হয় নি। ইটের চাপে মাথাটি থেঁতলে চাঁদবুড়ো ওখানটায় মরে রইলো। তার গায়ে মাংসে বেজিদের পিকনিক। তারপর বর্ষার এক শুকনো বিকেলে দেখা গেল—শুধু মাথাটা রয়েছে। বর্ষার জলে ধুয়ে-ধুয়ে শাদা। একদিন শীতের সন্ধ্যেয় খেয়াল হলো—সামান্য শুকনো মুণ্ডুটার গর্ত দিয়ে আকাশের ভারি নীল গল গল করে বয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই আকাশ একদিন নেমে আসে। এর ভেতরেও ফুর্তিবাজ বেজিগুলো হালকা পায়ে দৌড়োদৌড়ি করে। নতুন বসতির নতুন বউটি বিকেলের পুকুরে কড়াই নিয়ে মাজতে বসেছে। আজই সন্ধ্যেবেলা ঠাকুর জামাই আসবেন। বড় রসিক মানুষটি।

আসলে দুনিয়া তো কখনো রেস্ট নেয় না। আমরা তার সঙ্গে দৌড়চ্ছি। দম ফুরোলে বসে পড়ছি। আসক্তি না থাকলে এই দৌড় অনেক আগে

থেমে যায়। তখনই আকাশের শাদা কাজল চোখে মাখা যায়। কিন্তু জায়গাটা ভোগবাসনার। অভাব দুঃখের। সুখ আহ্লাদের। ঠগানো ভোগানোর। দুনিয়া দৌড়চ্ছে। আর তার জানলায় বসে এসব দেখা যাচ্ছে। কেউ বলে জীবন দ্যাখো। ভালোবাসা দ্যাখো। উল্টো বেঞ্চে আরেকজন বসে টিটকিরি দিচ্ছে—ন্যাকামি দ্যাখো। ফক্কা দ্যাখো।

এরকম দুই ভাবনা দুটো নদী হয়ে ছুটে এসে কাছাকাছি হয়। তারপর কোনদিন না মেলার দুই পথে চলে যায়। আমরা রং মেলান্তি খেলতে বসে ওদের মেলাতে চাই। না মেলাতে পেরে দুঃখ পাই। এই দুঃখে খানিকটা ভাষা, খানিকটা রহস্য, দেড়শো গ্রাম জীবন ভালো করে থেঁতলে নিয়ে চ্যাপ্টারে ভাগ করে সাজিয়ে দিলেই উপন্যাস। লোকে পড়তে বসে বই বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি আকাশের নেমে-আসা চোখে দেখা যায়। কিন্তু শাদা কাজল চোখে না টানলে তো দেখা যাবে না।

এই কাজল খগেনের চোখে ছিল। তাই মাইতি-বেধবার কথা নিয়ে সে কোনোদিন বাড়াবাড়ি করে নি। ইচ্ছে মরে গিয়ে সে কোনো বড় বাণী দেয় নি। শোষণ, অভাব, খিদে, লড়াই তো সম্রাট অশোকেরও আগের আমলের জিনিস। মানুষের ইতিহাসের নিত্যসঙ্গী। তাকে বাদ দিয়ে খগেন চলতে চায় নি। তাকে নিয়েও পড়ে থাকতে চায় নি। বরং জীবন-রহস্যে কে যেন আসে নি—এই কথাটা জানতে পেরে মাদি কেউটেকে ছেড়ে দেয়। শিবানী সুমতি, মেছুনি—সব একাকার করে ফেলে।

আমারও বোধহয় ইচ্ছে মরে গিয়ে স্বর্গের আগের স্টেশনের সঙ্গে দেখা—আর এই নিয়ে লেখা। আমি তাই কখনো খগেনে—কখনো বিজনে মিশে গেছি। ওরা দুজনই আকাশ হয়ে নেমে এসেছে। যাকে বলে আকাশ থেকে আকাশ নেমে আসা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এদিককার মাঠ ধান কাটার পর সেই বর্ষা অব্দি পড়ে থাকে। কিচ্ছু হয় না। কঙ্কালসার গরুগুলো মিছিল করে এ-বাদা থেকে সে-বাদা ঘুরে বেড়ায়। যদি ঘাস পাওয়া যায়। পেলে খুঁটে-খুঁটে খেয়ে ফেলে। রোদ চড়লে নোনা ফুটে ওঠে। তখন মেয়ে-মদ্দ বাচ্চা-কাচ্চা সবাই মিলে ভাঙা কলাই থালা নিয়ে মাঠে মাটির রাস্তায় বসে যায়। মাটির ওপরকার নুনফোটা গুঁড়ো মাটি কলাই বাসনে কাচিয়ে-কাচিয়ে তোলে। বাড়ি গিয়ে গরম জলে ফুটিয়ে নুন বের করে। সেই নুন বেচে ভুট্টার আটা। তাতে শুসনি, নয়তো মেথি শাকের ডগা। নামাবার সময় দু'ফোঁটা সষের তেল, একছিটে হলুদ আর ঘরের নুন। এই দিয়েই পিত্তিরক্ষা। বিকেলে ছায়া পড়লে এক রকমের সুন্দর বাতাস বইতে থাকে। খিরিস গাছের বিরাট ঝাঁকড়া মাথায় বড়ি তালপাতা দুলতে থাকে। বাদার-পর-বাদা—ছড়ানো ঘর-বসতি—লোকজন তখন দূর থেকে একদম আঁকা ছবি। ট্রেনের জানলায় এক একটা জায়গা প্যাসেঞ্জারদের চোখে ঘুরে যায়। মাইলের পর মাইল এই একই হাল।

এরই ভেতর পবিশ্রমী, সাহসী, ধুরন্ধর যে দু-চার ঘরে কিছু পয়সা থাকে—তারা দিনে-দিনে সব কাজ সারে। সন্ধ্যে হলে কুপি জ্বালিয়ে অন্ধকার মাঠের দিকে বাড়ির কর্তা তাকিয়ে বসে থাকে। যদি ডাকাত আসে। সারা গাঁয়ে শুধু তারই বাড়িতে তো একখানা বন্দুক আছে। সে-বন্দুকখানা ফি-বছর সদর থেকে রিনু করিয়ে আনার পর পঞ্চাননতলার বেলপাতা ছুঁইয়ে তুলে রাখা হয়। এইসব ফেমিলি অভাবের দিনে বগিথালা, রুপোর বিছে, পেতলের গাড়ু বন্ধক নেয়। যখন আর মানুষজনের জীবন চলে না, তখন এরাই জমি বন্ধক নিতে শুরু করে। টাকায় দিনে পাঁচ পয়সা সুদে টাকা

খাটায়। সুদ না পেলে গাভিন গাই টেনে নেয়। খাতকের পোয়াতি বউ এসে এদের উঠোনে ধানসেদ্ধ শুকনো করে। মহাজন বড় ভাল মানুষ। গরম-গরম ডাল ভাত খেতে দেয়। সঙ্গে লঙ্কা পেঁয়াজ। খালে-ধরা চুনোচানার কাঁটা দিয়ে রাঁধা শাক-চচ্চড়িও জুটে যায় এক-একদিন।

এইসব পোয়াতি অসময়ে দশাসই ছানা বিয়োয়। খালাস হয়ে দু'দিনের ভেতর আবার মুনমাটি কাড়াতে বেরোয়। পা দিয়ে উঠোনের এলো-ধান রোদ্দের দিকে ফিরিয়ে-ফিরিয়ে দেয়। কোথাও যদি দু'মুঠো চাল পেল তো, বাড়ির লোকজনকে লুকিয়ে-চুরিয়ে ভেজেই খেয়ে ফেলবে। কাজ করতে করতে কোঁচড় থেকে নিয়ে মুখে দেবে। চলবে ফিরবে—কেউ বুঝেও উঠতে পারবে না। দুপুরের দিকে বুক টনটন করে উঠে দুধে ভরে যাবে। মনের ভেতরটা তখন চুলকোয়। না-জানি ব'চ্চাটা ট্যাঁ-ট্যাঁ জুড়েছে কিনা! ফাঁকা ঘরে। কাজ ফেলে যাবার উপায় নেই। মাঠ থেকে মহাজনের একটা কালো গাই দৌড় দৌড়ে ছেঁচতলায় আসছে। জানে, এখন তার জন্যে বরাদ্দ ফেন লাউমাচার ছায়ায় বসানো মালসায় ঢালা হবে।

বিয়োবার ক'দিন আগে এই ফেন খানিকটা চুরি করে খেয়েছিল খাতকের বউ। বড় পুষ্টিকর। আর ঘুম এনে দেয় চোখে।

খগেন নস্করের বউকে কিন্তু এসব কিছুই করতে হয় নি। যদিও খগেন একটি পয়লা নম্বরের নিষ্কর্মা। লম্বা বড়ো-সড়ো ফরসা চেহারা। সাত চড়ে রা নেই। তিনটি ছেলে দিয়েছে বেস্পতিকে। বড় জন এখন দাড়ি রেখে আধা সাধু আধা ফাঁকিবাজ। কোথাও কাজ পায় না। তার তিন মেয়ে। এই হাজরা নস্কর তার বাপের ধারা পেয়েছে। সবাই ভালবাসে হাজরাকে। কিন্তু কাজ দিতে চায় না। ভাগে জমিও দিতে চায় না। হাজরা কারও বিরুদ্ধে নালিশ করে না। নালিশ তার নিজের বিরুদ্ধে। আমি পেট

চালাবার বুদ্ধি ধরি না কেও ? সে গাই দুইতে পারে। ধান রুইতে জানে। খড়ের দড়ি বানাতে পারে। আবার খেজুর পাতার খোলপে বুনতেও পারে। তবু তার পেট চলে না। তার আপন গর্ভধারিণী তাকে উঠোনের ভেতরেই আলাদা করে দিয়েছে। নিজির ছানাপোনা নিয়ে থাকো। নিজির আহার নিজি যোগাড় করো। সেই থেকে হাজরা নস্কর জন-খেটে, চুরি-চামারি করে বউ আর মেয়ে তিনটের আহার যোগায়। বউটা সাক্ষাৎ পেত্নী। যে বাড়ি কাজ করতে যাবে—আঁচলের নিচে গ্লাস, চাল—যা পাবে হাতিয়ে নিয়ে আসবে। তাই আর এ-তল্লাটে কাজ পায় না। এখন দূরে দূরে কাজ খুঁজতে হয় বউটার।

মায়ের মুখের ওপর এ-বাড়িতে কেউ কথা বলার সাহস ধরে না। বড় তিজি ছেলেমেয়ে। গাই গরু ছিল একটা। বিক্রির দুধে টিউকলের পরিষ্কার জল মিশিয়ে মিশিয়ে এখন একটা থেকে তিনটে গাই। তার ভেতর একটা গাই বাছুর হলে দুধ দেয় এ-বেলা ও-বেলা মিলিয়ে চার কিলো। শুধু মেজো ছেলেটা—বজরা কিছু কিছু তকরারি করে। তার পাইপগান আছে। ইলেকট্রিক ট্রেনের তার-কাটার বড় কাঁইচি আছে তার। ফি-শনিবার নেশা করে কাছারিবাজারের গায়ে মেয়েছেলেদের কাছে যায়। পয়লা বউটি তার আলুর চপে বিষ ভরে খেয়ে আত্মঘাতী। আবার সে বে বসবে। এমন শোনা যাচ্ছে, তার সাঙাতদের মুখে। বজরা হপ্তায় হপ্তায় ইনজেকশন নেয়। সবাই তাকে সম্ভ্রম করে। সমীহ করে। রেগে গেলে বজরা তো বলেই বসে—জানিস, আমার গোপ্ত রোগ আছে।

এসব কথা কিন্তু এ-দেশেরই। এই কলকাতারই পনর মাইলের ভেতর। দেশটায় এক সময় নদী ছিল। এখন সে নদীর বুকে গরু চরে। শিক্ষিত লোকে বলে—সে নদীর তীর দিয়ে চৈতন্যদেব গান গাইতে গাইতে হেঁটে গিয়েছিলেন। তা প্রায় পাঁচশো বছর আগের

কথা। এখন দেশটার এখানে-ওখানে পাখির ছড়ানো বীজ থেকে খেজুর গাছ। তাতে কলসী বসানো থাকে।

এসব কলসী পাড়তে পারে ঘটি। নগেন নস্করের কোলের ছেলে। বাঁটকুল বলে বয়েস বোঝা যায় না। বাপের সঙ্গে মাঠে মাঠে শেকড়-বাকড় কুড়োয়। একটু রোগাভোগা ধরনের—তায় হাফ-প্যাণ্ট পরে। মেজদা আর মাকে বড় ভয় পায় ঘটি। ভাঙা কলসীর দু'খানা চাড়া বাজিয়ে গাইতে পারে। বেস্পতির চোখের বিষ। ঘটিই ভদ্দরলোকদের বাড়ি বলে দিয়েছে—মা দুধে জল মেশায়। তবু এই ঘটি আর খগেনকে নিয়েই বেস্পতির হেঁসেল। তাতে বজরা মাঝে মাঝে ভাগ বসায় জোর করে। কেড়েকুড়ে খেয়ে নেয়। সবদিন তো আর বাড়ি ফেরে না বজরা। তাই পুষিয়ে যায় বেস্পতির। তার মতে—ব্যাটাছেলে তো এ রকমই হবে। মেনীমুখো সে একদম দেখতে পারে না।

গাঁ দেশের লোক শীতকালে খালি গায়েই থাকে। খগেন সে রকম নয়। সারা বছর তার গায়ে ফতুয়া। এখানে মাটি কাটার কাজে ভাঙা গমের এ-রকমের কাপড়ের বস্তা আসে। বাজারে পাওয়া যায়। তাই কাটিয়ে ফতুয়া। বলার বাসনা পুড়িয়ে কাচা। একদম ঝকঝক করে গায়ে দিলে।

খগেনকে দেখে বেস্পতি চেঁচায়। সেজেগুজে বসে থাকো। আর আমি দুধের কেঁড়ে মাথায় সারা তল্লাট চষে বেড়াই। কি কিনা!

খগেন কোন জবাব দেয় না।

রাগে জ্বলে গিয়ে বেস্পতি কথার ছুরি চালায়। কে বান মারলো গো! কে মুখুণ্ডী করলো গো আমার ছেলের বাপকে? তাও যদি পা দু'খানা সোজা হোত। মুখে এট্টা যদি কথা থাকতো তবু—পোড়া কপাল আমার—

বেস্পতির সব কথাই সত্যি। এদেশে বাজবরণের আঁঠা খাইয়ে

দিয়ে চোর-ডাকাতরা পাহারাদার কুকুরকে বোবা করে ফেলে। তখন বান-খাওয়া প্রাণীর ধারায় কুকুর একদম বোবা বনে যায়। লোকে বলে—কুকুরের মুখুণ্ডী হয়েছে। বাজবরণের আঁঠায় কুকুরের পেটের নাড়িভুঁড়ি পচে যায়। যন্ত্রণায় বোবা কুকুর গিয়ে পুকুরের জলে পেট ভিজিয়ে বসে থাকে। তারপর জিভ ঝুলিয়ে হ্যাঃ হ্যাঃ করতে করতে একদিন মরে যায়।

আর খগেন নস্করের পায়ের পাতা তুটি সত্যি বাঁকা। সেজন্যে খগেন অনেকক্ষণ এক ধারায় ধানের বীজ ভাঙতে পারে না—রুইতেও পারে না। তাই কাজও পায় না কোথাও। তবে সারাদিন লোকটা এক জায়গায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে—কিছু চায় না—হাতে ধরে দিলে তবে খায়—গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় চেনে—না বললে কথা বলে না—মিথ্যে বলার কোন চেষ্টাও নেই—তাই খগেন নস্কর দেশগাঁয়ে এক রকমের আলাদা সমীহ পায়। এ-সমীহ আলাদা জিনিস।

লোকে জানে, লোকটা লোভী নয়, কারুর কোন ক্ষতি করবে না, তা খগেনকে দেখলে লোকে বসতে দেয়। ভদ্দরলোকের মেয়ের বিয়ে, ছেলের বিয়েয় খগেনের ডাক পড়ে। সারারাত ধরে ভিয়েনের লোকজন পান্তুয়া ভাজে। খগেন বসে বসে পাহারা দেয়। ছানা চুরি গেল কিনা, চিনি পাচার হোল কিনা। খগেন বসে বসে নজরে রাখে। এইসব দায়িত্বের কাজে খগেনের ডাক পড়ে। খাবার নেমন্তন্নে ঘটি যায় তার সঙ্গে।

একবার বজরার খোঁজে রেল পুলিস এসে খগেনকে ধরে নিয়ে যায়। জি. আর. পি. থানায় খুব একচোট মারধোর দিয়ে ফেলে রাখা হলো খগেনকে। থানার লোকজন ভাবলো—চোরের বাপ তো! এ আরেক কাঠি চোর! জেনে-শুনেও ছেলের শুলুক-সন্ধান দেয় না—আর পড়ে পড়ে মার খায়। থানা লকআপে তু'দিনের খাবার পড়ে থাকলো। মারধোর খেয়ে খগেন কিছু খায় নি। তার

ওপর গায়ে জ্বর। দারোগা ভয় পেয়ে মারের চোটে ফোলা-ফোলা শরীরসুদ্ধ একটা লোকাল ট্রেনে খগেনকে তুলে দিল সেপাই দিয়ে। শেষে না খুনের কেসে পড়ে থানা! এ-ট্রেন সে-ট্রেন ঘুরে একগাল দাড়ি নিয়ে খগেন ফিরে এলো। কোন কথা নেই মুখে। কোন নালিশ নেই।

ঘটি যত বলে, বাপ, তুই কোন্ ইস্টিশনে ছিলি বল তো?

খগেন হাসে।

ঘটি কেঁদে উঠে বলে, থানার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল। কী মারটাই মারলো সিপাইরা। একটা চেঁচানিও দিতে পারলি নে বাপ? তাহলে লোকজন জুটে যেতো—

বজরা বাপকে দেখে বললো, দাড়িটা কামাও তো। পাকা দাড়ি আমি দেখতি পারি নে।

তাতেও খগেনের কোন কথা নেই।

তখন বজরা বললো, শুধু শুধু ধরা দিলি কেন? আগানে-বাগানে পালিয়ে থাকতিস। তুই পালালে কি ওরা তোকে খুঁজে বের করতে পারতো? একটা বান মারতে পারলি নে দারোগাকে?

খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যেতো। শুধু শুধু বান মারবো কেন?

ও হো হো। ওরা তোমার শউরো?

মানে শ্বশুর। এর পর খগেন অনেকক্ষণ আর কথা বলে নি। ইদানিং খগেন বড় রাস্তায় মুড়ির লরী দেখলে বুঝতে পারে কী হয়েছে। বজরা নিশ্চয় তার কেটেছে। মাঝরাতে কুয়াশায় রেলের পাটি মুছে যায়। দু'পাশের গাছগাছালির ভেতর থেকে শীতল ঠাণ্ডা শিস দিতে দিতে ওপরে ওঠে। তখন বড় কাঁইচি পিঠের দিকে ঝুলিয়ে নিয়ে বজরা ইলেকট্রিক খুঁটি বেয়ে ওপরে ওঠে। নিচে তখন তার স্যাঙ্গোপাঙ্গোদের হাতে পাইপগান। পেটো। রেল পুলিস দেখলেই ঝাড়বে। দু'বার মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছে বজরা।

একবার খালের জলে তামার তার ডুবিয়ে রেখেছিল। তখন খগেন বলেছিল, বেঘোরে মরবি তুই একদিন।

মরি তো তোর কি?

বেশি লোভ করিস নে বাবা।

হ্যাঁ। তোর মতো জামা গায়ে দিয়ে বারান্দায় বসে থাকবো। আর মা গিয়ে বাড়ি-বাড়ি দুধ দেবে!

তোর তো চালচুলো নেই। সংসার টানতে হয় না। তোর এত টাকা-পয়সা কিসি লাগে?

তোমার মতো আকাশে চেয়ে চেয়ে কাটাবো।

বেস্পতি এসে পড়ায় এসব কথা সেদিন আর এগোয় নি। ঘরের ভেতর বসে সেদিন বাপ-ব্যাটার সব কথাই কানে গিয়েছিল তার। সে চায় বজরা আরও বেশি করে পয়সা কামাক। কিন্তু ওই সেপাই, গুলিগোলা তার একদম পছন্দ নয়। হ্যাংলামো জিনিসটা এই মাঠঘাটের ভেতর মেলে না। মিশ খায় না একদম।

বেস্পতিকে দেখে তখন তখনই খগেন থেমে গিয়েছিল। বজরার চুলের মুঠিটা ধরে বেস্পতি চেঁচিয়ে উঠেছিল, তোর জন্যিই তো তোর বাপের এই দশা।

আমি কি ধরা দিতি বলিছি? মায়ের মুঠোর ভেতর থেকে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে বজরা উঠোনের মাঝখানে টান-টান দাঁড়ালো। দেখে বেস্পতির বুকটা গর্বে ফুলে উঠতে চাইছিল। এই মানুষটা তার নিজের শরীরের। যেন তারই বসানো কোন চারা সবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। দোষের ভেতর গাছের গায়ে পোকার বাসা। সময় থাকতে যদি ধোঁয়া দিয়ে, ওষুধ দিয়ে তাড়ানো যেত। কিন্তু তা কি হবার! পৃথিবীর গায়ে, বাসাবাড়িগুলোতে এ-রকম হয়েই থাকে। হতেই থাকবে।

এখানে উঠোনে দাঁড়িয়ে ট্রেন আসছে দেখা যায়। ট্রেন যাচ্ছে দেখা যায়। শীতের ভোরে ট্রেনটা কুয়াশা ফুঁড়ে উদয় হয়।

সন্ধ্যেরাতে অন্ধকার মাঠের ভেতর দিয়ে আলো জ্বালানো কয়েকখানা চলন্ত ঘর দেখা দিয়েই খানিক বাদে মিলিয়ে যায়। এখানকার মাঠে যেসব কঙ্কালসার গাই ঘুরে বেড়ায় তাদের জন্যে একটি ধর্মের ষাঁড় বরাদ্দ। ষাঁড়টি একা-একা ঘুরে বেড়ায়। মন হ.ল কাজে বসে। নয় তো নয়। ভগবানের বাতাসে বাঁশি দিতে-দোল খেতে—গোনাগুনিতে কয়েকটি গাছ। তারাই দোলে। তারাই কাঁপে। তারাই যেটুকু পারে এলোপাথাড়ি বাতাসে বাধা দেয়।

রোদ্দুর এখানে সিধে নামে। শীত ঝাঁপিয়ে পড়ে। বর্ষা দূর মাঠের ভেতর দিয়ে জানান দিতে দিতে ছুটে আসে। বাজ পড়লেও ধর্মের ষাঁডটা মাঠেই দাঁড়িয়ে থাকে। একা-একা ভেজে। বজ্জরা তার না কাটলে ট্রেনগুলো প্রায় টাইমে টাইমে আসে। এইসব নিয়েই কলকাতাকে ঘিরে লোকাল ট্রেনের একটি স্টেশন। টেলিগ্রাফেব তার। ফিঙে পাখির লেজ। মালগাড়ির শান্টিং আর লোকবসতি। মাছ ধরাব আইল। বটতলা। বিড়িবাঁধুনেদের ডেরা। বস্তার কারবারী। আড়াআড়ি একফালি পীচ রাস্তা। তাতে থরথর করে কাঁপতে কঁপতে বাস যায়। ছাদে কুমড়োর ঢিবি। এইসব নিয়েই দক্ষিণ মালঞ্চ। এই নামেই রেল স্টেশন। এই নামেই বসতি। সাহেব কোম্পানির একদম গোড়াব দিককার লাইন। তাই বহু পুরনো রেল কোয়ার্টার পড়ে আছে অনেকগুলো। বর্ষায় সেগুলোতে গরুরা আশ্রয় নেয়।

এখানে বেল স্টেশনের গায়ে একটু-আধটু কলকাতার গন্ধ মাখানো। নয়তো আগাগোড়াই ধানক্ষেত, গরু, পুকুরপাড়, সামান্য একটু ইলেকট্রিক আলো আর কয়েকটা মনোহারী হোলসেল দোকান আছে। সেখানে পাউরুটি, ব্লেড পাওয়া যায়। হোলসেলের গায়েই কেরোসিনের লাইন। তারপর মিষ্টির দোকান। সেখানে একটা বড় সাইজের শাদা দেশলাই বাক্স থরথর করে কাঁপে। তাতে দই থাকে।

দক্ষিণ মালঞ্চে জীবন রুলটানা একসারসাইজ খাতা নয়। এখানে যে যেদিক থেকে পারে, রুল টেনে বসে গেছে। যেমন, রেল লাইনটা ধানক্ষেত চিরে তেরছা হয়ে প্ল্যাটফর্মের গা বয়ে চলে গেছে। সে রেল লাইনের সঙ্গে অসমানভাবে ইরিগেশন খাল, লালজীর ইটখোলা। পগমিলের চাকা ঘোরানো গত সনের বলদটা আজ তিন দিন হল রেলগেটে আছে। আহার বলতে ইটখোলার নরম মনের কামিনরা দু'চার গোছা শুখো ঘাস দিয়ে গেছে। এ দৃশ্য ওরা চোখে দেখতে পারে না। শহর গঞ্জের লোকগুলো কি! পুরো এক মরশুম কাজ দিল বলদটা। যেই না গতরে শক্তি হারালো, অমনি পিলখানার লোককে বেচে দেওয়া? তারাও যে কবে এসে নিয়ে যাবে এই অবলা জীবটাকে, কে জানে!

বেলা দশটা হবে। খগেন বাঁধা-বলদটার গলায় হাত বুলিয়ে এঁটুলি তুলে দিচ্ছিল, সারা মরশুম ইট বানানোর মাখা মাটি ভালো করে মেশানোর জন্যে ঘানি ঘুরিয়েছে। এখন বাতিল। রেল গেটে এই যে এত ট্রেন আসে— ট্রেন যায়—এর কিছুই বোঝে না বলদটা। সারা মরশুম পগমিলটার চারদিক ঘুরে ঘানি ঘুরিয়েছে শুধু। খগেন এক বোঝা ঘাস বলদটার মুখের কাছে এনে দিল। বলদটার চোখে সারা বছরের গোল হয়ে ঘোরার ঝিমুনি। সে ট্রেন বোঝে না। রিক্সা সাইকেলের প্যাঁক-প্যাঁকগুলো ছুঁচ হয়ে বিঁধে যাচ্ছিল বড় বড় কানের ভেতর।

ট্রেন আসবে বলে গেট পড়ে গেছে। রিক্সা সাইকেলের লাইন। সিটের-পর-সিটে বাবুরা বসে। কেউ বাজার করে ফিরছে। কারও পায়ে পাম্পশু। কারও পাদানিতে বোরো চাষের সর্যে—খোল-বোঝাই বস্তা। কেউ বা তিন ঘোড়ার পাম্পসেট সারিয়ে ফিরছে। মাঘ মাসে সরস্বতী পুজো গেল, তারপরই বোরো ধান রোয়া সারা। এবার জল দিতে হবে খাল থেকে।

গেটের গায়ে রিক্সায় বসে পয়সা দিল বিপিনবাবু। সে সিটে বসেই খগেনকে দেখতে পেল। এই খগেন? খগেন—

খগেন শুনতে পেল না। ট্রেন এলো। তবু গেট তোলে না। দক্ষিণ মালঞ্চে কলকাতার আপ ট্রেনের সঙ্গে ক্রসিং। দু' ট্রেন দু'দিকে চলে যাবার পর গেট উঠলো। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে বিপিন বসু রিক্সা সাইড করে ডাকলো, এই খগেন?

আজ্ঞে?

তাড়াতাড়ি আয় তো আমার বাড়ি।

আমি?

হ্যাঁ। আর কে খগেন আছে এখানে! রিক্সার পিছু পিছু আয় তো। একটা কাজ আছে।

তারপর বাজার-হাটের ভেতর দিয়ে বিপিনের রিক্সা ছুটলো। পিছু পিছু ছুটলো খগেন। মাইল খানেক রাস্তা। তার অর্ধেক পীচ। বাকিটা ইট ফেলে বানানো বিপিনের নিজের পয়সায়।

হাঁফাতে হাঁফাতে রিক্সার পেছন ছুটে ইরিগেশন খালের ধারে একটু দাঁড়ালো খগেন। কোথাও কেউ নেই। চোত মাসের খালে সামান্য জল। খগেন পরিষ্কার গলায় বললো, ভগবান! তোমার দয়া—

কাজ আছে বলে বিপিনবাবুর মতো এলেমের লোক কখনো খগেনকে ডাকে নি। এমনি সাধারণ গেরস্থ ভদ্দরলোকরা অব্দি তাকে ডাকে না। আজ কী কপাল করে উঠেছিল ঘুম থেকে। খগেন রিক্সার পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে মনে করার চেষ্টা করলো। ঘুম ভাঙে তার সবার আগে। নিশুতি রাতে পাতলা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায় মাঠের ভেতর দিয়ে। শেষ রাতে একটা তারা পুবের আকাশে ফুলকি দিয়ে ফুটে ওঠে। এই সময়টায় খগেন আহারের খোঁজে বেরোনো রাতচরা বাদুড়, প্যাঁচা, সাপদের ঘরে ফিরতে দেখে। দু'একদিন বজরার সঙ্গেও মুখোমুখি হয়েছে সে। নিশাচর বজরা

অন্ধকারে এখানে এক খাবলা মারে, ওখানে এক খাবলা মারে। চুনের গোলা, মালগাড়ির চিনির বস্তা, নয় তো তামার তার, কিংবা চাটুজ্যে দীঘির রুই, মৃগেল, কাতলা। ভোররাতে বাপের মুখোমুখি হয়ে এক একদিন বজরা খিঁচিয়ে উঠেছে। এখন যন্ত্রপাতি রাখার সময়—এখন সামনে এসে দাঁড়াবে না।

যন্ত্রপাতি মানে হাত-দা, লম্বা কাঁইচি কিংবা পাইপগান। নয় তো টানা জাল, লোহার লম্বা ব্যোম্। চিনির বস্তা বাইরে থেকে খুঁচিয়ে দেখে নেওয়ার জিনিস। চিনির বদলে অন্ধকারে নুনও তো চলে আসতে পারে।

রিক্সার পিছু পিছু দৌড়ে খগেন আজই ভোর রাতের সেই সাপটাকে দেখতে পাচ্ছিল। সারা রাত খুঁজে খুঁজে আহারের কিছু পায় নি। ফিকে আঁধার-মেশানো আলোয় সাপটা থেকে থেকে জিরিয়ে নিয়ে মাঠ ভাঙছিলো। শামুকভাঙা কেউটে। বয়স একটু বেশি। খিদের চোটে এক ছোবলে শামুকের পিঠটা ফাটিয়ে নিয়ে ভেতরে থলথলে মাংসে মুখ ঢুকিয়ে দেয়। এ অবস্থায় অনেক সময় মানুষের হাতে মারাও পড়ে। লোভে লোভে মুখ মাথা—সবই যে তখন শামুকের ফাটা খোলের ভেতর। আজ ভোর রাতের কেউটে-টার গায়ের আঁশটে ঘষা গন্ধ বাতাসে পাচ্ছি খগেন। সে বেরিয়েছিল কয়েকটা শিবলিঙ্গ ফলের সন্ধানে। ছ'কোণা ওই ফল দিয়ে ঘটির জন্যে একটা তাগা বেঁধে দিতে হবে। সময়ে অসময়ে কলসী পাড়তে গাছে ওঠে। ভোর রাতের বাতাসে কেউটেটা আর এগোতে পারছিল না। ইচ্ছে করলেই ধরতে পারতো খগেন। জানতো—বেচারা এখন তার গর্তও ভালোমতো খুঁজে পাচ্ছে না। সারারাত কেটেছে খালের ধারে—জলের কিনারে কিনারে। সামনে অমাবস্যা। মাথা এখন বিষে ভারী মিনমিনে বাতাসে মাথাটাও ঠিকমতো তুলতে পারছে না। খগেনের চোখ পরিষ্কার বলে চিনতে পেরেছে মক্কেলকে। নয় তো ঠিকমতো ফণা তোলারও শক্তি নেই।

বিপিনবাবুর বয়স এখনো চল্লিশ হয় নি। দক্ষিণ মালঞ্চের বাজার-দোকানে পশার আছে। অথচ বাইরেকার লোক। এই সাত-আট বছর হল এখানে এসেছে। এসে বেশ জমিয়ে বসেছে। কেউ বলে, মহা ধুরন্ধর লোক। পেটে পেটে অনেক প্যাঁচ আছে। আবার কেউ বলে, ভবভোলা লোক। কলকাতায় অফিসে একটা চাকরি আছে। দক্ষিণ মালঞ্চে যত রকমের নেশার দ্রব্য আছে—সবই চেখে দেখে বিপিনবাবু। কিন্তু সংসারে কোথাও ঢিলেঢালা নেই তার। চাষকে চাষ। অফিসকে অফিস। আবার পরিবার নিয়ে যাত্রা সিনেমা দেখাও বাদ পড়ে না বাবুটির।

দৌড়তে দৌড়তে খগেনের সন্দেহ হল। তাকে ডেকে নিয়ে বেকুব বানাবে না তো? এই ডেকে নিয়ে দৌড় করানো কোন নতুন খেলা নয় তো বিপিনবাবুর?

কোথায়? দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? আয়—

খগেন আবার রিক্সার পিছু পিছু দৌড়তে লাগলো। ইট-পাতা বিপিনের রাস্তার দু'দিকে বিপিনই গাছ বসিয়েছে। এখন সেসব গাছ ছায়া দেয়। লাইন টেনে বিপিন ইলেকট্রিক এনেছে। অন্ধকার রাতে তিন চারশো বিঘের ভেতর একটা শাদা রংয়ের বাড়িতে ইলেকট্রিক জ্বলে শুধু। দক্ষিণ মালঞ্চের বাকি ইলেকট্রিক পীচরাস্তার দু'ধারের গমকলে। বেশির ভাগ আলোই রেল গেটের ওপারে।

খগেনের চোখের সামনে রেল গেটের এপারের চেহারা পালটাচ্ছে আজ তিরিশ বছর। বিপিনের মতো লোকজনের হাতে পড়ে। এই রাস্তা বানায় বিপিন। গাছ বসায়। আবার খালের জল দেখে বোরো ধানের চারা বসায়। পরিবারটি একদম বিবিটি। তবে গলায় ঝাঁঝ আছে। একদিন বেস্পতিই তা বলেছিল বাড়ি ফিরে। দুধ বেচতে গিয়ে বিপিনের পরিবারের হাতে নাকালের একশেষ। কী একটা যন্তর ডুবিয়ে বলেছিল—অর্ধেক জল। থানায় খবর দেওয়া দরকার।

. এসব শহুরে মেয়েছেলের হাত থেকে দূরে থাকা যে ভালো. তা বেস্পতি পরিষ্কার জানে। কথায় ঠাট-ঠমক আছে বিপিনবাবুর পরিবারের। বেস্পতি উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে বলেছিল, একি আমাদের মতো কপাল করে আসা। গলায় ঝাঁঝ দিয়ে, চোখ মটকে পুরুষমানুষটাকে কেমন বশে রেখেছে। দেখে এসো একবার—

খগেনের জীবনের কয়েক বছরের পুরনো একটা ঘা ঘষে আবার দগদগে করে দেবার জন্যেই বেস্পতির এসব কথা বলা।

খগেনের চোখের সামনে বিপিনবাবুর এলাকাটা এবার পুরোপুরি খুলে গেল। আশেপাশের গাঁয়ের লোকজন জন-খাটছে। নিড়েন। চাষের জমিতে জলছেঁচা। আলে-আটল পেতে মাছ-ধরা, সবই চলছে পাশাপাশি। একদম ধানক্ষেতে মাটি ফেলে বাড়ি তুলেছে বিপিন। বাড়ির চারদিকে তিন চারশো বিঘেয় আমন ধান হয়। বোরোতেও তা প্রায় তিরিশ বিঘের ওপর চাষ।

পাম্পশু খুলে রেখে বিপিনবাবু বারান্দায় উঠলো। একবার আমাদের কুকুরটাকে দেখবে খগেন?

ওরে বাবা! অত বড় কুকুর। বেঁধে রাখবেন, তবে ঢুকবো।

ভয় নেই। ভেতরে এসে দেখে যাও।

না। এক কামড়ে মাংস তুলে নেবে।

বাঘা আর সে-বাঘা নেই খগেন। নেতিয়ে পড়ে আছে। খাচ্ছে না কিছু। ডাকে না অব্দি।

শেষের কথাটা শুনে লাফিয়ে খগেন বারান্দায় উঠলো। দেখি। তো—

হুঁ। যা ভেবেছিল তাই। বিপিনবাবুর পাহারাদার বিলিতি কুকুর। কোন চোর-ছ্যাঁচড়ের কুনজরে পড়েছে। দিয়েছে বাজ-বরণের আঁঠা খাইয়ে। বাঘা তো বাঁচবে না—

কি বলছো? বলে বিপিনের পরিবার সামনে এসে দাঁড়ালো। ভালো করে ছাখো—

দেখেছি মা। কুলোকে বাণ মেরেছে। আপনাদের বাঘা আর ডাকবে না। রাত-বিরেতে ডেকে ডেকে আপনাদের সজাগ রাখবে না।

বিপিন চেঁচিয়ে উঠলো। কেঁদো না লক্ষ্মীটি! কী হচ্ছে সিধু? এই সিধু—

চোখ মুছে সিধু বিপিনের দিকে তাকালো। কাঁদবো না কি বলছো? তুমি যখন বাড়ি থাকো না, তখন তো ও-ই ভরসা। কুলোক দেখলে চেঁচিয়ে মাঠ মাথায় করে।

এ-কথার পর উপস্থিত তিনজনই বাঘার দিকে তাকালো। বছর পাঁচেকের একটি অ্যালসেসিয়ান। পুরুষ। একে ভাদ্র মাসে দক্ষিণ মালঞ্চের নেড়ীদের পিছু পিছু দেখা যায়। এখন যেসব দো-আঁশলা কুকুর বিলিতি লোম গায়ে দিয়ে কান ভেঙে ঘুরে বেড়ায়—তাদের বাবা এই বাঘা। তা বাঘা চোখ খুলে তাকাতে চাইলো। পারলো না। গোল হয়ে বসেছে। শির-দাঁড়ার ডিম-ডিম হাড় লোমের ওপর জাগা। ক'দিন খাচ্ছে না?

তা তিন দিন হয়ে গেল। বলে বিপিনের সিধু হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। ওকে বাঁচাতেই হবে খগেন। যে করেই হোক বাঁচাতে হবে।

বিপিন বললো, বেলেঘাটার হাসপাতালে নিয়ে যাবো কলকাতায়?

কোন লাভ হবে না। এখন জায়গা বদলানোও ভালো নয় বাবু। দেখি কি করতে পারি—বলে একটা খোন্তা চাইলো খগেন।

তারপর খানিকক্ষণ প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে খোন্তা হাতে খগেন নস্করকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। এ-বাগান সে-বাগানে। খানিক মাটি খোঁড়ে খগেন। গন্ধ শুঁকে দেখে। আবার খোঁড়া জায়গা মাটি চাপা দিয়ে যায়। খগেনের বড় ব্যাটা হাজরা নস্কর

নিড়েন দিচ্ছিল। একবার উঠে এসে বললো, বাপ, তুই পারবি তো? যদি পারিস তো ভাল হয় খুব। কর্তা গিন্নীর ছেলেপুলে বলতে ওই কুকুরটা।

একদম আটকুড়ো?

ভগমানের মার! বাঘাকে বাঁচাতে পারবি তো বাপ?

তুই তোর কাজে যা তো। জীবন নেওয়া সোজা, দেওয়া কঠিন।

বেলা দু'পহর হয়ে গেল। খগেন তার দরকারী শেকড়ের সন্ধান পেল না। মন্দের ভালো আরেকটা শেকড় নিয়ে গিয়ে বাঘার নাকের কাছে ধরলো। তাতে বাঘা চোখ তুলে চাইলো। আস্তে আস্তে উঠেও দাঁড়ালো। বোঝাই যায়, পা কাঁপছে। সেই অবস্থায় হেঁটে হেঁটে বাড়ির পুকুর ঘাটলায় গিয়ে বসলো। জলে পেট ডুবিয়ে।

সন্ধ্যে নাগাদ খগেন বললো, বাঁচানো যাবে না।

বাঘা ততক্ষণে আব র জল থেকে বারান্দায় উঠে এলো। জিভ ঝুলে পড়েছে। খগেন মনে মনে ভাবছিল, বক্রেশ্বর থেকে যদি বজরা হয়—তাহলে কী থেকে সিধু হয়? সিদ্ধেশ্বরী? না, সিদ্ধিময়ী? ভদ্দরলোকদের তো ও রকমই নাম হয়।

জনখাটুনি লোকজনের সঙ্গে অন্ধকার মাঠ দিয়ে হাজরাও এক সময় চলে গেল। তখনো বাঘা মরে নি। মরলো যখন, তখন রাত আটটা চল্লিশের আপ গাড়ি এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। বিপিনবাবু বেশ ষণ্ডা আছে। খালি গায়ে পাঁজাকোলে বাঘাকে তুলে নিল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে অন্ধকার খাল পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো। জল-চলকানো একটা ধপাস শব্দ। কোমরজল—হাঁটুজল—নানা উঁচুনিচু দিয়ে বাঘা চলে যেতে লাগলো। বেশিক্ষণ দেখতে পেল না বিপিন। তবু সে এই খালপাড় থেকে ফিরে আসতে পারে না।

এক সময় সে স্কুল কলেজে পড়েছিল। এক সময় সে মন দিয়ে চাকরি করতো। এখন সে মন দিয়ে সারা শরীরে দক্ষিণ মালঞ্চের রস টানে। মাটিতে। তাড়িতে। ধানের পাকা বিচুলি ঝাড়ার সময়কার পুষ্ট, হলুদ-ঝরা ধানে। এসব সময় সে খালের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় মনে মনে বলেছে—খাল। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছো? বর্ষার নিশুতি রাতে ভরা খাল কথা বলে উঠেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা হইতে। কোথায় যাইতেছে?

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়।

বিপিনবাবু খালিহাতে বাড়ি ফিরে এলো। চ্যাটালো পিঠ, চ্যাটালো বুক দেখে খগেন বুঝতে পারছিল—সুখী, সফল লোকজনের এমন ধারার শরীর হয়। না-কালো, না-ফরসা। মাঝারি গড়ন। পায়ের পাতা বাঁকা নয়।

তুমি কাল একবার এসো তো খগেন।

তা আসবো। দরজাবী শেকড়টা যদি খুঁজে পেতাম—তাহলে হয়তো বাঘকে বাঁচানো যেতো।

তুমি আর কি করবে? যা করার তো করেছো। এই নাও—বলে বিপিনবাবু তার হাতে দশ টাকার নোট গুঁজে দিল। সবার আগে শিবু খগেনের কোঁচড়ে এককাঁসি পুরনো চাল ঢেলে দিল।

সেই চাল কোঁচড়ে অবস্থায় খগেন নস্কর একটা রোগা খাল হাঁটুজলে পার হল। সামনেই তার গাড়ুপাতালের মাঠ। পর পর সব মৌজা। নাম মুখস্থ খগেনের। গাড়ুপাতাল। দ্বারিকপোতা। দক্ষিণ মালঞ্চ। অভয়নীল। ছোটবেলায় একবার জরীপ হতে দেখেছিল। তারপর আর হয় নি। এইসব মাঠে যদি বিপিনবাবুর মতো লোক এসে বোরো চাষ জুড়ে দিত, তাহলে দেশটায় আর কাজের অভাব থাকতো না।

এতদিন সে জানতো বিপিনবাবুরা খুব সুখী লোক।

আজ জানলো আরেক রকম। এক থাবড়া চাঁদ কেউ ঘুটে করে আকাশে লেপে রেখেছে। শাদা উঠোনে একখানা অন্ধকার খগেনের জন্যে বসেছিল। বাড়ি ঢুকতেই বজরা চেঁচিয়ে উঠলো, মরা কুকুর জ্যাতা করার ভার নিতি গেলি কেন? তোর লজ্জা করে না?

কিসের লজ্জা?

নিজির ছেলের কাজে নাক গলাস?

সে আমি কুকুর দেখেই বুঝিছি। কিন্তু একটা অবলা জীবের জীবনটা নিয়ে—

মায়া রাখো তোমার কাঁচড়ে। বাঁচাতে পারলে?

না।

জানতাম। তোমার চেয়েও বড় গুণীনকে চিনি।

সেই কাছারিবাজারের মহম্মদ বাজিকর তো! ও তো কিছুই জানে না বাবা। শুধু সব্বনাশের রাস্তাগুলো শিখে রেখেছে। কি জিনিসে কি ক্ষতি করা যায়।

তোমার চেয়ে বড় গুণীন। হিংসে করো কেন? নিজির তিনখানা রিক্সা সাইকেল খাটে বাজারে।

তিনখান কেন? তিরিশখানাও খাটানো যায় বাপ! তোমার এখন অল্প বয়স। রক্তের জোর আছে। তুমি সব জিনিস তো বোঝো না—

আর তুমি সব বুঝে বসে আছো! তাই না?

তকরার করে লাভ কি বাবা? তোমার বিশ্বেস নিয়ে তুমি থাকো। বাজিকরকে আমি চিনি নে। রূপসী সিনেমা হলের পিছন দিকটায় বাড়ি। হলের মধ্যি গান বাজলি ঘরে বসে শোনে বাজিকর। কথা বলতে বলতে তাল দেয়—মাথা দোলায়—

সেটা কি কোন অপরাধ?

না, না। তা কেন? তবে কিনা ছোটখাটো জিনিসি মানুষজন চেনা যায় তো।

আর কথা হয় নি বজরার সঙ্গে।

কোঁচড়ের পুরনো চাল বেস্পতির আঁচলে ঢেলে দিতে দিতে খগেন বললো, রেখে দে। দশটা টাকাও দিয়েছে চিকিচ্ছের জন্যি।

শহর গঞ্জের লোক। সাবধানে মেলামেশা করা উচিত। শেষে বিপদে না পড়ো—

আমি তো কাউকে ঠগাচ্ছি না।

তবু শহরের লোক কিন্তু ফ্যাকড়া বের করে শাসায়।

সে আমি বুঝবো। আজ দুটো ডাঁটা ফেলে দিস তো ডালে। তেউড়ে কলাইটা ভেজে নে চাপাবি কড়ায়। নয়তো ভুঁইঘষা গন্ধ থাকে ডালে।

এই রাতে ডাঁটা পাবো কোথায়?

খাবার বড় শখ হচ্ছিল বেস্পতি।

নাতি-নাতনী হয়ে গেল, তবু নোলা গেল না।

বুড়ো হলেই তো নোলা বাড়ে রে বেস্পতি।

আর কথা এগোলো না। উঠোনের কোণে হাজরার পেত্নীটি খালি বাটি-হাতে দাঁড়ানো। হাজরা এখনো ফেরে নি। বেস্পতি জানে, এখুনি বউ চাল চাইবে। নয়তো খানিকটা কলায়ের ডাল। কমের ওপর হলে পাকা তেঁতুল। মাঠঘাট থেকে সময়মতো পাকা তেঁতুলটাও কুড়িয়ে রাখতে পারে না? এত অকম্মা?

উঠোনে জ্যোৎস্না এসে পড়ার উপক্রম। কেননা, এ বাড়ির উঠোনে এসে পৌঁছনোর জন্যে চাঁদকে তিনটে বটতলা, মিস্ত্রীদের বড়দীঘি পেরিয়ে তবে এদিকে আসতে হয়।

রোসো। নে আসছি—বলেই খগেন উধাও হলো।

বেস্পতি চেঁচিয়ে বারণ করলো। এই ভর সন্ধ্যেবেলা ও-বাড়িতে ঢুকো না। আঁটকুড়ো বেওয়া মানুষের ঘরদোর সন্ধ্যেরাতে, নিশুতিতে, খুব ভোরে আর ঠিক দুপুরে খুব ভালো জায়গা নয়। বড় আশা নিয়ে মাগীটা মারা যায়। তার পোড়ো ঘরদোরে এভাবে ছুট

করে ঢুকতে নেই। অনেক কিছুই মনে আসছিল বেস্পতির। এখন বয়স হয়ে এলো। এখন এসব ভেবে লাভ নেই কোন।

ভালো অবস্থার চাষীবাড়ি যেমন হয়—বাড়িটা ছিল তাই। চওড়া করে মাটির দেওয়াল ঘেরা উঠোন। বর্ষার জলে যাতে না গলে, সেজন্যে দেওয়ালের মাথায় মাথায় খড়ের টোপর বসানো। সে-সব আর এখন কিছু নেই। একদিকের দেওয়াল হেলে পড়েছে। গত বর্ষায় দক্ষিণের দেওয়ালটা একদম দাঁত-পড়া বুড়ো, হল-হল করছে।

বেস্পতি উঠোনের বাইরে এসে বললে, বেরিয়ে এসো। ও ডাঁটা আমি রাঁধবো না।

কে শোনে কার কথা! খগেন তখন পোড়ো বাড়িটার উঠোনে। চাঁদ বাড়ি খুঁজে আলো দেয় না। যা পথে পড়ে সেখানেই জ্যোৎস্না ফেলে দেয়। ঘোর নো দাওয়ায় বড় ঘরের বাড়ি। ছাউনির গোল পাত, পচে গিয়ে ঝুরঝুরে। দিনের বেলায় কাঠবেড়ালী, বেজি, নয় তো দু-একটা কাক বসতে দেখা যায়।

সুমতি বেঁচে থাকতে এ-উঠোন গমগম করতো। সে এ-দেশের মেয়ে নয়। বেওয়া হওয়ার পর তার মুখ দেখা যায় প্রথম। নয়তো ভাতার থাকতে থাকতে তার গলার স্বরের আন্দাজও পায় নি কেউ।

আরে বাবা! এ ডাঁটা? না বাবলা গাছ? মাথায় মোরগ-ঝুঁটি ফুলের ধারা, বুড়ো বীজের গোছা। বাতাসে, পাখিতে—এ ক'বছরে যা বীজ পড়েছে—তাতে সারা উঠোনটাই কচি আর বুড়ো ডাঁটার বাগান। জিনিসটা বর্ষাকালের। আসলে তখনই স্বাদ হয়। আলো-আঁধারিতে খগেন যেই না একটা ঝাঁপানো কচি ডাঁটা তুলতে গেছে, আর অমনি লুকিয়ে-থাকা বীজখোর এক টিয়া খগেনের মুখের ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

চমকে উঠেছিল খগেন। এখানে সে মাঝে-মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে আসে। বেস্পতি তখন দুধের কেড়ে মাথায় দক্ষিণ মালঞ্চ চষে

বেড়ায়। খা-খা দুপুরে ট্রেন বাঁশি দিয়ে স্টেশন ছাড়ে। সব শুনতে পায় খগেন এ-উঠোনে দাঁড়িয়ে।

ডাঁটার গোছা হাতে বাড়ি ঢুকতে দেখে বেস্পতি ঝাঁঝিয়ে উঠলো। ছুতোনাতায় ও-বাড়ি না গেলেই না?

ও-বাড়ির আর আছে কি বেস্পতি! কিছু কি বাকি রেখেছো?

পাখি তো ফুড়ুৎ। তাই না?

একটা মানুষ মরে গেলে ওভাবে বলতে নেই।

এখনো বুকে গিয়ে লাগে! হাজরার বউ বলছিল—দুপুর-দুপুর তুমি নাকি উঠোনে গিয়ে বসে থাকো।

আমি গাছপালা, শেকড়বাকড় চিনি। বত জায়গায় যেতে হয় আমায়—

বেছে-বেছে ও-জায়গাটা কেন?

আজ কি সুস্থ শরীরে দুটো খেতেও দেবে না?

রোসো। রান্না চাপাই আগে।

এর পর আর কথা এগোয় না। উঠোনে বসে বজ্জবা তার যন্ত্রপাতি নাড়ে-চাড়ে। আর একা-একা কথা বলে। এ সময়টায় কেউ রা কাড়ে না। বজ্জরার কথার ধরনটা অনেকখানি এ রকম—

ভগবান ব্যাটা বড় বেআক্কেলে। যে খেতে পারে, তাকে দেবে না—বুড়োর কোলে যত ঝোল।

এখানে বুঝে নিতে হবে—কোন অর্থশালী বৃদ্ধের জিনিসপত্তর, ঘরবাড়ির ওপর বজ্রেশ্বর নস্করের দৃষ্টি পড়েছে। নামটা জানতে পারলে খগেন ঘটিকে দিয়ে আগাম খবর পাঠিয়ে সাবধান করে দেয়।

কিংবা—

স্টেশন মাস্টারের অসুখ আছে। বড় রাত জাগে।

অর্থাৎ, ব্যোমচুকি চিনি, [illegible] ওয়াগন ভেঙে বের করা কঠিন হয়ে উঠছে।
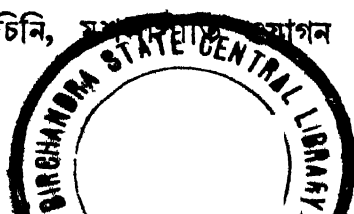
সামনের চাকা খুলে দিতে হবে লোকটার।

মানে—একখানা পা দূর থেকে পাবড়া ছুড়ে ভেঙে দেওয়া হবে—প্ল্যাটফর্মে কেউ থাকবে না।

আপন মনে বজ্রেশ্বর নস্কর অনেক সময় 'ডেয়ালগ' দেয়। যেমন—

তুমি কি আমায় ভালবেসেছো? গুণনিধি?

বাসি। বাসি। বাসি। তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার?

এসব হলো গিয়ে পালাগানের কথাবার্তা। যাত্রার ভিড়ে ছিনতাই করতে গিয়ে বজরা শুনে ফেলেছে। শুনে অনেক কথা তার বুকে গেঁথে যায়। কিছু কথা বুকে বিঁধে থাকে। আত্মঘাতী বউটার এক ধারার হাসি এখনো সে চোখের সামনে দেখতে পায়—নিশুতি রাতে—ট্রেন লাইনে উঠে।

বেম্পতি কড়ায় হাতা নাড়া থামিয়ে বলে, ওইটে বল তো বজরা—সেই যে—মহারানী তুমি—

বললে বুঝবি? যা করছিস কর।

বাড়ির বাকি সবাই তখন চুপ করে থাকে।

দুই

সেদিনই রাতে ওয়াগন ব্রেকাররা অ্যাতো পেটো ঝাড়লো— মালগাড়ি ভিড়তে না পেরে বেলেঘাটায় ফিরে গেল। জ্যোৎস্নারও এক রকমের তাত আছে। পাশ ফিরে শুয়েই মাটির দেওয়াল-কাটা জানলায় চোখ পড়লো খগেনের। পড়তেই তো সে অবাক! তালকাঠ চেরাই করে আলকাতরা মাখানো গরাদ। তার বাইরে কচুবন, বন-ধুঁধুলের জঙ্গলে একখানা রিক্সা-সাইকেল। সিটে স্বয়ং ভগবান বসে। হাতে কৃষ্ণের বাঁশি। মাথায় বিষ্ণুর টোপর। ঠোঁটে আলতা।

চোখাচুখি হতেই ভগবান সিট থেকে নেমে হেঁটে এগিয়ে আসতে লাগলো।

কখন ভোর হয়ে গেছে। ওঠো।

বিশ্বাস হচ্ছিল না খগেনের। কখন এলেন? কোন্ দিক দিয়ে?

কেন? পয়লা লোকালে। স্টেশন থেকেই রিক্সা নিলাম।

চিনে আসতে পারলেন?

তোমার ঘর চিনবো না খগেন। এটা কি বলছো। আমিই তোমাকে এ দুনিয়ায় পাঠালাম—

যদি পাঠালেন তো একটু মুখ তুলে চাইলেন না কেন আমার দিকে?

কেন? তুমি তো ভালোই আছো।

কোথায়? কেউ মানে না। সংসারটা তো আপনি দেখছেন। ওই তো বউ। ওই তো আমার ছেলেগুলান। এর পর কি বলবেন আপনি? আমি ভাল আছি বলতে পারবেন?

ভগবান তখন তখনই কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর পায়ে

পাম্পসু। কালো রংয়ের। ভগবানের ভোরবেলার আলোর রঙ কিছু অন্য রকম। তাই কালো পাম্পসু অন্য রকম দেখাচ্ছিল। বাইরে এসো—

এখুনি আসছি।

খগেন বেরিয়ে আসতেই ভোরবেলাটাকে চিনতে পারলো। ভগবানের গায়ের বেগুনি রঙের উড়ুনির রঙে রাঙানো। ফরসা আলো। কিন্তু জায়গায়-জায়গায় গাঢ়। সেখানটায় ফিকে হয়ে বেগুনি ফুটে উঠেছে।

ভগবানের গায়ে সবেদার রঙ। বুকে হাজরার মতো ঘন কালো লোম। খগেন আসতেই তিনি রিক্সাওয়ালাকে বললেন, তুমি চলে যাও।

থাকি না বসে। আপনাকে নিয়ে যাবো। সেই আটটা চল্লিশের আগে আর ট্রেন নেই।

কত খদ্দের পাবে। আমার জন্যে বসে থেকো না।

রিক্সাওয়ালা অনিচ্ছায় প্যাডেল করে চলে গেল। এখান যে রাস্তা আছে—সে রাস্তা দিয়ে নয়। বরং কচুবন, আগান-বাগান মাড়িয়ে রিক্সার তিন চাকা খালের জল মাড়িয়ে দিব্যি ওপারে চলে গেল।

ভগবান খগেনকে নিয়ে একটা বকুলতলায় বসলেন। সারারাত ফুল পড়েছে। বুড়ো গাছ। শেকড় জুড়ে বিষ-পিঁপড়ের বাসা।

তোমার অসুবিধে কিসের খগেন? সবাই তো তোমায় ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

হাতে তো পয়সা নেই আমার। তাই কেউ মানে না।

পয়সা হলেই মানবে?

লোকের তো তাই দেখি। আমার তো ভিখিরীর দশা ভগবান।

ভগবান হাসলেন। আরেকবার তো তাই হয়েছিল তোমার। সুমতি যেবারে মারা গেল।

খগেন চুপ করে থাকলো। বেওয়া মানুষ ছিল সুমতি। পয়সাওয়ালা বাঁজা বেওয়া মানুষের শোকে লোকে হাসে। কে কতটা হাতাবে তাই ভাবে। বেম্পতি মানত করেছিল—সুমতি যদি মরে তো পঞ্চাননতলায় একটা চৌকো দেবে। মানে পাঁচ পয়সা। মাইতিমশায়ের তিনকালে কেউ ছিল না। বুড়ো বয়সে বিয়ে করে আনেন সুমতিকে। বেশিদিন সংসার করা হয় নি সুমতির। বিশ-বাইশ বিঘের খরিদা সম্পত্তি মাইতিমশায়ের। তার নিজ-চাষ দেখতে হোত সুমতিকে। সে সেই মাইতিমশায় থাকতে থাকতেই। সুমতির ডাকে খগেন গিয়ে ধান ঝেড়ে দিয়ে এসেছে। সেই উঠোনে এখন ভরা-জঙ্গল। বেওয়া বাঁজা মানুষ হলেও লোক-লস্কর করে দশ বারো মন ধান তুলেছিল সুমতি। একবার চাষের মরশুমে রোয়ানির সময় সুমতি দেখাশুনোর জন্যে খগেনকে রেখেছিল। কী মিঠে গলা। ভাত বেড়ে দেওয়ার ঢঙটি বড় সুন্দর ছিল। রাখালের মাথায় ভাতের গামলা দিয়ে নিজে এসে আলে দাঁড়াতো সুমতি। বর্ষাকালে। জমির কানাতে।

সেই থেকেই তো বেম্পতির সন্দেহ। সন্দিবাই জিনিসটা বুনো কচুর মতো এ-বাই যার থাকে, তার মন বড় চুলকোয়। সেই চুলকুনিতে বেম্পতি এত বছর জ্বলেছে—খগেনকে জ্বলিয়ে আসছে।

সব একসঙ্গে মনে পড়ায় খগেন খুব দুঃখে বললো, হ্যাঁ ভগবান।

সেবারে তো তুমি আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলে। তখন কাঠের রেলগাড়ি। লাইনে গলা দিয়ে শুয়েছিলে নিশুতি রাতে। মনে পড়ছে?

খুব। একটা ষাঁড় কোত্থেকে এসে আমাকেই তাড়া করলো। তখন মালগাড়ির ইঞ্জিন এসে গেছে।

ষাঁড়টি কে ছিল বল তো?

ষাঁড় আবার কে? ষাঁড় তো ষাঁড়।

ভগবান খুব রহস্য করে হাসলেন। অত রাতে ষাঁড় কোত্থেকে আসবে? আমি দেখলাম, ইঞ্জিন তো এসে গেছে। ষাঁড় হয়ে গিয়ে তোমায় তুলে দিয়েছিলাম।

সে সময়টা বড় খারাপ গেছে। সুমতি যে মরার আগে রেজিস্ট্রি কোর্টে গিয়ে আমার নামে সব লিখে দিয়ে গেছে, তা আমি জানি নে।

জানার পর?

কিস্কিন্ধে কাণ্ড। বেস্পতি ও-বাড়িতে আমায় একদিনের জন্যেও ঢুকতে দেয় নি।

মাইতিশায়ের বাইশ বিঘের খরিদা সম্পত্তি?

সবই তো আপনি জানেন। আপনি হলেন গিয়ে অন্তর্যামী।

সব জানি না খগেন। বকুলতলা ভালো লাগছে তোমার? জায়গাটা বেশ নির্জন—তাই না?

হ্যাঁ। যাদের দিয়ে সুমতি চাষ করাতো, জন লাগিয়ে মজুরি দিয়ে—তারাই পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের বর্গাদারী মিথ্যে মিথ্যে রেকর্ডে লিখিয়ে নিলে। এখন আমার ভাগটাও দেয় না। সবই কপাল ভগবান।

দখল নাও।

তাতে জোর লাগে। পয়সা লাগে। পুলিস লাগে। কোনোটাই আমার নেই ভগবান।

সব আমি যোগাড় করাবো।

নাঃ। সে-সবে আর ইচ্ছে নেই। আমারই মতো গরিব লোকেরা করে খাচ্ছে। আমাদেরই দেশের মানুষ সবাই। জোর করে দখল নিলে লোকে কি বলবে শেষে?

বাঃ! ও জায়গা তো তোমার নামে সুমতি লিখে দিয়ে গেছে। তোমার জিনিস তুমি বুঝে নেবে না? লোকে বলবে কি শেষে?

আসলে তো আমার নয়। মনে একটা ভাব উঠেছিল সুমতির। তাই আমায় ওয়ারিসান করে দিয়ে গেছে।

তার মানে তো তুমিই ওই বাইশ বিঘে সম্পত্তির মালিক। এ বাজারে কত দাম বল তো বাইশ বিঘের? সোজা সম্পত্তি?

আমার মন নেয় না ভগবান।

লোকে তোমায় আর পুরুষমানুষ বলবে?

ও-সব কথায় আর দাগ পড়ে না ভগবান। পুরুষমানুষ মানে কি শুধু দখল? গায়ের জোর? লোহার রড? পাইপগান? অন্যের হেনস্থা করা? আপনিই বলুন?

ভগবান খুব ভালো করে খগেনকে দেখলো। ফরসা আর তামাটের মিলমিশের চামড়া। হাড়-গোড় চেহারা। গায়ে একটি ফরসা ফতুয়া। খেটো ধুতির নরুণ-পাড়ে কালো মুগের ফুল। মাথাটা অগোছালো। গালের ঝিক জাগন্ত। চোখে রাত জাগার কাজল। সুমতিকে দেখবে?

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো খগেন। কোথায়?

চলো। বলে ভগবান উঠে দাঁড়ালেন। আমার হাত ধরো।

বকুলতলা থেকে তিন পা না-ফেলতেই চেনা জায়গাটা অন্য রকম হয়ে গেল। বর্ষাকালের পরিষ্কার সকালবেলা। আলের ওপর দিয়ে সুমতি আসছে। হাতে বেঁটে ছাতা। কি গো হাজরার বাপ? আজ কাজে এলে না?

বিশ্বাস হচ্ছিল না খগেনের। জীবনে অ্যাতোও শান্তি থাকে! সুমতির চেহারাটা ফিরেছে। সেবারে রাজপুরের শ্মশানে তবে কাকে পোড়ালাম? তুমি বেঁচে আছো?

আহা! সকালবেলাই মসকরা! শুধু শুধু মরতে যাবো কেন? তোমার বেস্পতি দাসী যতই মানত করুক, আমি বেঁচে আছি। যাও, যাও, কাজে লেগে পড়ো। বীজ বুঝে নাও। মাথা পিছু তিন

পণ করে রুইতে হবে সবাইকে। এক গণ্ডা কম হলে আমি খাটুনির পয়সা কাটবো কিন্তু। চাষীদের বলে দিও।

আজ কি রেঁধেছো গো মাইতি বৌদি ?

কেন ? আমার কি কোন নাম থাকতে নেই ? সুমতি নামটা ভুলে গেলে ?

খগেন চারদিক তাকালো। মাইলের-পর-মাইল চাষের জমি দূরে মেঘ অব্দি ছুটে গিয়ে আকাশের গা বেয়ে ঠেলে উঠেছে। সব জায়গায় রোয়া করার মতো জল রয়েছে। না-শীত—না-গরম—এমন একখানা রোদ্দুর আকাশে।

তবে কাকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে গেলাম সুমতি ?

সে আমি জানবো কি করে ? বেস্পতি নয় তো ?

সে ভাগ্য করি নি সুমতি।

ছিঃ! ওকথা বলতে নেই ভোর-ভোর। তুমি তো গুণীন মানুষ। হয়তো মরে গিয়েছিলাম, আবার বেঁচে উঠেছি তোমার তুকতাকে। তাও তো হতে পারে। কেমন কিনা ?

সবই হতে পারে। শেষে চিন্তিত গলায় খগেন বললো, ভগবান কোথায় গেলেন ?

কোথায় ভগবান দেখলে ?

কেন ? এই তো তিনি আমায় এখানে নিয়ে এলেন।

ও তো তোমাদের মাইতিমশায়।

কি বলছো ? হাতে বাঁশি। মাথায় টোপর। ঠোঁটে আলতা। পিঠে বেগুনি উড়ুনি। সবেদা রঙের বুকে কালো লোম। পায়ে পাম্পসু।

ওসব দেখে ভুলেছো। তবেই তো। কাল রাতে গোষ্ঠ ছিল। তোমাদের মাইতিমশায় তো কেষ্ট হলেন। সেকি লীলা! সারারাত পাম্পসু পরে নাচলেন। গাইলেন। পালার শেষে নিজেই রিক্সা ভাড়া করে তোমার বাড়ি।

হাঁপানি সেরে গেছে মাইতিমশায়ের ?

কবে? তুমিই তো কী শেকড়-বাকড় দিয়ে সুস্থ করলে সেবারে। ঘটি তখন হাঁটতে শিখেছে।

কিন্তু সুমতি। মাইতিমশাই সত্যি মারা যান নি ?

মরলে তোমার সুবিধে হোত, তাই না ? কাঁচা বউখানা, আর বাইশ বিঘের সম্পত্তি—

ছিঃ! ছিঃ! ওসব কথা বলতে নেই। আমার মনেও আসে নি কোনদিন।

কেন ? খুব তো পরনারীর দিকে টালুস-টুলুস করে তাকানো। যাও, কাজে লাগো গিয়ে।

সুমতির মুখের দিকে তাকিয়ে খগেন বুঝতে পারছিল—সে ঠাট্টা করেই খোঁটা দিচ্ছে। এর ভেতর কোন বিষ নেই। মাঠে নামছিল খগেন।

সুমতি থামালো। তুমি না তন্তর-মন্তর শিখেছো ?

খুব বেশি কিছু না সুমতি। ছোটবেলা থেকেই তো মাঠে-ঘাটে আগানে বাগানে ঘুরে বেড়াই। সেই থেকে শেকড়-বাকড় চেনা। এ-ফল সে-ফুল চিনি। শিবলিঙ্গ ফল যে কত কাজের, সে তো আমি বালক বয়সেই চিনি।

অল্প বয়স থেকেই এচোঁড়ে-পাকা! পরের বউয়ের দিকে নজর কেন ?

সে-চোখ আমার আজই আমি গেলে দেব।

ওমা! সেকি ? তোমাকে তো ঠাট্টা করারও উপায় নেই। হাজরা বলেছিলো, তুমি নাকি শ্মশানেও শিক্ষা করেছো। জ্ঞানীগুণী হয়েও চোখে পোকা পড়লে পুরুষ মানুষের এই দশা হয়। আমায় এত মনে ধরলো কেন ?

শ্মশান-মশানে ছোটবেলা থেকেই ঘুরি। কিন্তু সুমতি, তোমরা বেঁচে উঠেছো সত্যি ?

কী মুশকিল! এই তো আমি। তোমার ভগবানমশায় জুতো-জামা ছেড়ে আসতে গেছেন।

কি কিন্তু?

তোমাদের ঘরবাড়ি যে জঙ্গল হয়ে আছে।

সে-সব কবে সাফ হয়ে গেছে।

কোথায়? আমি যে ডাঁটা নিয়ে এলাম তোমার উঠোন থেকে। জঙ্গল—জঙ্গল—

সেই ডাঁটাগুলো এখনো খাচ্ছো?

বীজ পড়ে পড়ে নতুন ডাঁটার জঙ্গল একদম।

খগেনের ঘুম ভাঙলো জানলার দিকে তাকিয়ে। তাল-কাঠের গরাদে চাঁদখানা তিন টুকরো। ভোর-রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে ঘরের পেছনের গাছপালা শব্দ করে দুলছে। তার এখনো মনে হচ্ছে—স্বপ্নে কি ভগবান ঠকায়? ভগবান কি করে মাইতিমশায় হয়ে যায়? মাইতিমশায়ের তো জানার কথা নয়, আমি সুমতি চলে যেতে আত্মঘাতী হচ্ছিলাম। সত্যিই তো, নিশুতি রাতে মালগাড়ির ইঞ্জিনের দক্ষিণ মালঞ্চের ধর্মের ষাঁড়টা এসে দাঁড়িয়েছিল। এর অনেক আগেই তো মাইতিমশায় গত। তা হলে? ভগবান কি ঠাট্টা করে? কখনো শুনি নি। আর মাইতিমশায় কি করে গোষ্ঠে ঢুকলেন? বেস্পতি তখনো ওঠে নি। একটু পরে উঠে গরুগুলোকে মাঠে ছাড়তে বেরোবে। গোবর কাড়াবে। তার আগে বেরিয়ে পড়লো খগেন।

বাড়ির পেছনটায় যেখানে ভগবানের রিক্সা-সাইকেল ছিল, সেখানটায় নিচু হয়ে তাকালো। নাঃ! ধুলো-ধুলো মাটিতে চাকার কোন দাগ নেই। ভোর-রাতের আলোতে অন্ধকার কেটে যাচ্ছিল। এই সময়টায় চাঁদ আপনা-আপনি আকাশের সঙ্গে ফিকে হয়ে মুছে

যায়। পথে একটা শ্বেত আকন্দ পড়লো। গোড়াটি এখনো শক্ত হয় নি। নিশ্চয় উই বাসা করেছে। গোড়াটা ধুলো-ধুলো। পোষ-মাসে বাস্তুপুজোয় খুব লাগে। হাঁটতে হাঁটতে একটানে গাছটা টেনে তুলে ফেললো।

বাড়ির বাইরেই ভিজে ঘাসে পায়ের পাতা ঠাণ্ডা লাগছিল। একটা খড়িচোচ্ সাপ ঘাসের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। খগেনকে দেখে সাবধান হয়ে গেল।

খগেন ডেকে বললো, এই ভোর-রাতে কোথায় যাচ্ছিস ?

সাপটা দাঁড়িয়ে পড়লো।

খগেন বললে, কাল রাতে কিছু জুটেছে ?

খড়িচোচ্ সুল-সুল করে তু'বার জিভ দেখালো।

খগেন বললো দাঁড়া। দেখি কি আছে। এই না বলে খগেন আশপাশের গাছের পাতায় ছোটখাটো গুবরে পোকা খুঁজতে লাগলো। বড় পোকা ওরা গিলতে পারে না। খড়িচোচের হাঁ-মুখ বিশেষ বড় নয়। শেষে গলায় আটকে গিয়ে কেলেঙ্কারি বাঁধাবে। হাতের শ্বেত-আকন্দর পাতা ছিঁড়ে নিয়ে একটা আসশেওড়ার গা থেকে বেশ ড্যাবডেবে মোটা এক রাতপোকা ধরলো খগেন। একটু টিপ দিতেই অক্কা। তখন পোকাটা নিয়ে আস্তে খড়িচোচের মুখের সামনে ফেলে দিল। খেয়ে ত্যাখো তো।

খড়িচোচ্ তু'বার জিভ দেখালো। অর্থাৎ তুমি সরে যাও। আমি খেয়ে নেবো ঠিক।

যাচ্ছি যাচ্ছি, বলে খগেন এগিয়ে চললো।

খগেনের মনে পড়লো, এ-সাপ কামড়ালে মৃত্যুর আগে প্রথমেই নাক বসে যায়। খতম হবার আগে মানুষজন খেনা গলায় জল চায় বার বার।

ইচ্ছাপুর শ্মশানে কিছুকাল ছিল খগেন। তখনো বাপ বেঁচে। বে হয় নি তার। প্রায়ই এদিকে-সেদিকে চলে যেতো সে। বাপ

ডেকে বলতো, ও খগেন, বাপ আমার। আমি তো বুড়ো হলাম। এবার তুই আয় আমার পাশে।

আসি-আসি করেও যাওয়া হয় নি খগেনের। দীঘির পাড়ে বসে খগেন শ্যাওলার দিকে তাকিয়ে কী যেন মনে করার চেষ্টা করতো। কোথাও কোন হারিয়ে-যাওয়া বন, জল, ছুটন্ত বিদ্যুৎ ঝলকের হারিয়ে-যাওয়া। একটুর জন্যে মনে পড়ছে না। বাপের পাশে সে যেতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। কোন মেলায় গিয়ে কাঠের কারবারীর হয়ে ঝাড়া এক মাস বেলনি, পিলসুজ বিক্রি করেছে। সন্ধ্যে-রাতে অজানা নদীতে পা ধুতে নেমে হেঁটে জল পার হয়ে মাঝখানের চরে উঠে গেছে পরদিন ভোর থেকে সাপুড়ে পরিবারের বন্ধু হয়ে থেকে গেছে। তাদের সঙ্গে মাসের-পর-মাস চর-জঙ্গলে সাপ ধরা। গর্ত চেনা। মাটি খুঁড়ে আগে খন করে মাথাটি ধরে ফেলা। কত কি করে গেছে নেশায়-নেশায়। মাসের-পর-মাস। বছরের-পর-বছর

এ-ভাবেই ঘুরতে-ঘুরতে ইছাপুর শ্মশানে সব শ্মশানেই চর্বি পোড়া গন্ধ। তার সঙ্গে কাঠের ধোঁয়া। অবস্থাপন্ন মড়ার চিতায় এর সঙ্গে ঘি মিশে গিয়ে বাতাসটা অন্য রকম করে দেয়। চেকার-বাবু ইছাপুর স্টেশনে তাকে ধরেছিল। ভোরবেলায় ফাঁকা কামরায় বসে খগেন জানলার বাইরে লোকজন দেখছিল। কোথায় যাবে জানে না। যে স্টেশনের চেহারা মনে ধরবে, যদি প্ল্যাটফর্মের গায়ে পুকুর থাকে, সেখানে নেমে পড়ে একবার চান করে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। এমন সময় চেকারবাবু প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে নিল।

এর আগে একবার খগেন সিঙ্গুর, আরেকবার দত্তপুকুরে ধরা পড়ে মাস দুই করে হরিণবাড়ি ঘুরে এসেছে। সরকারী জেল-খানাগুলো বড় নোংরা। অত কুখাদ্য সে কোনদিন কোথাও খায় নি। তাই হরিণবাড়ি আবার যাওয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না তার।

হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়ে রেল এলাকার বাইরে। হাঁপাতে-হাঁপাতে এক বটতলায়।

সেখানেই শুকনো পাঁউরুটি চিবিয়ে দিনটা কেটে গেল। সারাক্ষণ রিক্সা-সাইকেলের প্যাঁকপ্যাক। রেলের জন্যে লোকের ছোটাছুটি। সন্ধ্যেরাতেও বটতলা জম-জমাট। আলুর দম, চা, পাঁউরুটি বিক্রি-ওয়ালা লাস্ট ট্রেনের পর বেঞ্চিখানা দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধলো বটের ঝুরির সঙ্গে। তারপর তোলা-উনুনটায় ক্যানেস্তারা চাপিয়ে দিয়ে পাত্তাড়ি গোটালো। লোকটা চলে যেতেই খগেন বেঞ্চিটা খুলে নিল ঝুরি থেকে। তারপর তাতে টান-টান। সারাদিন ঝামেলা থাকে। শুয়েই ঘুম।

কপালে সেদিন বেশিক্ষণ ঘুম ছিল না খগেনের। এখন ভাবতে গিয়ে হাসি পাচ্ছিল খগেনের। নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা খিরিশতলা পেরোলেই সুমতিদের বাড়ি। সত্যি সত্যি মাইতিমশায় বেঁচে? সুমতি বেঁচে? ঘরদোর সব পরিষ্কার? কিন্তু তা কি করে হয়? আমরাই তো হরিবোল দিয়ে নিয়ে গেলাম রাজপুর শ্মশানে।

শ্মশান বলতে ইছাপুর। রাজপুরের তুলনায় মহাশ্মশান। চব্বিশ-ঘণ্টা চিতা জ্বলে। কাঠ আসে লরীতে। আশপাশের কাঠও আসে। গরুর গাড়িতে। গায়ে গঙ্গা। মাছের নৌকো। ভাসা মড়া। চটকলের ভোঁ। সে এক এলাহি-কাণ্ড।

ভোর ফুটে ওঠার ঠিক আগে চাঁদের যা দশা—তাকানো যায় না। আকাশের একটা কোণ বেছে নিয়ে মুছে যাই, মুছে যাই অবস্থা। এই তো সুমতির ভিটে। কোথায়? সেই তো জঙ্গল। ভাঙা চাল! ভগবানও তা হলে ঠাট্টা করে? ঠকায়?

কিন্তু শেষরাতের স্বপন তো মিছে হয় না। মানুষ ঘুমোয় তখন। চোর, বাদুড়, সাপ আর প্যাঁচা জেগে থাকে শুধু। বাতাস বয় একা-একা। জেগে থাকে বক্রেশ্বর নস্কর। আমি বড় ভাগ্য করে আসা বাপ। এ-রকমই নিশুতি-রাতে তাকে ইছাপুরের বটতলায় ঘুম থেকে

তুলেছিল। কত আর বয়স তার তখন। উনিশ-কুড়ি। শ্বেত আকন্দ, শিবলিঙ্গ, অনন্তলতা—এ-রকম কয়েকটা জিনিস তখন সবে শিখেছে খগেন। তা তাকে যে বেঞ্চ থেকে তুললো, এমন সাধু সে অনেক দেখেছে। রেল স্টেশনে, ডাকঘরের বারান্দায়, নদীর ধারে, খাল ধারে, অনেক জায়গায়।

এ সাধুর গায়ে একখানা বড় কম্বল। সুতির কম্বল হবে। হাতে-পায়ে ছাই নেই বিশেষ। গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। তাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে বললো বেঞ্চি ছেড়ে দে। রোজ আমি ঘুমোই এখানে।

খগেন ছাড়বে কেন? সে বললো, আমি আগে এসে শুয়েছি। আমি ছাড়বো কেন?

না-ছাড়িস তো বিপদে পড়বি।

কিসের বিপদ?

তবে ছাখ! বলেই সেই নিশুতি রাতে খগেনের চোখের সামনে অন্ধকার বটগাছের ভেতর থেকে এক জোড়া পায়রা বের করে আনলো লোকটা। পতপত করে পাখা ঝাপটে পায়রা জোড়া এসে বেঞ্চে বসলো। খগেন চমকে গিয়ে পায়রা জোড়া ধরতে গেল। ওরা অমনি ঝোটন বেঁধে নিচে রাস্তায় গিয়ে বসলো। আর গাল ফুলিয়ে তখন-তখনই বক-বকম্ বক-বকম।

আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে পায়রা ধরতে গেল খগেন। কিছুই হয় নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে পায়রা জোড়া জায়গা পালটে বসলো। আর অমনি সেই দাড়িওয়ালা লোকটা রাতখানা কেটে কেটে দিয়ে হাসলো। পারবি না—

ওর মাংস খাওয়া যায়?

না। খুব গম্ভীর গলায় লোকটা বললো, জালালি কবুতর। ওর মাংস বিষ।

তারপর একমনে খগেনের মুখখানা দেখে সে বললো, বাড়ি যাস নে কেন? সুখ নেই?

বাড়ি ভাল লাগে না।

মা নেই ?

অনেক কাল গত সাধুবাবা।

চোপ। বাবা-ফাবা ডাকবি না। তোর মহাগুরু।

মহাগুরু ? সে কি জিনিস গো ?

তোর জন্মদাতা পিতা ?

আছে একখানা। তবে এখনো বেঁচে আছে কিনা জানি না !

বাঃ! চমৎকার ছেলে। এই ছাখ—বলেই হাত তুললো লোকটা। আর অমনি বটতলায় নেমে আসা ঝুরিগুলো ভালো ভালো সাপ হয়ে গেল। তারা নিশুতি রাতের বাতাসে দোল খেতে লাগলো। কেউ কেউ বেঁকে ওপরে উঠতে চায়।

খগেন একটুও ঘাবড়ালো না। বললো, পায়রা জোড়া কোথায় গো ?

ওই তো।

খগেন তাকিয়ে দেখলো, বটতলার অন্ধকার ছায়ার বাইরেই জ্যোৎস্নায় ওরা দুজন বসে। একদম রাস্তার ওপর। আজ সারাটা দিন এই রাস্তা দিয়ে কত সাইকেল-রিক্সা গেল। মানুষজন।

পায়রাদের কাছে যাওয়ার পথে অন্তত তিনটি ঝুলন্ত সাপের বাধা। কিন্তু তার তাগায় ছিল শিবলিঙ্গ ফল। তবু পায়রাদের কাছে যেতে গিয়ে গায়ে স্যাঁৎ করে ঠাণ্ডা ঝুলন্ত সাপদের গা লেগে গেল। কিন্তু একটা পায়রাও ধরতে পারলো না।

দাড়িবাবার কি হাসি! খিক্—খিক্—হো—হো—হাঃ—হাঃ—। অনেক রকম। থেমে খগেনকে বললো, কাছে আয়। তোকে দিয়ে হবে।

খগেন কাছে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে বটের ঝুরিগুলো আবার ঝুরি হয়ে গেছে। লোকটা ধরাগলায়, বললো, আমার পায়ে চুমু খা। কদমবুসি কর।

খামোকা ওসব করতে যাবো কেন ?

করে ছাখ, তোর ভালো হবে। আমি তোকে ডাকিনী-মন্তর দেবো।

খগেন কদমবুসি করলো। মাথা নিচু করে। লোকটার পায়ের পাতা ছোটখাটো চিতল মাছ। চুমু দেবার সময় সে পা হু'খানা থেকে তেজপাতার গন্ধ উঠে আসছিলো।

খগেন উঠে দাঁড়াতেই বললো, সোজা এই রাস্তা ধরে দক্ষিণে চলে যা। তিন রাস্তার জোড়ে একটা তে-মাথানি পাবি। সেখানে বাঁ-হাতে একটা কসাইয়ের দোকান পাবি। বাঙালী কসাই। ভুল করে রামদা তুলতে ভুলে গেছে। দোকান বন্ধ। কিন্তু পাটাতনের নিচে দেখবি রামদায়ের হাতল বেরিয়ে আছে। আস্তে টান দিবি। ঘচ্ করে বেরিয়ে আসবে।

এত রাতে রামদা দিয়ে কী করবো ?

শুনে যা শুধু। তারপর তিনটে দোকান পেরিয়ে বাঁ-হাতেই কয়লার দোকান পাবি। সেখানে দেখবি কয়লা ঝেড়ে কালিকুষ্টি তিনটে বস্তা ফেলে রেখে গেছে। ভালোটা তুলে নিবি।

এসব দিয়ে আমি কি করবো ? আমি এখন ঘুমোবো ?

না। তুমি এখন ঘুমোবে না। রামদা আর বস্তা হাতে ওই পথ দিয়েই সোজা ইছাপুর শ্মশানে গিয়ে উঠবে। সেখানে দেখবে, শ্মশানের চটির পাশেই একটা ডুরে শাড়ি পেঁচানো মড়া পড়ে আছে। আশপাশের কোন ডোমনীর বেওয়ারিশ-মড়া। কাউকে কিছু না বলে মুণ্ডুটা কেটে বস্তায় ভরবে। তারপর সোজা এই বটতলায় চলে আসবে।

বলতে বলতে দেড়েলটা খগেনকে এক ধাক্কায় বেঞ্চ থেকে সরিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো। আমি ঘুমোচ্ছি। মুণ্ডুটা এনে আমায় জাগাবি।

অগত্যা—

রামদা জায়গামতো পেল খগেন। বস্তাও জায়গামতো পাওয়া গেল। তারপর দক্ষিণমুখো হাঁটা। জ্যোৎস্নার নিশুতি রাত। পাকুড়তলা। মালগাড়িগুলোর একা-একা শান্টিং। অন্ধকার গঙ্গা ছুঁয়ে উঠে আসা একটু ঠাণ্ডা বাতাস।

শ্মশানটাও বেওয়ারিশ চেহারার।

ডুরে চেহারার শাড়িটা অন্য একটা চিতার আগুনে চিনতে পারলো খগেন। শাড়িতেই মুখ ঢাকা। রামদা বের করলো বস্তা থেকে। মুখের কাপড় সরাতেই তার হাত থেকে রামদা পড়ে যাচ্ছিল। একি! এ যে সুমতি শুয়ে আছে। এখানে এভাবে?

সুমতির বাড়ির সামনে শেষরাতে দাঁড়ানো খগেনের ঠোঁটে একখানা ভাঙা হাসি এসে দাঁড়ালো। তখন তো সুমতিকে মাত্র বছরখানেক হোল মাইতিমশায় বে করে এনেছেন। একবার দু'বার সুমতির মুখখানা দেখা গেছে মাত্র। ওদের বাড়ির সামনের এই গাছটা তখনো ছোট। এখন তো অনেকটা জুড়ে ছায়া ফেলে।

তখন আমার বয়স কি বা! সেদিন শ্মশানেই আমি নিজের কাছে ধরা পড়ি। আমি খগেন নস্কর। আজ এখানে আছি। কাল আরেক জায়গায়। আমার তখনকার জীবনের সঙ্গে কোন ছেলেমেয়ের জীবন জড়ানো যায় না। আমার তাগায় শিবলিঙ্গ। কোঁচড়ে অনন্তমূল। কোমরে ঝোলানো শিশির ভেতর শ্বেত আকন্দের শেকড়। গা দিয়ে আমার জঙ্গল ঘাঁটার বুনো বাস ছড়ায়। আমি কি করবো তখন মেয়েমানুষ দিয়ে!

আবার মুখ থেকে শাড়ি তুলতেই দেখলো, সুমতি হাসছে। চিত শোয়া অবস্থায়। আকাশে তাকিয়ে। আবার ঢেকে দিল মুখখানা। এ মুখের দিকে তাকিয়ে রামদা তোলা যায় না। অন্ধকার গঙ্গার বুকে এদিক-ওদিক আলোর ফুট কাটছিল। জেলেদের হেরিকেন সেই সূর্য উঠলে নিভবে। খগেন বুঝলো, সে মনে মনে মাইতি-মশায়ের বে-করা বউয়ের কথা ভেবে এসেছে। নয়তো ডোমনীর

ধড়ে সুমতির মুণ্ডু এসে লাগে কি করে? এই অবস্থাটাই তো শ্মশানে-মশানে সবচেয়ে খারাপ। এই সন্দেহ। এই দোনামনা। মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেবো কি দেবো না? এই অবস্থাতেই প্রেত এসে ভর করে। একবার চড়লে আর নামানো কঠিন।

এক কোপে মড়ার মাথাটা কেটে নিল খগেন। রামদায় শাড়ির সুতো জড়িয়ে যাচ্ছিল। দূরের চিতাটায় চার-পাঁচজন নড়াচড়া করছিল। মুণ্ডুটা বস্তায় ভরে নিয়ে ডোমনীর গায়েই রামদার রক্ত পুঁছে নিল খগেন। তারপর বস্তার ভেতরেই রামদা ভরে যে-ই না সে রওনা দেবে ঘুরে, অমনি সেই দেড়েলের সামনে পড়ে গেল। তুমি কখন এলে?

পেছন-পেছন এলাম। যদি ভয় পেয়ে কেলেঙ্কারি বাধাও।

পেরেছি?

খুব ভালো পেরেছিস। এবারে আয়। নদীর ঘাটে বসবি। ভয় পেলে চলবে না কিন্তু।

শুধু শুধু ভয় পাবো কেন?

কেন? তা বুঝবি এখন।

শ্মশানের গা দিয়ে মাটি নদীতে গিয়ে থেমে গেছে। আগাগোড়া পাতি ঘাসে ঢাকা। তাতে কম্বল বিছিয়ে বসলো দেড়েলটা। নে। তুইও এবার বসে পড়।

খগেন বসলো।

মুণ্ডুটা বের করো তো বাছাধন।

খগেন আবছা জ্যোৎস্নায় বস্তা থেকে বের করলো। এ কি?

খিল-খিল করে হেসে উঠলো দেড়েলটা। কি, বলেছিলাম না?

ফোলা-ফোলা মুখে লোকটা হাসছে। ভারী চোখ। দাড়ি, মুখ, সারা গা থেকে গাঁজার মিষ্টি সুবাস। জ্যান্ত কোন প্রেত নয় তো? খগেন এই প্রথম ভয় পেল। ছিলো মুণ্ডু, হয়ে গেল নারকেল! ছোবড়া খসানো নারকেল!

তাই তো হয়। কি নাম তোর?

খগেন। খগেন নস্কর।

তা নস্করের পো—এবার রামদায়ের পেছনটা দিয়ে হাতের ওপর নারকেলটা ফাটাতে পারবি?

তা পারবো। কিন্তু—

কিন্তুর কিচ্ছু নেই। সাবধানে ফাটাবি। পর পর আধখানা করে খুলে ফেলে ছাখ, ভেতরে কি বসে আছে তোর জন্যে।

একবার মড়াটার মুখ দেখে আসবো?

কিচ্ছু দরকার নেই।

এইমাত্র রামদা দিয়ে মুণ্ডুটা কাটলাম।

বেশ তো। এখন নারকেলটা দু-ফাঁক কর।

খগেন ডান হাতের থাবার ওপর নারকেলটা ধরে বাঁ হাতে রামদায়ের উলটো দিক দিয়ে এক বাড়ি দিতেই নারকেল মালা দু-ফাঁক। বড় সাইজের জিনিস। একদম ঝুনো। হাত ভরে গেল জলে।

ভাল করে ছাখ তো খগেন।

কি দেখবো?

জলটা কেমন?

অন্ধকারে গন্ধ শুঁকে বললো, অনেক পুরনো ঝুনো। জলে গন্ধ হয়ে গেছে।

ভালো করে চেটে ছাখ তো।

মুখে দিয়ে খগেন আঁতকে উঠলো। রক্ত। রক্ত—

আ মোলো যা! চেঁচাস নে। অন্য চিতের লোক ছুটে আসবে যে।

এ যে রক্ত। অথচ এইমাত্তর মুণ্ডুটা নারকেল মালা হয়ে ছিল।

খিল-খিল করে সে কি হাসি দেড়েলের। যা তো। এবার ডোমনীর মুখখানা দেখে আয়।

খগেন ছুটে ওপরে উঠে ডুরে শাড়ির ঢাকনা তুলে দিল। সাধারণ

একখানা মুখ। গাঁয়ের মেয়েমানুষের। চোখের পাতা দুটি বোজানো। নাকের ডগা টসটস করছে। ভুরভুরে বাস সারা গায়ে। খগেন আর নিজেকে আটকাতে পারলো না। বাঁশের খাটিয়ায় উঠে একদম খোলাখুলি জড়িয়ে ধরলো।

মড়া আড়মোড়া ভেঙে সরতে চাইলো। আঃ! কে আবার এখন? মাইতিমশায় এসে যাবেন যে।

খগেন এ-গলায় ঠাণ্ডা মেরে গেল। মাইতিমশায়ের উঠোনে সে গত সনেও ধান ঝেড়ে এসেছে। বড় সুন্দর করে ভাত বেড়ে দেয় মাইতি গিন্নী। বাসি ডাল। সঙ্গে শুকনো লঙ্কা পোড়া। পুঁই চচ্চড়ি। একটা বড় পাকা তেঁতুল।

মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দেড়েলটা। কি রে? উঠলি কেন? জড়িয়ে ধর আবার।

খগেনের ততক্ষণে সব গুলিয়ে গেল। আমার কি রকম লাগছে দাড়িদাদা। আমায় একটু ঘুমোবার জায়গা করে দাও।

তোর হবে। তোর হবে। বেশ তো জড়িয়ে ধরলি। ছাড়লি কেন? যে মন্তরে যা। ধর জড়িয়ে।

খগেন আর তখন খগেনে নেই। ধরলো জড়িয়ে। তার সব গুলিয়ে গেছে। ডোমনীর মড়া তাকে ছিটকে নিচে ফেলে দিল। শ্মশানের মাঠে ঘাসের বদলে মালসা, মাটির কলসী। ভাঙা চাড়া ছড়ানো সর্বত্র। পোড়া কাঠের কয়লা। অন্ধকার নদীর বুকে কে একজন লম্বা করে বললো, হেঁইও।

দাড়িবাবা তার মুখের সামনে এসে দাঁড়ালে। তোর কোন দোষ নেই খগেন। আমার সাধন সঙ্গিনী এ-মড়া। প্রায় তিরিশ বছরের বাসি মড়া। আমি সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরি।

কি বলছো দাড়িবাবা? এখনো নাকের ডগায় ঘাম।

মন্তরে অমন থাকে বাবা। বড় তিজি ছিলো এ ডোমনী। বেঁচে থাকতে কম জ্বালায় নি।

তুমি তা হলে কবেকার ?

বল তো ?

আমার সব গুলিয়ে দিয়ো না। দোহাই দাড়িবাবা। একটু সত্যি কথা বলো।

এ দেশে রেল লাইন বসার আগে আমি প্রথম আসি। এ ডোমনী তখনকার। এই তো পাশের গাঁয়ের। এখন তো সেখানে পাটকল। কত কি গুচ্ছের বল বসেছে। আগেকার দীঘিগুলো বুজিয়ে এখন ওখানে কত ঘর-বাড়ি, ইলেকট্রিক।

খগেনের মনে হচ্ছিল, সে ঘুমের ভেতর জেগে গিয়ে উঠে বসেছে। তখনই তার চোখে পড়লো, নদীর থেকে বিশ ত্রিশজন ডোমনী ওই একই ডুরে শাড়ি পরে ভিজে কাপড়ে উঠে আসছে এদিকে। মাথায় ঘোমটা।

আঁতকে ওঠা খগেনকে অভয় দিতেই যেন দাড়িবাবা তার চোখের সামনে হাত দিয়ে দৃশ্যটা ঘষে মুছে দিল। ফ্যালফ্যাল করে হেসে বললো, একবার কদমবুসি করেছিস। তোর কোন ভয় নেই। আয় আমার কাছে। আমার ঝোলা থেকে খানিকটা খ-পুষ্পে খেয়ে নে। তারপর তোর কপালে আমি ব-পুষ্পের তেলক টেনে দিচ্ছি। কেউ তোর কিছু করতে পারবে না। রাত-বিরেতে নিশাচর প্রাণী তোর ভয়ে সরে দাঁড়াবে। আয় বাপ। কাছে আয়।

খগেন একটু একটু করে এগিয়ে গেল। নদীতে তখন শেষ রাতের বাতাস।

ঘটির গলায় ঘোর কাটলো খগেনের। আবার তুমি সুমতি মাসীর পোড়ো বাড়িতে ঢুকেছো ? চলে এসো। কে এসে হাঁকহাঁকি জুড়েছে তোমার জন্যে, আর আমরা খুঁজে মরি।

কে ? এত ভোরে ? বলেও খগেন পোড়ো বাড়ির ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলো না।

ডাঁটার জঙ্গল। শেয়ালকাঁটা। শেষ রাতের চাঁদ প্রায় দিনের প্রথম আলোর মতোই ফিকে—কিন্তু কেন জানি টাটকা। ভাঙা ঘরের ভেতর একখানি ফিকে জ্যোৎস্না। বাঁশের খুঁটিগুলোয় ঘুণ লেগে আগাগোড়া গুঁড়ো মাখানো। তার ওপর সাপের চলাচলের মিহি দাগ। কিছুই এড়ায় না খগেনের চোখে।

তা সেবারে সে ব-পুষ্পর তেলক কেটে তিন-চার মাস থেকে গিয়েছিল শ্মশানে। তিরিশ বছরের বাসি মড়া আগলে। নদীর গায়ে শেষদিকে দেড়েলটাকে শুধু বাবা বলে ডাকতো।

আবার দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? তোমার জন্যে লোক বসে আছে।

ঘটির তাড়ায় ভাঙা দেওয়াল টপকে খগেন নস্কর বাইরে বেরিয়ে এলো। তোর মা কোথায় রে?

পাগলডাঙ্গায় গাই ছাড়তে গেছে। সেখানে নাকি ভালো ঘাস আছে।

এখন কোন ডাঙ্গায় ঘাস নাই ঘটি.

তিন

কোন গন্ধ চোখে দেখা যায় না। কোন শব্দ চোখে দেখা যায় না। আর দেখা যায় না বাতাসকে।

দাড়িবাবা খগেনকে সব শিখিয়েছিল। নিজের হাতে। নিজের মন্তর দিয়ে। বাবা এক একদিন সন্ধ্যেরাতে ইছাপুর শ্মশানের আকাশে নিজের হাত দিয়ে মেঘ মুছে দিত। নিজের হাতে বাতাস টেনে আনতো।

এক একদিন গুমোট সন্ধ্যায় খগেন আবদার ধরতো। বাবা, আজ একটু জ্যোচ্ছনা চাই। সেই সঙ্গে চাঁপা ফুলের গন্ধ।

এখন হবে না। রাত বাড়ুক।

নিশুতি রাতে ডোমনীর মড়া নিজেই উঠে আসতো গঙ্গা দিয়ে। এসেই বারোয়ারী খাটিয়ায় চিৎপাত। বাবা তার বুকে আসনপিঁড়ি হয়ে বসতো। কপালে খ-পুষ্পের ছাই-রঙা তেলক। সামনে বাঁ উরুর ওপর ছোট্ট কলাই বাটিতে পুরনো ঘিয়ের দশা লালচে খানিক খ-পুষ্প। তাই একটু মুখে দিয়ে বাবা কাশীপুরের মিঠে বাংলার তিনশোর একটা বোতল খুলতো। তারপর ডোমনীর ঠোঁট ফাঁক করে খানিকটা। ঠোঁট ফাঁক করার সময় ডোমনীর সে কি— অ্যাঁ—না—না—পেটে পড়তেই অন্য চেহারা।

বাকীটা বাবা নিজেই গলায় ঢেলে নিতো। একটু বাদেই বলতো, জ্যোচ্ছনা চাই? তাই না? ওই নে।

ফিরে তাকিয়ে খগেন সত্যিই দেখলো—নদীর মাঝ-বরাবর একখানি গোল চাঁদ। কী তার আলোর ছটা!

খুশি?

খুশি।

তবে এই নে চাঁপার সুবাস।

এমনই ঘন সুবাস—আশশ্যাওড়ার জঙ্গল থেকেও চাঁপা ফুলের গন্ধ ভেসে এলো।

একদিন এ অবস্থায় বাবা শ্মশানের চারদিকের সব সাপকে আকর্ষণ করলো। সে এক ছবি। ডোমনীর খাটিয়া ঘিরে সত্তর-আশিটা নানা চেহারার সাপ। কালো, কালচে, ফ্যাকফেকে শাদা। একটা নাদুস-নুদুস বাচ্চা অজগর অব্দি। সবাই এসে খাটিয়া ঘিরে বিড়ে পাকিয়ে বসলো।

খগেনের ডাক পড়লো। যাও। গা গতর চিনে নাও।

আজও সন্ধ্যে-সন্ধ্যে যারা মড়া নিয়ে এসেছিলো— তাদের কেউ নেই এখন। বসতি এলাকার বাইরেই একটেড়ে শ্মশান হয়। তিনটে নিভু-নিভু চিতে। তার ওপর চাঁপার ঘন সুবাস বয়ে যাচ্ছিল বাতাসে। খগেন সেদিনই প্রথম খড়িচোচকে চিনলো। চিনলো শামুকভাঙা কেউটে, চন্দ্রবোড়া, মাদী মদ্দা—

মাদী আর মদ্দা চেনাবার সময় বাবা ছড়া কেটে উঠলো। বড় মজার ছড়া।

আমার মেয়ে যে সে সতী।

নাকের ওপর মদ্দা মক্ষীসুদ্ধ বসে না!

কী খগেন! কি বুঝিস? দেখিস সাপ। কাউকে আবার কুল ভেঙে টেনে আনিস নে। তোর যা বয়েস— যা চেহারা করেছিস—

তা চেহারা একখানা ছিল খগেনের তখন। সেই চেহারা নিয়ে সে নদীর পাঁক মাটিতে বাবার আদেশে একটা জিনিস খুঁজে বেড়াতো। দূর দেশ থেকে জলের সঙ্গে ভেসে-আসা শেকড়, পাতা, ডাল, গুঁড়ি। বাবা সব গাছ চিনতো। সব কাঠ। একদিন একখানা বৃষকাঠ ভেসে এলো। ভাত রাঁধার জ্বালানীর জন্যে তুলে রেখে বাবা বলেছিল, বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই :

খগেন এই বাবার কাছ থেকেই গন্ধ দেখতে শেখে। কটু, বুনো

গন্ধ নাকে এলে সে চোখের সামনে বুনো লতায়-পাতায় আষ্ঠে-পৃষ্ঠে জড়ানো বন-জঙ্গল দেখতে পায়। গা-গোলানো মিঠে গন্ধের ঝাঁঝ নাকে লাগলে সে কাশীপুর ভাটিখানার তিনশোর বাংলা বোতল দেখতে পায়।

মেঝেতে পায়ের শব্দে খগেন ইদানিং মানুষজনের চেহারা দেখতে পায়। কেমন শব্দে পা ফেলে কেমন চেহারার মানুষ এগিয়ে আসছে—মাদী কি মদ্দা—তাও আগাম দেখতে পায় সে। কোন শব্দ চৌকো। কোন শব্দ লম্বাটে। কোনোটা বা ঢ্যাবঢেবে।

এখন সে বাতাসকেও দেখতে পায়। এমন কি বাতাসের ভেতরকার বাতাসকেও। বাইরের বাতাসের আড়ালে সব সময় একটা উলটো বাতাস বয়। সে বাতাস এসে গা ছুঁয়ে দিলে সারা শরীর সির-সির করে ওঠে। বাইরের আলোর ভেতরও আরেকটা উলটোমুখো আলো বয়। সে আলো হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। তাতে একটা তাপ থাকে।

নিজের উঠোনে এসে খগেন অবাক হয়ে গেল। এ মানুষকে তো সে চেনে না।

খগেনকে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়ালো। একবার যেতে হবে তোমায়। বাবু ডেকেছেন।

কে?

বাবু। আমি তার পাম্প চালাই। তোমার বড় ছেলে হাজরা আমায় চেনে।

ও! বিপিনবাবু? তা গোড়ায় বললেই পারতে। আমি ভাবি কে না কে! কেন ডাকছেন?

গেলেই শুনতে পারবে!

কি ব্যাপার?

যাও না।

তবু বলো না ভাই। মরা কুকুরটা বেঁচে ফিরে এসেছে?

শেষ রাত থেকে যা ঘটছে, চোখ জড়িয়ে এলেই যা দেখছে—তাতে ঘূর্ণীর মতো অবস্থায় খগেন এ কথা বলে বসলো।

আরে না, না। সে-সব কিছু নয়। কাল রাতে বিপিনবাবুর বাড়ি চুরি হয়েছে।

বলে দাও গে—পুলিশ আছে। খবর দিয়ে দিলেই ছুটে আসবে।

না। তোমাকেই যেতে হবে। তোমার ওপর বিপিনবাবুর অগাধ বিশ্বাস।

আমি ওসব বাটি চালা, চাল পড়া, জল পড়া জানি নে কিন্তু।

তুমি সব জানো খগেন। তোমার মন্তর লাগানো কলাই থালা চোরের পিঠি গিয়ে আটকে যাবে। তারপর চোর রাস্তা পাবে না। মুখ দিয়ে রক্ত উঠতি থাকবে।

আমি ওসব কিচ্ছু জানি নে।

বিপিনবাবু একটা মানী লোক। মানী লোককে মান দিতি হয়।

সে আমি জানি। বিপিনবাবুর মতো লোক ডেকে পাঠালি যেতেই হয়। চলো যাই।

উঠোনে আরেকখানা ছায়া দেখে খগেন কেঁপে উঠলো।

বেস্পতি উঠোনে পা দিয়েই বললো, বলে দাও গে, হাজরার বাপ যাবে না।

লোকটা বললো, বিপিনবাবুর মতো লোক ডাকলি যেতি হয়।

কেন? কত বিপিনবাবু আছে সারা দেশে। সব জায়গায় হাজরার বাপ যায়?

খগেন নিজেই বললো, চোপা কোরো না। কাল অতগুলো টাকা দিলো। আমি কেন ডাকছেন শুনেই ফিরে আসবো।

সে জন্যি যাবার দরকার নেই। আমি মাঠে গরু ছাড়তে গিয়ে শুনলাম। কাল রাতে চুরি হয়েছে বাবুর বাড়ি।

এত ভোরে সেই পাগলাডাঙ্গা অব্দি খবরটা চলে গেল? আশ্চর্য!

খারাপ খবর বাতাসে রটে। যাও। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। গুড় দিয়ে চালভাজা খাবে।

জিনিসটা খগেনের প্রিয়। তবু ঘরে যেতে পারলো না। আস্তে করে বললো, না বউ। একবার ঘুরে আসা দরকার। অতগুলো টাকা দিলো বিপিনবাবু।

দেবেই তো। সারাদিন ধরে বড়লোকের কুকুরের চিকিৎসে করলি দেবে না?

চাল দিলে অত ক'টা।

ওসব ওনার পরিবারের চালিয়াতি। পেটে পেটে কত শয়তানী সে তো আমি জানি। যন্তর বের করে আমাদের দেশে কেউ দুধ কেনে? শেষে বলে থানায় খবর দেবে। কত বড় সাহস। আমিও বেস্পতি দাসী। ঢালা দুধ কেড়েয় তুলে নিলাম ফের। একটু থেমে দম নিয়ে বেস্পতি ঠাণ্ডা গলায় বললো, না। তুমি যাবে না। ঘরে গে শুয়ে থাকো।

বেস্পতির সিধে 'না' বলে দেওয়ায় আসল কারণ কোথায় তা খগেন জানে। সে-সব কথা বাইরের লোক সাক্ষী রেখে বলা যায় না। খগেন একদম কোন মানা না শুনে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। যাবো আর আসবো বেস্পতি। তোমার পান্তা খাওয়ার ভেতর ফিরে আসবো।

এ বাড়িতে দুজন বড় রোজগেরে মানুষ সকালে বেরোবার আগে পান্তা খেয়ে নেয়। তাদের দুজনের জন্যে রাতে ভাতে জল দিয়ে রাখা হয়। একজন বেস্পতি দাসী। পান্তা খেয়ে সে দুধের কেড়ে কাঁখে বেরোয়। অন্যজন বজ্রেশ্বর নস্কর। বজরা। নিশাচর মানুষ। পান্তাটি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ওঠে সেই বেলায়। রোজ নয়। যেদিন যেদিন কাজ থাকে—শুধু সেদিন এই পান্তা—এই

ঘুমোনো। নয় তো বজরার কাজকর্মের দিনরাত বলে কিছু নেই। যখন যেমন।

মাঠ ভেঙে এগোবার সময় লোকটা বললো, তোমার কোথায় অসুবিধে সে তো আমরা জানি।

হাঁটতে হাঁটতে খগেন কোন কথা বললো না।

বজরাকে দেখলাম না?

আছে কোথাও।

সকালে বাড়ি ফেরে নি?

সে তো অনেকদিনই ফেরে না। দ্যাখো গে কার বাগানে ডাব খাচ্ছে।

শুধু ডাবই খায়?

খিদে পেলে আরও অনেক কিছু খায়।

কথাটার মানে হয় দু'খানা। একখানা এমনি। অন্যখানার মানে—আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি? বজরা জানলে পিটবে। পিটুনিকে সারা দেশে খুব সম্ভ্রম করে সবাই। বজরার কপালে তাই আলাদা সমীহ জোটে। খগেনের ভাগ্যে সমীহ আরেক রকমের।

বিপিন বসু বাড়ির পেছনের দিককার বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছিল। এদিকটায় গোয়াল। ছেচকলা। টিউকল। বাড়ির পুকুর। তারকাঁটা আর রাংচিতের ছাগুলে বেড়া। যে কেউ টপকাতে পারে। কয়েকটা সবেদা গাছ। পরিষ্কার বাগানে হাট করে খোলা কয়েকটা সুটকেস। ভেতরে কিছু নেই। কিছু ছেঁড়া কাগজপত্তর। বোঝাই যায়, চোরের দল রাতে টর্চ জ্বেলে সব দেখেছে। কাগজগুলো পছন্দ হয় নি বলে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে রেখে গেছে।

খগেন এসেছো? প্রথমেই তোমার নাম মনে পড়লো।

আমি তো শেকড়বাকড় চিনি বাবু। আমায় দিয়ে তো এসব হবে না। পুলিশ ডাকুন।

সে শুধু হয়রানি খগেন।

না, না। পুলিশই তো সব কিনারা করে। থানা এখান থেকে পাঁচ মাইল। বাসে আধ ঘণ্টা। নিজে গিয়ে ডাইরি করান বাবু।

গত সনে চাষের মোটরটা গেল। পুলিশ শুধু চাষের ক'জনকে ধরে নিয়ে হাজতে রাখলো। তাদের কোন দোষ নেই। ছেড়ে দিলও মারধোর করে। হয়রানির একশেষ। মোটর তো পাই নি খগেন।

খগেন কোন কথা না বলে চুপ করে তাকিয়ে থাকলো। অনেকের সঙ্গে হাজরাও ভোরে এসে কাজে লেগেছে। খগেন এসেছে দেখে তারাও ভিড় করে দাঁড়ালো। ভিড়ের ভেতর থেকে হাজরা তার বাপকে দেখছিল। একদিকে বাপের জন্যে একটা গর্ব—আরেক দিকে বাপের জন্যে একটা ভয়—তার ভেতরে একই সঙ্গে কাজ করতে লাগলো।

তুমি যা করার করো খগেন। চোর তোমার চালপড়ার ছ্যাকা খেয়ে ছুটে আসবেই—এ আমি জানি।

ওসব আমি ভুলে গেছি বাবু।

জিনিসপত্তর রেডি করে দিলেই সব মনে পড়ে যাবে তোমার।

অনেকদিন হয়ে গেল ওসব করা ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। আপনি অন্য কথা বলুন বাবু।

তোমার মা বলছিলেন—খগেন চেষ্টা করলে তাঁর বিয়ের গহনার বাক্সটা ফিরে আসতো।

মা মানে সিদ্ধেশ্বরী। কাজের লোকেরা সবাই জানে—বিপিন-বাবু ছেঁটেকেটে সিধু বলে ডাকে।

ঠিক সেই সময় সিধু বেরিয়ে এলো। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। মাথায় উঁচু করে তেল তোলা খোঁপা। খগেনকে দেখে কেঁদেই ফেললো, গহনার বাক্সটা বাবা বেনারস থেকে এনে দিয়েছিল। ওর

ভেতর আমার বিয়ের টিকলি, আংটি, একটা সব সময় পরার হার ছিল। সব নিয়ে গেছে খগেন। বাক্সসুদ্ধ। তুমি চেষ্টা করলে চোরকে চিনে বের করতে পারবে।

আমায় ক্ষমা করো মা। ওসব সন্দেহ, বশীকরণ, উপশমের খেলা আমি অনেককাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। থানা পুলিশই সবচেয়ে ভালো রাস্তা মা।

সিদ্ধেশ্বরী ভালো করে তাকালো খগেনের দিকে। তুমি ইচ্ছে করলেই পারতে খগেন।

আমার আর আজকাল ইচ্ছে হয় না মা।

বিপিন বসু মধ্য বয়সের তাগড়াই চেহারার মানুষ। ধুতি আর পাম্পশুর বাইরে পায়ের যেটুকু বেরিয়ে থাকে, তাতে এখানকার মানুষ স্বাস্থ্য, শরীর, দর্প, প্রভুত্বের চিহ্ন দেখতে পায়। সেই পায়ের কাছেই বাঁধা ভাঁড়ের তাড়ির কলসী এনে রেখে গেছে যোগানদার। বাড়ির সব সময়ের কাজের লোক এসে ছেঁকে পর পর তিন গ্লাস বাবুর হাতে তুলে দিল। পরেপ্পর চোঁ-চোঁ করে খেয়ে নিয়ে বিপিন খগেনকে বললো, আজকাল কি ইচ্ছে হয় ?

কোন ইচ্ছে হয় না বিপিনবাবু।

বিপিন চমকে উঠে দাঁড়ালো। যে যার কাজে চ ল গেল। পাম্প মেসিনে খাল ছেঁচা চলছে। মোটা নলে জল এসে তোড়ে নালায় পড়ছিল। তাতে একদম টানা বৃষ্টির শব্দ।

বিপিন কাছে এসে বললো, বারান্দায় এসে বোসো খগেন।

বসুন না আপনি, এই তো বেশ আছি।

না, না। আমি চেয়ারে। তুমি দাঁড়িয়ে। এটা আমার লজ্জা করে খগেন।

লজ্জা কিসির ? আমি আর আপনি তো আলাদা জিনিস।

দুজনই তো এক দেশের মানুষ। এসো বারান্দায় লেপটে বসি।

খগেন পাশে গিয়ে বসতেই বিপিন বললো, দু'গ্লাস হয়ে যাক।

না বাবু। অনেক খেয়েছি। হয়তো আজও খাবো।

এখন খাবে না তাহলে ?

আপনার আনন্দের জিনিস—আপনি খান।

অনেক আছে। একসঙ্গে খাই দুজনে। এসো—

তবে দিন। কিন্তু আপনি তো থানায় যাবেন ?

নাঃ। কোথাও যাবো না।

তাই বলে চোরকে ছেড়ে দেবেন ?

কত জিনিস তো ছেড়ে দিয়ে থাকি খগেন। আমারও কিছু ইচ্ছে করে না। করতে হয় তাই করে যাই।

দেখে তো বোঝা যায় না বাবু। দেখলে তো মনে হয়—সবটাতেই আপনি রস পাচ্ছেন।

সংসারের কর্তা যখন—বাইরের ঠাটঠমক বজায় রাখতেই হয় খগেন। আরেক গ্লাস নাও।

দিন।

নয়তো আজকাল আমি আর কিছুতেই স্বাদ পাই না। পরিবার তো দেখলে—

খুবই ভালো মানুষ মা আমাদের।

ভালোও বটে। মানুষও বটে। কিন্তু মা হয় নি তো কোন দিন। তাই গহনার বাক্স, কানের মাকড়ি, শাড়ির পাড়—সব গুছিয়ে-গুছিয়ে রাখে। কার জন্যে রাখে জানি নে! আমার তো খগেন সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যে দিকে দু'চোখ যায়, চলে যেতে ইচ্ছে করে।

আপনারা কোথাকার লোক বাবু ?

শহরের। কলকাতার।

তার আগে ?

শুনেছি নদে জেলার। আমরা তো ভাড়াবাড়ির মানুষ।

কলকাতা ছাড়লেন কেন ?

অ্যাতো এক রকম। তে মাব গ্লাসটা দাও।

আপনার কাছে ?

সে তোমায় ভাবতে হবে না। দরকার হলে আবার আসবে।

খগেন বুঝলো, আজ ভোর থেকেই বিপিনবাবুর মনটা এলোমেলো হয়ে আছে। কুকুরটাকে বাঁচানোর জন্যে খগেন প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। সে জন্যেই তাকে বিপিন নিজের করে নিয়েছে প্রায় মনে মনে। নয় তো খগেন এক বকমের জনখাটুনির লোক।

আপনাব একবার বাবা হওয়া দরকার ছিল।

সে সময় চলে গেছে খগেন।

সময় ।ক যায় বাবু। আপনাব শরীর স্বাস্থ্য বলে দিচ্ছে।

না খগেন। আমি আব বোধ করি না। সিদ্ধেশ্বরী সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ে। আমি কোন দিন ঘুমোই। কোন দিন ছাদে উঠে তোমাদেব এই দক্ষিণ মালঞ্চ দেখি।

শুধু আমাদের কেন ? আপনারও তো দক্ষিণ মালঞ্চ।

তাই তো হয়ে উঠছে। এখনো সবটা হয় নি খগেন। এই খোলা মাঠের ভেতর বাতাসে যা যা আছে সব আমি ..খতে পাই।

কি আ.ছ ?

বাতাসেও ঢেউ আছে খগেন। বাতাসেরও ফেনা আছে।

খগেন শুনতে শুনতে চমকে উঠলো। এ যে সেই দাড়িবাবার বাংলা বলে। মানুষটার কি হয়ে গেল !

তখন বিপিন বলছিল, দুনিয়ায় নতুন মানুষ আনা মানেই তো আরও মায়া বাড়ানো। ওর ভেতরে আমি আর নেই খগেন। যাকে যা দেবার দিয়ে এখন রওনা হবো।

না, না। এত তাড়াতাড়ি নয় বাবু। এই অব্দি বলে খগেন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বললো, তাই যদি হবে, তবে আপনি রোজ এই দুগ্গাপুজো বাধিয়ে বসে আছেন কেন ?

কোন্ দুগ্‌গাপুজো?

এই যে। চাষবাস। খাল ছেঁচা। বাড়ি বানানো। বাড়ি ভেঙে ঘর তোলা। লোক তো মোটে আপনারা দুজন!

সব বলবো তোমায়? মানে বুঝবে?

বলুন না। না হয় একটু একটু বুঝবো।

না, না। সবই বুঝবে তুমি। আমারই বোকামো হয়েছে কথাটা বলে।

খুব নরম লাগলো বাবুকে। খগেন নামডাকের মানুষের এ অবস্থা একদম দেখতে পারে না।

জানো খগেন। একবার বৈকুণ্ঠপুরে নিতাই তান্ত্রিকের ডেরায় গেলাম। আমি আর সিদ্ধেশ্বরী। ঘিয়ের আগুনে বেলকাঠ পুড়িয়ে যজ্ঞ হচ্ছিল। আমার কপাল দেখে নিতাই বলে দিলো—আপনার তো কাজের ভেতর থাকতে থাকতেই ভবলীলা শেষ।

তা এত কাজ বাঁধালেন কেন?

অফিসে আমি অল্প বয়সে ঢুকে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছিলাম খগেন। এখন এক রকম বসেই মাইনে পাই। তাই এখানে এসে কাজ বাঁধিয়ে বসলাম। আর কাজ করতে ভালোও লাগে।

বাবুর আর কি ভালো লাগে?

ঠাট্টা করছো খগেন?

আরে না না বাবু। আপনার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক? মন খোলোসা করে কথা বলুন।

তাড়িটা টেনে একটু আনন্দ হয়। ছোট মাছের ঝোল দিয়ে সরু চালের ভাত। ছাদে বসে বসে এই ঢেউ খেলানো মাঠ, বাতাসের খেলা, মানুষজন ভরত্তি রেলগাড়ি—এ সব তো ভালোই লাগে।

তাহলে আপনার যাওয়ার সময় আসে নি বাবু।

কেন?

এখনো আপনার ইচ্ছে আছে।

থাকতে পারে। আমার মুশকিল কি খগেন জানো, আমি যাতেই হাত দেবো, তা থেকে পয়সা আসবে। তিল লাগিয়েছিলাম গত সনে। কোত্থেকে সর্ষের টানাটানি এলো, আর অমনি সাত মণ তিল আমায় মোটা পয়সা দিয়ে গেল।

বিপিনবাবু। আমার যে একদম পয়সা নেই।

আমার পয়সা তুমি নাও না খগেন ?

তা হয় না বাবু। তাহলে এভাবে বসে আর কথা বলা যাবে না মন খুলে। আমার তো ভরা সংসার। ছেলেরা বড় হয়ে গেল।

তার মানে বউয়ের দিক থেকে আর টান পাও না।

আপনি পান ?

পাশাপাশি থাকলে যে মায়া পড়ে, তাই হয় আমার। তোমাদের মা তো সারা দিনে কোন কথা বলে না। নিজেকে নিয়েই থাকে।

তবু ? আপনি একজন পয়সাওয়ালা মানুষ। শরীর স্বাস্থ্য ঈশ্বরেচ্ছায় খারাপ নয়। আপনার কি ইচ্ছে করে না ?

একেবারে যে হয় না—তা নয় খগেন। মাঝে মাঝে ভাবি—কী হবে ভদ্দরলোক থেকে ? যাই, একটু মাগী বাড়ি ঘুরে আসি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে—সিধু ভীষণ কষ্ট পাবে মনে।

ঠিক এই সময়টায় সিদ্ধেশ্বরী শাদা ফুলহাতার ব্লাউজ পরে বারান্দায় এলো। তোমরা রোদে বসে কেন ? ভেতরে এসে ছায়ায় বোসো।

যাচ্ছি। বলে বিপিনবাবু তার সিধুকে ভেতর বাড়ি যাবার সময় দিল। তারপর বললো, ইচ্ছে নষ্ট হয়ে যাওয়া বড় খারাপ জিনিস। তাই না খগেন ?

আপনার অসুবিধে কিসের ? এ দেশে তো আলাদা জায়গা দিয়ে নিজের মেয়েমানুষের জন্যে ঘরবাড়ি বানায় লোকে।

তুমি এ সব জানলে কি করে খগেন? তুমি তো [illegible]চের মানুষ নও।

সব তো চোখে পড়ে বাবু। আর এসবে অন্যায় কিসির? যার সাধ হবে তার তো চেখে দেখা দরকার। সাধ হওয়াও তো দরকার। নয়তো দুনিয়াটাই শুঁটকো হয়ে যাবে।

আমিও যে ভাবি নি—তা নয় খগেন। কিন্তু আমার যে অতখানি সাধ নেই। তাই আর মেয়েমানুষের জন্যে ঘড়বাড়ি করা হয় নি।

আপনার সব আছে—অথচ ইচ্ছে নেই। আর আমার দেখুন। পয়সা ছাড়া সব আছে। পয়সা না থাকলে পুরুষমানুষেব বড় অশ্রদ্ধা হয় বাবু। কিসে পয়সা হতে পারে আমার বলুন তো?

আমি দিলেই হয়ে যায় খগেন। কেন শুধু শুধু কষ্ট করতে যাবে?

না বাবু। নিজির মাথাব ঘাম পায়ে ফেলে আয় করা পযসা—

মাথার ঘাম পায়েই পড়বে। তাতে পয়সা হবে না খগেন। মজুরী হতে পারে। দিন খেটে মজুরী!

তাকে তো পয়সা বলা যায় না। এই ধরুন—একটা কালো গাই দেখে পছন্দ হোল—হুট করে কিনে ফেললাম। তবে না বলা যায় পয়সা হয়েছে।

সে তো আমিই কিনে দিতে পারি তোমায়।

কতবার দেবেন?

যতবার দরকার হবে খগেন।

ও হোল বাত কে বাত বাবু। আপনি হলেন ভদ্দরলোক। আমি হলাম গিয়ে ছোটলোক।

কে বললো? আমি বলেছি?

আহা! লোকে তো তাই বলবে বাবু। ছোটলোক হয়ে কি বলা যাবে—ও বিপিনবাবু। বিপিনবাবু। আমায় যে বলেছিলে—

বললেই আরেকটা কালো গাই কিনে দেবে—তার কি হোল? একথা বলা মাত্তর আমার মাথায় চটাপট চাঁটি পড়বে।

আমি সে ধারার লোকই নই খগেন। বললেই কিনে দেব।

ওভাবে হয় না বিপিনবাবু। মানুষ পালটাতে কতক্ষণ?

আমি পালটে কোথায় যাবো খগেন!

নিজের টাকায় সাধ না মিটলে কি তাকে হাউস বলা যায়? সাধ বলা যায়? ওভাবে সব যদি পেতাম—তাহলে লোকে বলবে—বিপিনবাবু বুড়ো খোকার বায়না মেটাচ্ছে।

তাহলে?

আমিও তো তাই ভাবি বিপিনবাবু। আমার নিজের কোন হাউস নেই। বেস্পতি দাসী কচুঘেচু যা রাঁধে—তাতেই আমি পেট ভরিয়ে চুপ করে পড়ে থাকার লোক। কিন্তু একবার আমার পয়সা হওয়ার দরকার। নিজের এলেম। দু'হাতে ওড়াবো। দু'হাতে উপায় করবো বিপিনবাবু।

তুই যদি একটা পাসও দিয়ে রাখতিস—তাহলে না হয় আমার অফিসে বলে-কয়ে তোকে গছাতাম। কিন্তু—। আচ্ছা, নাম সই করতে পারিস?

না বিপিনবাবু। আমার জানা বিদ্যে বলতে শেকড়-বাকড়। তুকতাক। চালপড়া। বাণ মারা। সাপ ধরা। সাপ চেনা। এই সব আর কি!

তাও তো সব তুমি করবে না।

কোথায়?

এই যে—আমার গাড়ির চোরের পেছনে তুমি তো চালপড়া, বাটিচালা কিছুই করতে রাজী হলে না।

আপনি তো অবুঝ লোক নন বিপিনবাবু। জানেন আপনি—বজরা আমার নিজের মেজো ব্যাটা।

ওহো! ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিকই তো। শেষে চালপড়ার

দরুন যদি নিজের ছেলের মুখে রক্ত উঠছে দেখতে হয়—তাহলে তো সর্বনাশ।

সব্বোনাশ বলে সব্বোনাশ। একে তো বেস্পতি দাসী চোপায় চোপায় উঠোন ফাটাবে। তারপব বজরা আছে না? ধরা পড়লে চোরের গলা সবচে' উঁচুতে ওঠে বাবু। পয়লা দফায় খতম করবে আমাকেই। এই বয়সে নিজির ছেলেব হাতে পিটুনি খেতি কার প্রবৃত্তি হয় বলুন?

একটা কাজ তুমি করতে পাবো খগেন?

আমার এলেমে হবে?

হতে পারে। সাপ যদি ধরতে পারো—

যে কোন সাপ ধরতে পাবি বাবু। আপনি পবীক্ষা করে দেখুন।

শুধু ধরলে চলবে না। ছাড়িয়ে তার চামড়া চালান দিতে পারো?

নিজির হাতে খুন করতে পাববো না বাবু।

তাহলে জ্যান্ত চালান দাও।

দেশেব জিনিস বাইরে চলে যাবে বাবু?

দেশের ভেতবেই অন্য জায়গায় যাচ্ছে তো।

কিন্তু দক্ষিণ মালঞ্চ শেষে একদিন সর্পহীন হয়ে পড়বে না?

ওরাও তো মাছের মতোই জন্মায়।

সব বাঁচে না। কিছু ওদের মা-বাবাই খেয়ে নেয়।

তাই নাকি? জানতাম না তো। একটা অফিস আমার চেনাশোনা আছে খগেন। তারা সাপের চামড়া, জ্যান্ত সাপের কারবারী।

খুন আমি করতে পারবো না জেনেশুনে। তাহলে ঘুম হবে না আমার বাবু।

তাহলে জ্যান্ত অবস্থায় ধরে ধরে পাঠাও।

একটা অবলা প্রাণীকে ধরে পাচার করতেও আমি পারবো না।

তাহলে করবে কি ? পড়ে-পড়ে মার খাও।

একটা কাজ করা যায় না বাবু ? আমি বিষ-ঝাড়ানো শিখে-ছিলাম। হয়তো এখনো পারবো।

হ্যাঁ। ভালো কথা খগেন। বিষেরও তো দাম আছে। আমি কালই খবর নেবো। বিষ দিয়ে কত ওষুধ হয় শুনেছি।

শেষ রাতে ভগবানের স্বপ্ন থেকে বেলা ন-টা দশটা অব্দি বিপিন-বাবুর সঙ্গে বসে এই কথাবার্তা বেশ ভালোই লাগলো খগেনের। ধানকাটা মাঠের ভেতর দিয়ে মাটিতে এখন গরম পড়তেই নুন ফুটছে। জোৎস্না রাতেও মাঠের ভেতর পায়ে-চলা লিকগুলো শাদা হয়ে ফুটে যাবে। নুন বানিয়েও পয়সা হয়। কিন্তু তাহলে হাঁড়ি-হাঁড়ি জল ফোটাতে হবে। নুন আর বিষ তো এক দামে বিকোয় না।

সেই তন্তর বাবার পাল্লায় পড়ে খগেন জোয়ান বয়সেই খপ করে সাপ ধরতে শিখেছিল। অনেককাল সে ওসব প্রাণী নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। কি হবে আর ভগবানের জীব চটকে-মটকে। তন্তর বাবা শিখিয়েছিল—কোন্‌টা হাসা কেউটে ? কোন্‌টা মাদী ? কোন্‌টা মেদো ?

দূর গাঁয়ে কোথাও নাল পুজোর বাজনায় ঢাকের কাঠি পড়ছে। মাথাভাঙা বাতাসগুলো বুনো তেঁতুল, শিরীষ, গাব গাছের গায়ে আছড়ে পড়ে গাছগুলোকে ঝালাপালা করে তুললো। সেই সঙ্গে মাঠ ঝাঁ্যাটানো ধুলো। তাকানো যায় না।

এর ভেতর কী একটা উদাসী ঢেউ দিল। ধুলো আর বাতাস মিশে গিয়ে। ধন্য বিপিনবাবু। তুমিও বাতাসের ঢেউ দেখতে পাও শুধু চোখে ? বাতাসের ফ্যানা ? আমি তো বর্ষাকালে ভিজে বটপাতায় সবুজের গাঁজলা টের পাই। মাটির ভেতর রস হলে কোদালে ভাঙা ঢ্যালার ভেতর সেই রসও আমি দেখতে পাই।

শূন্য মাঠের ভেতর একটাও গাই না পেয়ে দক্ষিণ মালঞ্চের

একমাত্তর ধর্মের ষাঁড়টা একা-একা দাঁড়িয়ে রোদে চান করছিল। ওর চোখে কাজল। মণির পাশে শাদা জায়গাটা লালচে। ঘাড়ের কুঁজটা এদিক-ওদিক হেলে যায়। এত মাংস। লেজে লোমের গুছি দিয়ে একটা বড় বেণী হয়। বাঁধতে পারলে। কিন্তু কে বাঁধবে?

ঠিক এই সময় তার ঘচ্ করে মনে হলো—এই জগতের এত আলো—এত ধুলোর ভেতর একজন শুধু আর আসে না। তার এক সময়কার মাইতি বউদি। পরে শুধু সুমতি বলে ডাকতো খগেন। আড়ালে-আবডালে। খুব সাবধানে। কোন সাক্ষী না রেখে।

ষাঁড়টাকে এখন আর তত অপদার্থ লাগলো না খগেনের।

নিজের বাড়ির উঠোনে ভালমতোও ঢোকে নি খগেন। বজরা একদম ঝামরে এসে সামনে পড়লো। কি গুণীন? কত টাকা খেলি?

চকচকিয়ে গেল খগেন। রোদে ভাজা উঠোন। তার ভেতর বজরা লোহার রড হাতে দাঁড়ানো।

ঠিকমতো কথা বল বেযাদব। আমি তোর বাপ হই।

বজরা ভেঙচে উঠলো। বাবাগিরি ঘোচাচ্ছি। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

শেষে তোকে কৈফিয়ত দেব নাকি?

তোর বাবা দেবে—বলে বজরা তেড়ে এলো।

খগেনও রুখে দাঁড়ালো। এই ও। খুব সাবধান। বাবা জিনিসটা হেলাফেলার না, বুঝলি আকাট—

কে আকাট দেখাচ্ছি এবারে। সত্যি বল তো, গুনেগেঁথে কি বলে এলি বিপিনকে?

এমন সময় সম্পতি তার ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে এলো। তখনই বলেছিলাম—যেও না। একটা কেলেঙ্কারি বাঁধালে তুমি।

আমি? না তুমি বাঁধালে? মায়ে-পোয়ে বেশ পার্টি বানালে বাবা!

বজরার চড় এসে খগেনের গালে পড়লো।

চড়টা দিয়েই বজ্রেশ্বর নস্কর সিধে টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এ রকম কাজ সে এর আগে কোন দিন করে নি।

ঘুরে পড়তে পড়তে খগেন নস্কর বারান্দার ঘুণধরা খুঁটি ধরে ফেললো। তার রাত-জাগা লালচে চোখে ভারি একটা জলের ফোঁটা। সে বজরার চোখে তাকিয়ে বললো, দেখবি ?

কি দেখাবে ?

তবে ছাখ্—বলেই খগেন নস্কর সেই ঘুণধরা খুঁটিতে ডান হাতের চেটোয় একটা ঘষ্টানি দিল। আর অমনি মাটিতে খুঁটির গোড়া থেকে একটা বড়-সড় কালচে সাপ বেরিয়ে এলো। এঁকেবেঁকে। একদম উঠোনের মাঝখানে।

বেলা দুপুর। তাতে, তাপে, ভাপে ভাজা-ভাজা উঠোনের সেখানটাতেই বজেশ্বর নস্কর হাতের লোহার ডাণ্ডা দিয়ে কালাচটাকে বাড়ি মারে—সেখানটাতেই দেখা যায় সাপটা নেই। একটু সরে গিয়ে বিঁড়ে পাকিয়ে ফণা তুলছে।

খগেন নস্কর মায়ে-পোয়ের পাগলাপারা দৌড়ঝাঁপ দেখে প্রায় তিরিশ বছর পরে হো-হো করে হেসে উঠলো। সে থামার নয়।

চার

সারা দক্ষিণ মালঞ্চ এক সময় আশপাশের তল্লাট নিয়ে সমুদ্রের নিচে ছিল। তখন খগেনের ঠাকুর্দাও জন্মান নি। সে-সব নিশ্চয় রামায়ণ মহাভারতের সময়ের কথা। এখনো এক সময়কার নদীর খাড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। নদী কবে লোপাট। খাড়িতেও জল

নেই। কিন্তু বেশ ডাবা জায়গা। এসব জায়গায় খগেনের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা নিশ্চয় বাঘ দেখে থাকবে। এখন একটিও হিংস্র প্রাণী নেই দক্ষিণ মালঞ্চে। মানে বাঘ বা নিদেনপক্ষে শুখো খালে কুমির।

কাজে নেমেই খগেন যা টপাটপ ধরে ফেললো, সেগুলো হলো গোসাপ। নিরীহ। গরম একদম সইতে পারে না। মাঠে মাঠে ধান চাষের বিষ। ওরা কেউ কেউ বুনো আতাগাছে উঠে বসে থাকে। ধরা পড়ার আগে তুরতুর করে ছুট লাগায়। দেশে খাবার নেই। গাছে ছায়া নেই। গর্তগুলোয় বিষগোলা জল ঢুকে গোসাপের পক্ষে এখন মরণকূপ।

একদিন বেঁকেই বসলো খগেন। এমন তো কথা ছিল না বিপিনবাবু?

কি হলো? অসুবিধে কিসের?

আপনি আমায় খুনী বানাচ্ছো—

নিজের হাতে ত খুন করছ না খগেন। আর ব্যবসায় নেমে এসব ত চলে না। নিজের এলেমে পয়সার মুখ দেখতে চেয়েছিলে। এখন তা দেখছ।

তোমরা ভদ্দরলোকরা বড় মানিয়ে কথা বলতে পারো।

বিপিন আর খগেনের কথাবার্তা এই ধরনেরই। বিপিন খগেনকে কখন তুই—কখন তুমি বলে। খগেন বিপিনকে কখন আপনি—কখন তুমি বলে।

খগেন আর বেশি বলতে পারলো না। পয়সা মানে অনেক টাকার নোট। তিন-চারশো তো হবেই। এক থাবায় মুঠো ভরে এনে দিয়েছিল বিপিনবাবু। এই নে খগেন। তোর পয়লা চালানের টাকা।

চালান মানে কেরোসিন কাঠের বাক্সে ভরে জ্যান্ত জন্তুগুলোকে সাইকেল ভ্যানে করে কলকাতা। তারপর সেখান থেকে টেম্পোর চড়িয়ে ট্যাঙরা।

বিপিন বলেছিল, মাল ছাড়িয়ে দাও না। তাহলে ব্যাগে করে ট্রেনে কলকাতায় পাঠানো যায়। এত গাড়িভাড়া লাগে না।

নিজির হাতে খুন? পারবো না বিপিনবাবু। ও জিনিস আমার গুরু শেখায় নি।

তিন-চার দিন ধরে জ্যান্ত গোসাপগুলোকে ধরে-ধরে বিপিনের গোয়ালে রাখতে হয়েছিল। গাইয়ের জাবনা দেওয়ার শুকনো চৌবাচ্চায়। তারপর কাঠের মিস্ত্রি ডেকে চালানের বাক্স বানানো। সারাদিন খুটখাট আওয়াজ। সিদ্ধেশ্বরী চটেমটে বলেই বসলো বিপিনকে—এ তোমরা কি শুরু করলে! দুপুরে একটু ঘুমোনো যাবে না? শেষকালে সাপের কারোবার? ঘেন্না! ঘেন্না!

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তো তলপেট ভারি করলে। কোনদিন আর বিয়োবে না?

এবার থেকে তুমি বিয়োবে। অফিস যাও না কেন?

অফিসে কোন মজা নেই সিধু। ছুটি পাওনা অনেক। সেগুলো ভোগ করবে কে?

অফিস বুঝি মজার জায়গা?

তা না তো কি? জীবনটাই তো মজার। অফিসে কোন মাঠ নেই। খাল নেই। আকাশ বলতে জানলা দিয়ে যেটুকু চোখে পড়ে।

টেবিল চেয়ার নিয়ে গড়ের মাঠে বসলে পারো। যাও, যা করছিলে করো গিয়ে। আমি আর রোদে দাঁড়াতে পারছি নে।

সবে বোশেখ মাস। এখনো তো রোদ ছাড়েই নি। পরে করবে কি?

বাড়ির চারদিকে গাছ লাগাতে বলেছিলাম।

লাগিয়েছি তো। তাদের বড় হতে দাও।

অফিস তোমায় খাটায় না কেন বল তো?

খাটালে সুখী হবে সিধু?

খুব।

এক সময় তো খেটেছি। মনে নেই? যেমন—

যেমন কি গো? থেমে গেলে কেন?

এ-কথায় বিপিন বুঝলো, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সিধু আদুরে গলায় কথা বলতে শুরু করেছে। যখন এসব করার কথা, তখন কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী একদিনের জন্যেও ওগো, হ্যাঁগো করে নি। বরং তার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর খেটেছে। খেটেছে বাড়ি তুলতে। গাছ বসাতে।

আর এখন যতই দিন যাচ্ছে—সিধু ততই আদুরে হয়ে উঠতে চাইছে। গলায় আতু-আতু ছাতু-ছাতু ভাব। বিকেলের দিকে বিপিন সিধুকে ঘাড় গুঁজে কাঁদতে দেখেছে। এই গরমে গায়ে ফুলহাতার ব্লাউজ। মুখখানা ভরন্ত। কালো, মোটা এক বেণীতে লাল টকটকে গোলাপ গোঁজা। সিনটা বিপিনের খুব ভালো লাগে। দাড়ানো সিধুর পাশেই টেলিফোনটা পড়ে থাকে। ও ফোনে কলকাতা পাওয়া যায় না। পাঁচ মাইল দূরের থানাও ধরা পড়ে না। মাঝে মাঝে রং লাইন আসে। এই পর্যন্ত। ব্যস।

এক সময় কি খাটি নি সিধু? তোমায় বিয়ে করবার জন্যে? তোমার বাবা মা তো চান নি আমার সঙ্গে বিয়ে হোক। মনে আছে?

আমায় বিয়ে করে ভুল করেছে। একটা বাচ্চা অব্দি হোল না তোমার।

সেজন্যে কোন দুঃখ নেই আমার সিধু। তুমিই শুধু শুধু মন খারাপ করো। বিকেলে বসে বসে কাঁদো। ছাখো তো, আমি কত কাজে ব্যস্ত থাকি।

সে তো সবকিছু ভুলে থাকার জন্যে।

না, না। অত সেন্টিমেন্টাল নই আমি। এই আয়েস করে বসে থাকতে—কাজকর্ম চালাতে পয়সা লাগে না? মাইনের টাকায় হয়?

তাহলে টাকা পাচ্ছো কোথায় ?

চুরি করি নি। ধার করি নি সিধু।

তাহলে—

কাজের ভেতর থেকেই পয়সা তুলছি।

কি রকম ?

খগেন জ্যান্ত গোসাপ পাঠালে। ট্যানারি এমন সুন্দর নিখুঁত চামড়া কোন দিন পায় নি। চেকোশ্লোভাকিয়ায় পাঠাচ্ছে ট্যানারি। চামড়া পিছু আমার কমিশন তিন টাকা।

খগেন জানে ?

জানলে তো ভাগ চাইবে। ও যা পাচ্ছে তাতেই খুশি। সাপ পিছু ন' টাকা। এত টাকা একসঙ্গে খগেন কোন দিন চোখে দেখেছে ?

ওরা সাপগুলোর চামড়া জ্যান্ত অবস্থায় ছাড়াচ্ছে ?

আরে না না! উইপোকার গায়ে ঘুমের ওষুধ ছিটিয়ে গোসাপ ছেড়ে দিচ্ছে ঘেরা জায়গায়। উই খেতে ওরা খুব ভালোবাসে। মেইন ডায়েট। খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ছে। তখন পাকা হাতে— বলে আর কথা শেষ করলো না বিপিন। বুদ্ধিমানের সফল হাসি হাসলো হা-হা করে।

সিদ্ধেশ্বরী টের পাচ্ছিল, বিপিনের এই হা-হা হাসি একখানা ছুরি হয়ে তার তলপেটে বসে যাচ্ছে। যে বাচ্চা সে এখনো বিয়োয় নি, সেই বাচ্চার গায়ে ছুরিখানা একটু-একটু করে বসে যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়লো, একদিন খুব ভোরে সে একজোড়া গোসাপ দেখেছিল। জানলা দিয়ে—নিচের বাগানে শিউলিতলায়। ওরা শিউলি গাছের শুয়োপোকা খেতে এসেছিল। বড় নিরীহ। একটু শব্দ হলেই ছুটে পালায়। মাটিতে গুঁড়ো ধুলো। তার ভেতর শুয়োপোকা। উইপোকা। গুবরে। সবই মুখে পুরে টপাটপ—আর ঠোঁটময় ধুলো।

ওরাও তো ফুরিয়ে যাবে একদিন।

না না। ফুরোবে কেন? অনেকগুলো করে বাচ্চা পাড়ে—

ডিম থেকে?

তা আমি জানি নে।

বড় হতেও তো সময় নেবে। একদম কচি ছানার চামড় তো বিকোবে না।

বর্ষাকালে বাড়বে। তখন তো আর ধরা যাচ্ছে না। কাজও বন্ধ থাকবে। ঢাবা জায়গায় বাচ্চাগুলো উই খেয়ে-খেয়ে নাতুসনুতুস হবে—

চুপ করো। আমি আর শুনতে পারছি নে—

আরো আছে সিধু। এ চালানোর পাশাপাশি খগেন বড়-ভাইদের ধরবে।

বড়ভাই?

বুঝলে না। এখনো তো মাঝে-মাঝে ধরে। খাঁটি বিষধর

কেউটে?

তা তো থাকবেই। আরও থাকবে—চন্দ্রবোড়া, কালাচ, হ না। কেউটে, শামুকভাঙানী, গেঁড়িখোর—কত কি!

এদেরও মারবে? ওরাও কিন্তু ছোবলাবে তা হলে। দেখে নিও—

একদম মারবো কেন? পুষবো সিধু।

না না। এ-বাড়িতে ওসব চলবে না।

আলাদা ঘর বানাচ্ছি। তারের ঘন জালের ঢাকনা থাকবে। থাকবে খাবার জলের বাটি। পোনা ব্যাং ভেতরে ফেলে দেবার ফোকর। জীবগুলোর তো আহার চাই—

ছাখো। তুমি আজকাল ওদের সঙ্গে মিশে-মিশে ওদের ভাষায় কথা বলো কিন্তু।

খারাপ কি সিধু। মানুষের লেবার নিয়ে আমার কারোবার।

আবার কারোবার? কেন? কারবার বলা যায় না? সেদিন

বলছিলে—বালককাল। আরেকদিন তোমার মুখে শুনলাম—অপরিযাপ্ত। তদ্দণ্ডে। ওসব কি কথার ছিরি! সাপ-টাপ বাড়িতে এনো না। ওরা খুব হিংস্র হয়। তক্কে-তক্কে থেকে শোধ নেয়।

পয়সা আছে সিধু। পয়সা। যোগায় যোগায়—অমাবস্যা, পূর্ণিমায় ওদের বিষ জমা হয়—তখন খগেন শিশি ভর্তি করে ঝেড়ে নেবে। দশ সি. সি.-র দাম বারো টাকা পঁচিশ পয়সা। জমা দিলেই পেয়ে যাবো। দশ সি. সি. পিছু আমার চার টাকা। বাকিটা খগেনের।

খগেন জানে?

একসঙ্গে সব জানাতে নেই। আস্তে-আস্তে জানুক। আমি ছাড়া এ-রাস্তার খবর কলকাতা থেকে কে ওকে এনে দিতো? বলো? তাই আমার তো কিছু পাওয়া উচিত। তাই না?

নিশ্চয়ই! কিন্তু বিষ তো একদিন ফুরোবেই—

বয়স হলেই ফুরোবে। তখন গায়ে থাকবে পাকা চামড়া। সে চামড়া—হাঃ! হাঃ!

আর কথা শেষ করলো না বিপিন বসু। হাসির দমকে তার চওড়া কাঁধ উঠছিল। নামছিল। বটগাছের ভেতর দিয়ে প্রথম বৈশাখের বাতাস। বেলা এগারোটা চল্লিশের আপ ট্রেন চলে গেল। কাজের লোকজনের খাল ছেঁচা থেমে নেই। সেই সঙ্গে মাছ ধরা। খালটা শুকিয়ে জায়গায়-জায়গায় গভীর করে কাটাবে বিপিন। বর্ষাকালে সেখানে উঁচু জায়গার সব জল গড়িয়ে এসে জমবেই। সেইসব জায়গায় পাম্পের নল সহজেই জল টেনে তুলতে পারবে।

বেশি দামে বিক্রি করবে তো?

হ্যাঁ সিধু।

কিন্তু খগেন তো খুন করবে না।

আমিই কড়া ঘুমের ওষুধ বেশি ডোজে খাইয়ে দিয়ে বাক্স ভর্তি করাবো। তারপর সিধে ট্যাংরায়। স'বারোটার ট্রেনে। হাঃ! হাঃ!

এক ধমকে বিপিনের হাসি থামিয়ে দিয়ে সিদ্ধেশ্বরী হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়লো। তুমি মানুষ? তুমি কসাই! কসাই!

যতই কাঁদো। একটা বুড়ো গেঁড়িখোর কেউটের পাকা চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ অর্ডার দিয়ে যখন বানিয়ে এনে দেবো, তখন এই সিদ্ধেশ্বরী দেবীই হাতে ঝুলিয়ে ড্রেস করে বেড়াতে বেরোবে।

কক্ষনো না। বাড়িতে পুষে—বিষ বেচে-বেচে—তারপর খুন? সেই চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ?

হুঁা। ওইসব দিয়েই তো হয়।

জেনেশুনে কোন মেয়ে হাতে নেবে না। তোমার কোন ছেলে-পিলে হয় নি?

না। তার কারণ অন্য। সে তুমিই জানো ভালো করে সিধু। তোমার বাচ্চা যদি না হয় আমি কি করবো? আমার দোষ?

এজন্যেই বাচ্চা হয় নি আমাদের। তোমাকে তো আমি কম দিন দেখছি না। আর কথা বলতে পারলো না সিদ্ধেশ্বরী। তার সব কথা কান্না এসে একদম ভাসিয়ে দিল।

অতো কাঁদো কেন আজকাল বল তো? আমার কি কোন আহ্লাদ থাকতে নেই সিধু?

কিছু ভালো লাগে না আমার। কিচ্ছু ভালো লাগে না।

ভাল লাগাতে জানা চাই। ওটাও একটা আর্ট সিধু।

সেই আর্ট তো তুমি করছো খগেনের সঙ্গে। সকাল-সন্ধ্যে। মাঠে-মাঠে। গর্ত আর ইটখোলা ঘেঁটে-ঘেঁটে।

এটা তো একটা কারোবার।

আবার? আবার কারোবার? তুমি আমার সামনে থেকে যাও।

কোথায় যাবো? এত বড় বাড়িতে তো শুধু তুমি আর আমি সিধু?

আমায় কলকাতায় রেখে এসো।

ভালো কথা! শিবানী আসছে। কিছুদিন থাকতে চায় এখানে।

দেখা হয়েছিল?

না। অফিসে টেলিফোন করে বললো, বড়দা। আপনার ভাই তো টুরে যাচ্ছে তিন হপ্তার। আমি গিয়ে থাকবো দিদির কাছে। এই অব্দি বলে বিপিন সিধুর মুখের দিকে তাকালো। আমি তো বলে দিলাম—চলে এসো। তোমার কোন অসুবিধে হবে সিধু?

আমার জা আসবে, তাতে অসুবিধে কিসের? কিন্তু দেখো, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে আসছে না তো?

সেটি তো গুণধর! ছেলের বয়স বারো। তাকে হোস্টেলে দিয়ে নিজে রোজ বেহেড্ হয়ে ফিরছে অফিসের পর।

বিপিনের গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধেশ্বরী বললো, সেই সঙ্গে তিন-চারটে করে ঘুমের বড়ি। একদিন মরে যাবে। কি যে হোল ঠাকুরপোর –

বিপিন বলতে যাচ্ছিল, ভালো চাকরি করে। সুন্দর ফ্ল্যাট! ফুটফুটে একটি ছেলে। শিবানীর মতো বউ। তবু রোজ ড্রিংক করে অজ্ঞান হওয়া কেন? কিন্তু এর কিছুই না বলে সে সিধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। একখানি সুন্দর মুখ। সেই মুখের অদৃশ্য কোন জায়গায় এইমাত্র একটি আলপিন ফোটানো হয়েছে।

দক্ষিণ মালঞ্চে এখন বেল এগারোটা স' এগারোটা হবে। বৈশাখ মাসের দুপুরের তাত সব জিনিসে। দশ ঘোড়ার ইলেকট্রিক মোটর নিঃশব্দে জল তুলে যাচ্ছে। এক ধামা আকাশ খগেনদের গাঁয়ের মাথায় উপুড় করে বসানো। খগেন খাল পেরিয়ে ঘোষেদের পোড়ো ইটখোলায় এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জায়গাটা তার খুব ভাল লাগে। গাছের ছায়া। গর্ত। বুনো আতা গাছের গায়ে কালচে দয়ার গুঁড়ো মাখানো, তার ওপর কালো গা—হলুদ ঠোঁটের এক কুচি এক পাখি। এসব জায়গাতেই বড়ভাইরা থাকে।

তাদেরই একজনের একটা খোলস খগেনের পায়ের কাছে পড়লো।

এখানে তিরিশ বছর আগেও চালু ইটখোলা ছিল। খগেন নিজে দু-এক সময় কাজ পেয়েছে। তখন আট আনা রোজ মানে অনেক পয়সা।

আর এখন সে দিনে কোন-কোন দিন বিশ টাকার ওপর উপায় করে। কালই রাতে হাজরা উঠোনে বসে বলছিল, এবার বাবা ইলেকট্রিক আনেন। ছাদে টালি আর দেওয়াল ভেঙে ইটের গাঁথুনি করে দেখালেই ইলেকট্রি আনা যায়।

খগেন সারাদিন মাঠে-মাঠে ঘুরে এই সময়টায় কাঁধে একখানা গামছা ফেলে বাতাস খায়। সে হাজরার কথায় খিঁচিয়ে উঠে একবার শুধু বলছে, নাঃ! এখানে আর আমি পয়সা ঢালবো না।

বেস্পতি এগিয়ে এসে বলেছে, তবে কোথায় ঢালবে? শহরে গিয়ে মেয়েমানুষ রাখবে?

কেন বাজে বকিস? মেয়েমানুষ এলো কোত্থেকে এর ভেতর? শহরে গিয়ে বাড়ি করবো। বিপিনবাবু বেল গেটের ওপারে ব্যাঙ্ক আমার নামে টাকা জমা দিচ্ছে।

অন্ধকারে অন্ধকারে বজরা কখন এসে বারান্দায় বসেছে—কেউ টের পায় নি। টের পাওয়া গেল—সে কথা বলে ওঠায়। ওই বিপিনবাবু তোমার টাকাগুলো গায়েব করবে। দেখো।

সবাই চোর ছ্যাচোড় না। আমি টিপ-ছাপ দিলে তবে টাকা উঠবে

একটা টিপি-ছাপ জাল করা কি কিছু কঠিন?

বজরার এ-কথায় খগেন বেশ রাগের গলায় বললো, হ্যাঁ। কঠিন। ব্যাঙ্ক অত সোজা জায়গা নয়। আমার ছবি জমা আছে। ছবির সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে তবে টিপ-ছাপ নেবে—তারপর টাকা দেবে।

দু গ্লাস তাড়ি হাতে ধরিয়ে দিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে বিপিন-

বাবু। ওই বাবুটি তোমার সব্বোনাশ করবে, এই আমি বলে দিচ্ছি বাবা।

বিপিন খুব ভালো লোক। কোন অভাব নেই। কোন পেয়োজন নেই।

বজরা ফুঁসে উঠলো। তাহলে তোমায় কেন কলকাতার আড়তের সঙ্গে চেনা-পরিচয় করায় নি? ফাঁকতালের কমিশনটা মারা যায়!

খদ্দের যোগাড় করে দিল লোকটা। দস্তুরী নেবে না? সবটাই আমি পাবো।

বেস্পতি ছেলেকে থামালো। তুই থাম বজরা। তোদের বাবা সেধে বঁড়শী গিলছে তো আমরা কি করবো?

এইভাবেই এক-একদিন কথা হয়। টাকা-পয়সার কথা। ঘরবাড়ির। গোসাপের। আবার কখনো-কখনো খগেনের বিদ্যা-শিক্ষার কথাও হয়। ঘটি জানতে চায়, বাবা, তুই এসব শিখলি কখন? আমার সঙ্গে বসে যখন গাছতলায় রস খাস—তখন তো কোথায় কিছু বোঝাই যায় না তোর! আর পাঁচখানা বাপের মতোই লাগে তোকে।

কোলের ছেলেটির কথায় খগেন একগাল হেসে বলে. ত. আমি কি সব সময় ভেলকি দেখাবো?

বজরা এখন আর তার বাপকে ঘাঁটায় না। তবু তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, এবার আমি এই বিপিন ব্যাটার পেটটা ফাঁসাবো।

খালি কুচিন্তা তোর। নিজের কথা ভাব তো এবার।

ফাঁকতালে দালালির গুষ্টি মারি। জেনেশুনে ঠকে কি লাভ তোমার?

যে পয়সা আসছে—বিপিনবাবু না হলি আসতো?

বজরা অন্য কথায় চলে গিয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে বললো, কুড়িটে টাকা হবে?

ওই খুঁটির ভেতরে আছে। নিয়ে যা। বেশি নিবি না কিন্তু—

না। না। পাগল নাকি! বলেও বজরা খুব সাবধানে খুঁটিতে খগেনের টাকা রাখার ফটোয় দুটো আঙুল কাইচি করে নামিয়ে দিল। এই খুঁটিতে হাত ঘষেই খগেন নস্কর দিনের আলোয় সাপ নামিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে এই ভেলকিবাজ, আগান-বাগান ঘোরা বাপখানা সামলে-সুমলে নাড়াচাড়া করে বজরা।

স' এগারোটার গাড়ি চলে গেল। খগেন পোড়ো ইটখোলার ঝামা পাঁজায় সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছিল। এই হোল গিয়ে বড়ভাইয়ের জায়গা। পাতিঘাসের আড়াল, জলের গায়ে গর্ত—এসব হোল গিয়ে বিষধর জিনিসদের আস্তানা আড়ত। দল পাকানো ঝামাগুলো কবেকার—তার ঠিক নেই। ফাঁকে-ফোকরে বড় বড় ঘাস। ভেতরটা কুঁজোর জলের চেয়েও ঠাণ্ডা। এইসব অন্ধকার শীতল রাস্তা দিয়ে চন্দ্রবোড়া সর-সর করে সরে যায়। মানুষজন কাছাকাছি থেকেও টের পায় না। চন্দ্রবোড়া কিন্তু দূর থেকে সবকিছু একা একা নজর রাখে। কে কোন্ দিকে যায়। মানুষ নামে অত বড় জন্তুটা কেন যে হাঁটে, কেন যে শুয়ে পড়ে আবার কেন যে ছুটে গিয়ে ট্রেন ধরে—চন্দ্রবোড়া কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

দাড়িবাবা বলতো, চাঁদবোড়া। ভগবানের বড় তেজি জিনিস। রাগলে লাফিয়ে-লাফিয়ে ছোবলায়। অমাবস্যায় মাথায় বিষ ওঠে। তখন মাথা ধরে থাকে ওদের। সাবধানে এগোবি খগেন। নয় তো এমনি ওরা না ঘাঁটালে কাউকে কিছু বলে না। এই তো কত বাবু বর্ষাকালে ছিপ ফেলে বসে থাকে। পাশে পিঁপড়ের ডিম। নালসে পিঁপড়ের। কচুপাতায়। লুকিয়ে-লুকিয়ে পাশ থেকে চেটে খাবে। ছিপবাবু টেরও পাবে না। পরিমাণ মতো চেটে নিয়ে সটকাবে।

এই হোল গিয়ে চাঁদবোড়া। সাবধানে ধরিস বাবা। গুরুর নামে মুঠো এগিয়ে দিবি। মনে থাকে যেন। ইছাপুর শ্মশানের কথা মনে এলেই খগেনের বুকখানা ফাঁকা হয়ে যায়। দাড়িবাবা

তাকে বড়ো ভালবাসতো। দিনে-দিনে বাবা অনেক দূর চলে যেত। শ্যামা বাওড়ের ধারে-ধারে কচিমূলের কেওড় তুলে ফেলতেই ভেতর থেকে নরম নালাপন বেরিয়ে পড়ে। বাবা চোখ বুজে সে-সব গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে গুঁড়োগাড়া, কচিকাঁচা টেনে বের করে। হাতে নিয়েই দূরে ছুড়ে দিয়ে বলে, তোদের বাপ মা আহারে গেছে? যাঃ! পালা।

তারপর ফাঁকা গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে কি এক মূল বের করে আনে। এই লতাটির গোড়া আবার বড় দরকারি। এক-একদিন ইছাপুর শ্মশান মড়ায় ভরে যেতো। তাদের মালসা কুড়িয়ে এনে খগেন—তখনকার খগেন শীতের রাতে আগুন তুলে রাখতো। নদীর বাতাসে চিতার কাঠ বড় তাড়াতাড়ি জ্বলে যায়। তাই এই ব্যবস্থা।

বাবা সেই নালা খুঁচিয়ে তোলা মূল মালসার আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খায়। কচকচ করে। মাঝরাতে চাঁদ দেখা দিলে নদীখানা মেঘের ছায়ায় ময়লা কাপড় একদম। ঠিক এই সময় জলের ওপর পা দিয়ে কারা এপারে উঠে আসে। বাবা হাসতে হাসতে ডাকর দেয়, আয়! আয়! তোরা সব আয়!

এদিক-ওদিক তাকিয়ে খগেন তখন কাউকে দেখতে পায় নি। অথচ বুঝতে পেরেছে, কারা এসে জড়ো হলো। একজোটে তাদের সবার নিঃশ্বাস একতালে ওঠে নামে।

বাবা সেই মূল চিবিয়ে খেতে-খেতে বলে, এ হলো ব্রহ্মাত্মা শেকড়! কেউ জানেই না কোথায় থাকে। জানলেও ক'জনের বুকের পাটা আছে আনবার? যমের খাস তালুকের জিনিস। বাড়ির কর্তা আহারে বেরোলে তবে ছানাপোনা ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়ে তুলে আনতে হয়।

খগেন ভয়ে-ভয়ে বলেছে, ওরা কারা বাবা?

ওদের তুই দেখতে পাবি নে। এ তো আর বটতলায় পায়রা নামানো নয়।

ওরা কারা বাবা?

নানা জায়গার। নানা লোকের। বাতাস দেখতে শিখলে তার ভেতরে আরেকটা আশ্বাস দেখতে পাবি। সেখানেই ওরা থাকে। কত কালের সবাই—

তারপর নিজেই বলেছিল বাবা অনেক কথা। তখন রেললাইন বসে নি এদিকে। নদীটা আরও বড়ো ছিল। বটতলায় ওই বটগাছটা জন্মায় নি; শ্মশানে আরও জঙ্গল ছিল। এত মানুষ ছিল না। আকাশ আরও পরিষ্কার লাগতো। বাতাস ছিল পাতলা।

তারপর আর কথার শেষ নেই। গল্পকথার মতো। খগেনের সব মনে নেই। মাথা গুলিয়ে যেত। একজোটে দাঁড়ানো অদৃশ্য সব নিঃশ্বাস। সেখানে ফিসফিস করে কে বলে উঠতো, খগেন। তোমার আগে আমি তুমি ছিলাম। কেউ বলতো, তুমি এক সময় খগেন আমি ছিলে। এই আমি।

নিজের অনেক আগে চলে যাওয়া, কিংবা, নিজের অনেক পরে চলে যাওয়া, এই ঝাপসা যাতায়াত খগেনের মাথা গুলিয়ে দিত। সে পরিষ্কার বাবার দিকে তাকিয়ে বলতো, আমি মুখ্যু মানুষ বাবা। আমাকে নিয়ে আপনার লীলাখেলা করা মানায় না।

তুমি মুখ্যু নও খগেন। তুমি সিধে লোক। এরকমই থাকো। বেশি লোভ কোরো না কোনদিন।

এই লোভ কোরো না কথাটা রোদে-ভাসা মাঠঘাট, খালপাড়ে আছড়ে পড়ল। তারপর সেই এতটুকু কথাখানির সেকি তোলপাড়। লোভ কোরো না—কথাটা খালপাড়ে আছাড় খেয়ে ঝামায় পোড়ো পাঁজায় টুকরো-মুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। খগেনের পায়ের নিচে সব জায়গা পুড়ে যাচ্ছে। কোথাও সে পা রাখতে পারছে না। সূর্য এখন তার ঠিক মাথার ওপর। আতাবাগানের খয়েরি সবুজ পাতাগুলোও জ্বলে যাচ্ছে। আমি লুভী। লোভ করেছি। নয় তো গোসাপগুলো ধরে-ধরে চালান দিচ্ছি কেন? পয়সা হবে!

সেই পয়সা দিয়ে হাউস মেটাবো! ইচ্ছেমত খরচা করবো।'
তাই তো।

বাবা তাকে একটা জিনিস শিখিয়েছিল। যখন তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছো না—তখন মনে রেখো—কেউ না কেউ খুব মন দিয়ে তোমাকে দেখছে—আড়ালে বসে চুপটি করে। স্থির দৃষ্টিতে। সেই দৃষ্টি এসে গায়ে বেঁধে। এই বিঁধুনি যেদিন টের পাবে—সেদিন থেকে তুমি অনেকগুলো চোখের মালিক। তার একটা চোখ তোমার পিঠে বসানো। তা দিয়ে পেছন দিকটাও দেখতে পাবে। সেই চোখ দিয়ে খগেন দেখতে পেলো, ঝামার পাঁজার ফোকর থেকে এক চন্দ্রবোড়া তার ওপর নজর রেখেছে। সে যেন এই বড়ভাইয়ের নজরবন্দী। অথচ বাবার কথায় এখন তার সারা হাত-পা জ্বলে যাচ্ছে। লুভী হবে না। লোভে দুর্গন্ধ থাকে।

বেলা বারোটা হবে। ঘচ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাঁচ হাতের ভেতর খগেন নস্কর ঝামার পাঁজার সেই ফোকরে চোখ রাখলো। কি গো চাঁদবুড়ো? মাথা ধরেছে?

চাঁদবুড়োর চোখে কোন উনিশ-বিশ নেই। ঠাণ্ডা সোজা নজর।

খগেন হাত পাঁচেকের ভেতর এবড়োখেবড়ো ঝামাগুলার মাথায় সাবধানে পা দিয়ে একদম ফোকরের মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। এই নে। খা—

খগেনের হাত চন্দ্রবোড়ার ছোবলের আওতায়।

নে। খা চাঁদবুড়ো। এই লুভী হাতখানা ছুবলে দে। যত পারিস ঢাল। ঢেলে দে গরল। বিশ্বেস কর চাঁদবুড়ো, কিচ্ছুটি বলবো না। এই গ্যাখ, হাতের তাগা খুলে ফেলে দিচ্ছি।

খগেন সত্যি-সত্যি বাঁ-হাতের বাজুমূল থেকে তাগাটা খুলে জলভর্তি ইটখোলার বাতিল গর্তে ছুড়ে দিল। এবার বিশ্বেস হোল তো বুড়ো?

হাত গিয়ে যখন চন্দ্রবোড়ার মাথায় ঠেকে-ঠেকে, তখন খগেনের ভেতরকার পাকা হাতখানা গিয়ে খপ করে মাথাটা মুঠো করে ধরে ফেললো। ইচ্ছে করে নয়। অভ্যেসবশে। কি রে, জিভও বের করছিস নে?

কথা আটকে গেল খগেনের মুখে। বড়ভাই! একি দশা তোমার? কখন? মাথা তো এত ভারি হয় না তোমাদের!

খগেন তার এই জীবনে অনেক চাঁদবুড়ো ধরেছে। প্রমাণ সাইজের হাতের চেটোর চেয়েও বড় মাথা। টেনে বের করলো। উরি বাস! কি লাশ! কখন মারা গেলি?

ফাঁক-ফোকর থেকে লম্বা শরীরটা বের করে এনে দেখলো খানিকটা এরই ভেতর খাওয়া-খাওয়া। কালই রাতে সম্ভবত পটল তুলেছে। এর ভেতর বিষ পিঁপড়ে ছাড়া কারা ওর এ-দশা করতে পারে? আর পারে বেজি। এদেশে বেজির জ্বালাতন বড্ড বেড়েছে। হয়তো ঝামার পাঁজার বেকায়দায় ফোকরে আটকে গিয়ে থাকবে চাঁদবুড়ো মশাই। নড়নচড়ন নট হয়ে গিয়ে বেজির পালের মুখে পড়ে গিয়ে থাকবে।

বয়েস হয়েছিল। চর্বির পরতের ওপর পাকা চামড়ার ঢাকনা। হাত পিছলে যায়। মুখের দিকটা সল ছিল বলে বেজিরা মুখের কিছুই করতে পারে নি। কিন্তু পেছন থেকে ধারালো দাঁতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে কামড়ে ধরেছিল বেজিগুলো। হ্যাঁ। বেজিই হবে। সারি-সারি দাঁতের দাগ লেজে। কামড় ধরে রেখে পিছু টেনেছে। তাই মাথাটা আটকে গিয়ে একধারায় চোখ চেয়েছিলো তার দিকে। কী সুন্দর চেহারার জিনিস। আর কি দশা। মরণের পরেও খোলা চোখে চেয়ে থাকা।

গোড়ায় ইচ্ছে হয়েছিল, মাথার ওপর এক ঘুল্লি দিয়ে শূন্যে ছুড়ে দেয়। কিন্তু তাহলে শকুনে চিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করে ছড়াবে শরীরটা। বেঁচে থাকলে এমন উপায় ছিল? ওরা ধরা পড়ে বেতের ঝাঁপিতে

ভেতর রাগে গরগর করে। কী
সাধ্যি? জলে বোঝাই গর্তটার গ
তারপর চাঁদবুড়োর মাথায় নারকে
দিল। পৃথিবী এখন এখানে এক
ডালপালা স্থির। একটা হাব
খুঁজছিস।

খগেন জানে, গোসাপদের এক
জেরবার হয়ে খাল পেরিয়ে এখন এ
বেঁধেছে। রোদে মাটির ভেতরটাও
উঠে আসবে এবারে। তখন লোভে-
চাই কি দু-তিনটে একসঙ্গে। দূর থে
পেয়োজন পড়ে না খগেনের। সে আলগে
থেকে তুলে নেয়। ছোঁ মারার কায়দায়। দ.
পায়ের আওয়াজ লুকোবার পলিসি তাকে শিখি..
খগেন নস্কর এখন শুকনো বাঁশপাতার ভেতর দিয়ে
গোড়ালি বসিয়ে হাঁটবে, যাতে ভুইপোকাগুলোও টের পা..
কিন্তু এই লুভী হাত-পা যে তার জ্বলে গেল।

খালে কাজের মানুষজন এখন একটাও নেই। সবাই যে যার বাড়ি খেতে গেছে। জল ছেঁচার ইলেকট্রি মেশিন একা-একা তার কাজ করে যাচ্ছে। খালের বুক প্রায় শুকিয়ে আসার দশা। এক একদিকে বাঁধ দিয়ে জল ছেঁচা চলছে। বিপিনবাবু মেশিনের মুখোমুখি জায়গাগুলো গভীর করে কাটিয়ে নিচ্ছে। যেটুকু জল থাকবে, সবই এসে মেশিনের নলের মুখে দাঁড়াবে। তাই এত কাণ্ড।

নির্জন মাঠের ভেতরে মেশিনের নলের মুখে দাঁড়িয়ে হাত-পা ধুয়ে নিল খগেন। এত লুভী আমি কবে ছিলাম? বিড়বিড় করতে করতে খগেন খালপাড়ে উঠলো। বিপিনবাবুর টেনে আনা ইলেকট্রি

তে এইভাবে কত চাঁচবুড়ো ফণা
মেরে শেষমেষ মাটিতে শুয়ে
। খগেন দেখলো, রোদ্দুরে রং
মেঘ জায়গা বদলাবদলি করে
যাচ্ছে। নিচে তখন দরজা জানলা
চ্ছ। লোকটা যে কি! খুব কম
াড়ি ফিরে আসে।
কলো না রে।
া! তুমি তো শহরেরই লোক।
খনো দক্ষিণ মালঞ্চে ছিলাম।

কোন সময়ে—সবই আমার চেনা লাগে
বীতে পা রাখি আমরা। পৃথিবাটা কেটে
াড়াই। সেই ইটের বাড়িতে ঘুমোই। সেই
করি। সেই জলে ডাল চড়াই। আবার সেই পৃথিবীর
টা খুবলে নিয়ে কাঠ সাজাই। তারপর ধরাধরি করে নিজের
াটা তাতে চড়াই তো। কেমন কিনা? ঠিক বলি নি?

সব গুলিয়ে গিয়েও কথাগুলো কেমন ঠিকঠাক লাগে খগেনের। এত বোঝো যখন বিপিনবাবু, তা হলে একটা কথা বলি।

এক কেন? শও বলো। এক গ্লাস ছেঁকে দি?

সায়ের অপেক্ষা না রেখেই ঢেলে দিয়েছে বিপিন।

পয়সা চাইলাম। নিজের এলেমে পয়সা চাইলাম বিপিনবাবু। কিন্তু এ তুমি কোন্ রাস্তা ধরালে?

কেন? কেন? এই তো বেশ। গোসাপ ফুরিয়ে যাচ্ছে তো। আবার হবে। মানুষ জন্মাচ্ছে পিলপিল করে। ওরা ওদের গর্তে জন্মাচ্ছে গলগল করে। জন্ম থেমে নেই খগেন। এ একদম মহা।

ওকথা বলছি না বিপিনবাবু—

কে কার কথা শোনে? বিপিন তখনো তার তোড়ে বলে যাচ্ছিল। গোসাপ যদি না-ই পাওয়া যায় তাতে কি? আমরা হাসা কেউটে ধরবো। কালাচ ধরবো। ধরবো চন্দ্রবোড়া, গেঁড়িভাঙা, শামুকভাঙনী, কত কি আছে। এ কি ফুরোবার! জন্মেই যাচ্ছে সবাই। আমবা সবই ধরবো। বিষকে বিষ চালান দেব আমরা। দরকার পড়লে চামড়া। আরও বেশি পয়সা আসবে।

আমরা ধরবো কোথায়? ধরবো তো আমি বিপিনবাবু।

আমি চালান দেব।

তুমি খুন করাবে—তাই তো?

সব সময় কেন? বিষ তো আগে—

হ্যাঁ। গরল। মুখটা হাঁ করিয়ে চাপ দেব। গরল নিকেশ হয়ে যাবে।

এই তো খগেন। বেশ বলছো। ছোট শিশি পিছু কত টাকা আসবে বল তো?

আমি জানি নে বিপিনবাবু। আমার ওসব ভালো লাগে না আর।

পয়সা তো গুনে নিচ্ছো খগেন। গতকাল অফিসে বসে আছি। এমন সময় ফোন এলো। কাগজে টেলিফোন নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম—

কি?

ওসব তুমি বুঝবে না। যা করছো করে যাও। বিষে আমরা যখন নামবো—তখন কারোবারটি অন্যরকম হয়ে যাবে। সাপ পিছু অমাবস্যা পুর্ণিমেয় ছোট এক শিশি করে বিষ ঢালাতে পারবি নে? খুব পারবি। তোর হাতটিও পাকা। তা ফোনে সে ওষুধ কোম্পানির লোক বলে কি, কবে থেকে বিষ দিতে

পারবেন ? আমি বললাম, দাঁড়ান মশাই। আগে ওদের জন্যে পাকাপোক্ত জেলখানা বানাই।

জেলখানা ?

থাকবার ঘরবাড়ি লাগবে না খগেন ? আগে তারের জালের ঘর বানাই। তবে তো ? ফোনেই বললাম, অ্যাডভান্স চাই।

খগেনের মুখখানা ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে বিপিন বলেছিল, যাকে বলে আগাম। বিকেলের ভেতর তো সে-কোম্পানি নগদে দেড় হাজার টাকা দিয়ে গেল। তিন বছরের চুক্তি। আমাদের যা মাল হবে তার সবটাই ওরা নেবে।

যখন আর গরল হবে না? তখন ? তখন বুড়ো সাপ কি ছেড়ে দেবে জঙ্গলে ? তখন তো ধুঁকবে। নিজের আহার যোগাড়ের শক্তিও থাকবে না। তখন ?

ধুঁকবে কেন ? আমরা বাড়ি খাওয়াবো। ভালো ভালো ওষুধ দেবো। ব্যাঙের ছানা গ্রাসে-গ্রাসে এগিয়ে দেবো।

তার মানে ব্যাঙগুলোকেও ধরবে তো ?

হ্যাঁ।

আমি আর লুভী হতে পারবো না বিপিনবাবু।

রাগ করছিস কেন খগেন ? ও অবস্থায় বুড়ো বয়সের সাপকে কি কেউ জঙ্গলে ছাড়ে ? ছাড়বো কেন ?

তবে ?

ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ট্যাংরায় চালান দেব। তখনো মোটা পয়সা আসবে। বয়েস বাড়লেই তো পাকা চামড়া হয়। কি দামী চামড়া হবে তখন বল তো ? এক-একখান চাই কি বিশ-তিরিশ টাকাও দিতে পারে।

আমার জন্যে অন্য একটা পথ ছাখো বিপিনবাবু। আমি আর এসব পারবো না। আমার গায়ে এখনো বেশ জোর। তুমি আমায় মাটি কাটার কাজ দাও।

পাগলামি করিস নে খগেন। যা করছিস মাথা ঠাণ্ডা করে করে যা। পাকা বাড়ি বানা। পয়সা রাখতে হবে না সিন্দুকে? চাই কি বিশ-তিরিশ বিঘে ধানী জায়গা কিনতে পারবি।

আমি লুভী। আমি লুভী। একথা ভাবতে-ভাবতে আর সাত-পাঁচ মনে করতে-করতে খগেন কখন নিজের উঠোনে চলে এসেছে তা খেয়ালই করে নি।

হাজরা খেয়ে উঠে বাসনখানা নিয়ে ঘরের পেছনের ডোবায় যাচ্ছিল। আজকাল খগেনের পয়সায় সর্ষের তেল আসে। তাই রান্নায় খুব স্বাদ হয় এখন। হাজরা যেতে বললো, আজ খালে মাছ ধরা হবে।

পাঁচ

বজরা আজ দিন-দুই উধাও। শোনা যাচ্ছে, জংশন লাইনে রেল পুলিশ এক তারকাটাকে গুলি করে পেড়ে ফেলেছে। সে লোকটা মেজদা কিনা, ঘটিকে তা যাচাই করে দেখতে পাঠিয়েছে বেস্পতি। বলে দিয়েছে, খুব কাছে যাবি নে। বুদ্ধি করে দূর থেকে শুনবি। খবরদার, থানার পাঁচিলের ভেতর যাবি নে।

খালে মাছ ধরা হবে, মানে বাঁধ দিয়ে জলছেঁচা প্রায় সারা। এখন চুনোচানা, শাল, শোল, বাণ, পাঁকালের গুষ্টি ধরা পড়বে। বোয়ালও পড়তে পারে। খালটা খুব কম লম্বা নয়।

খেয়ে হাজরা চলে গেল। আগেভাগে নামতে পারলে বাড়ির জন্যে কিছু আনা যাবে। এসব ব্যাপারে বিপিনবাবুর খুব একটা নজর নেই। তার নজর, পাম্পের মুখে-মুখে নল বসাবার জায়গাটা বড় করে খুঁড়ে রাখায়। তাহলে সামনের সনে চাষের জন্যে দরকারী জলের সবটাই নলের নিচে গড়িয়ে আসবে।

বিকেল পড়তেই ঘুম থেকে উঠে বিপিন বসু দেখলো, লম্বা খালের যতদূর দেখা যায় বুকখানা খালি। জল ছেঁচে তার মেশিনের মুখ থেকে নালা কেটে বানানো বাঁধের ওপাশে জমানো হয়েছে। এবার পাঁক তুলে সংস্কার। দরকার মতো পাইপের মুখে খোঁড়াখুঁড়ি।

খগেনের দেখা দুপুরের সেই জোড়া মেঘ বাতাসের অভাবে দক্ষিণ মালঞ্চের ওপর এসে ঝুলে পড়লো। কাণ্ডটা প্রায় এলাহি। বিকেলের বরাদ্দ তাড়িটুকু খেয়ে বিপিন শুখো খালের বুকে তাকালো। তারপর নিজেকেই বললো, খাল, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছো?

খালের শুকনো বুকখানা তাকে বললো, আগে বাঁধা জলটা ছেড়ে দিন বিপিনবাবু। নইলে এতখানি ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমি মরে যাচ্ছি।

আগে মাছটা ধরুক ওরা। জায়গা খুঁড়ি। তারপর তো—

এতখানি ফাঁকা। আমি মরে যাচ্ছি।

আগে বলো খাল, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছো?

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা হইতে। আগে জলটা ছেড়ে দিন মাইরি। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আর দেখাচ্ছে কী খারাপ দেখুন।

এই সময় খগেন নস্কর গাঢ় বিকেলের ভেতর একা-একা মাঠ ভাঙছিল। আমি কত গোসাপ ধরে দিলাম।

প্রায় তিরিশ-চল্লিশ জন খালের নানা জায়গায় নেমেছে। কেউ পায়ের বুড়ো আঙুলে আন্দাজ পেয়ে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে জলে। আর অমনি মাছ উঠে আসছে। ঝুলন্ত মেঘের নিচে পড়তি বিকেলের খালধার এখন রকমারি আলোয় একদম আনকোরা খোলা জরদার কৌটো। গাছের মাথার ভেতর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় সব সূর্যরশ্মি। খালধারের দু-পাশে ঘন করে ঘাস। মাঝখানে এক চিলতে সুরকি রং রাস্তা। বিপিনের বানানো।

সেই বিপিন বসু আবার বললো, খাল তুমি কোথায় যাইবে?

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়।

বিপিন খালের খালি বুকে তাকিয়ে দেখলো, জনখাটুনে মানুষগুলোর ঘামে ভেজা পিঠে কত আলো পড়ে আছে। একখানা আপ ট্রেন দামাল স্পীডে গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে এলো। তখনই এই সারা ছবিটার জন্যে তার বুক ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। খালের ওপারেই ঝামার পাঁজায় একমারি আলো। তারই ওপাশে ট্রেনলাইন। আপ গাড়িখানা এবারে ছাড়লো। আমি কি জানতাম ভগবান, আমার জীবনে এসব ঘটবে? আস্ত একখানা খালের জল ছেঁচে ফেলা। ইচ্ছেমতো হাঁটতে হাঁটতে

পায়ের নিচে ঘন দূর্বাঘাসের স্পর্শ পাওয়া। শেষে এই মাটিরই আনাচেকানাচে বাসা বেঁধে থাকা গোসাপ, চাই কি একদিন বিষধরগুলো বিষে, চামড়ায় চালান হয়ে যাবে। যেতে-যেতে ওরা পয়সা দিয়ে যাবে। চারদিক তাকিয়ে বিপিনের বেশ ভরভরন্ত লাগলো।

দ্বারিকপোতার মাঠটি পেরোলে তবে খালের দরজায় পৌঁছানো যায়। তারপর এই খাল পেরিয়ে বিপিনের এলাকা। বিপিনের কেনা নয়। সে এ-এলাকায় কাজ করে। কাজ মানে, খাল কাটানো, গাছ বসানো—এইসব আর কি। খালটাকে পেছনে ফেলে খগেন যখন বাঁধের ওপর উঠলে, তখন দূরে পিচরাস্তা থেকে একখানা সাইকেল রিকশা বাঁক নিয়ে খালপাড়ে উঠলো। বিপিনের কাছে কেউ আসছে।

খগেনকে দেখে বিপিন গমগম করে এগিয়ে যেতে লাগলো। ঝকঝকে সবুজ ঘাসে আরও ঝকঝকে পাস্পশু, কালো রংয়ের। এসো এসো খগেন। আজ দুটি মাছ নিয়ে যাবে বাড়ির জন্যে।

আমার দরকার নেই। ওই তো হাজরা নিয়ে যাবে।

শরীর ভালো নেই নাকি?

না। শরীর তো ঠিক আছে বিপিনবাবু। আমার তো কিছুই হয় নাই।

দুপুরে কটা পড়লো?

গোসাপ? নাঃ! একটাও পড়ে নাই।

তাহলে একটু মুখ পালটাও।

হ্যাঁ। ইদিককার গোসাপ সব সাবাড় করে দিলাম। বলতে বলতে হু হু কেঁদে উঠলো খগেন। আমি আর এ-কাজ পারবো না বিপিনবাবু। ওরা তো আমার কিছু করে নাই। আমি ওদের সাবাড় করি কেন?

তুমি তো আর নিজের হাতে করছো না। চোখ মোছো। কত

লোক কাজ পাচ্ছে বল তো? কত লোকের অন্ন হচ্ছে। একটু থেমে থেকে বিপিন বললো, বেশ তো। অনেক গোসাপ তো ধরলে। এবারে একটু মুখ পালটাও। সারা বছরে কত লোককে বিষধরে কাটছে। এবার ওদের ধরে ফ্যালো। তাহলে মানুষের জন্যে একটা কাজ হয় খগেন।

বিপিন আসলে ভাইয়ে-ভাইয়ে খগেনকে তার নিজের পথে আনছিলো।

খগেন চোখ মুছে বললো, বিষধরদের না খোঁচালে ওরা কিছু বলবে না।

হ্যাঁ! তোমায় বলেছে খগেন।

আমি ওদের চিনি বিপিনবাবু। দেখুন না, আজই এক চন্দ্র-বোড়ার সঙ্গে দেখা হলো।

ধরলে?

না। চাঁদবুড়ো তখন মরে বসে আছে। যা বেজি আর বিষ পিঁপড়ের উৎপাত এ-দেশে।

চামড়াখানা কেমন ছিল?

রীতিমতো পাকা চামড়া। তা বয়স হয়েছিলো চাঁদবুড়োর।

ছাড়িয়ে রেখেছো?

অত সুন্দর প্রাণীটা। জ্যাতা থাকলে তবু কথা ছিল। যুদ্ধ করে কাবু করলে হয়তো কোতল করা যায়। কিন্তু চাঁদবুড়ো যে তখন চোখ খোলা রেখে মরে পড়ে আছে। ঝামার পাঁজায় বেকায়দায় ঢুকে পড়ে এই কাণ্ড। তা বেজিগুলান বুড়ারে বেকায়দায় ফেলে লেজখানা কামড়ে-কামড়ে থ্যাতামাথা করে দিলো। হয়তো কাল রাতভোর এই কাণ্ড গেছে। ভোরের দিকে অমন সুন্দর প্রাণীটা মরে পড়ে থাকলো। একদম চোখ চেয়ে। আমার সঙ্গে দেখা ভরতপুরে।

কথা আরও এগোতো। কিন্তু এই সময় রিকশাখানা ঝনঝন করে একদম কাছে চলে এসেছে।

ও বড়দা। আম কিন্তু এসে গেলাম।

রিকশায় বসে একটি মেয়েছেলে হাসছে। কাঁধে ব্যাগ। গোল করে সিঁদুরের টিপ। কয়েক গুছি চুল বাঁ-কানের ওপর ঝুলে পড়েছে। রিকশা থেকে নামতে-নামতে মেয়েছেলেটি বললো, কত ভাড়া?

বিপিন বলে উঠলো, ষাট পয়সা দাও শিবানী।

নিচে যারা খালে গোড়ালি জলে পাঁক ঘেঁটে-ঘেঁটে মাছ ধরছিল, তারা কেউ-কেউ উঠে দাঁড়িয়ে তাকালো। বাবুর আত্মীয়স্বজন এ-রকম প্রায়ই আসে। তখন বেশি করে বাজার হয়। তিন চারখানা রিকশা সাইকেল ভাড়া করে সারা দক্ষিণ মালঞ্চে ঘোরাঘুরি। বাড়ির পুকুরে মাছ না পেলে বাজারের বড় মাছটি। বাবু আর বাবুর গিন্নী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে খালপাড়ে দাঁড়ানো রিকশা থেকে আত্মীয়স্বজনকে ঘরে তুলে নিয়ে যায় হাত ধরে। ব্যাগটা, বোঝাটা বাবু নিজের হাতে নেয় তখন।

খগেন, যাও তো। বাড়িতে খবর দাও। বাবুর ভায়ের বউ এয়েছে।

বিপিনের কথায় খগেন ছুটে গেল বাড়িতে। যেতে-যেতে সে ফিরে তাকাচ্ছিল। এ-রিকশাখানা তার যে খুব চেনা। সওয়ারী মেয়েছেলেটিকেও সে বেশ অনেকটা চেনে যেন। কিন্তু মনের ভেতর গুছিয়ে ভেবে উঠতে পারলো না খগেন।

সিদ্ধেশ্বরী বেরিয়ে এলো। এই যে শিবু। আয়! ঠাকুরপো এলো না?

শিবানী চুপ করে বোগেনভেলিয়ার ঝাড়ে তাকালো। কালচে লাল কাগুজে ফুলগুলো বিকেলের আকাশে বাতাস পেয়ে ঠেলে উঠেছে। আসলে এক-একটা ফুল আকাশে এক-একখানা ছুরি। এ-রকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে শিবানী সামনের ঢাকা বারান্দায় উঠছিলো। এখানে, সে জানে, তার ভাসুর বিপিন বসু লোক-

লস্কর নিয়ে জমিয়ে তাড়ি খায়। উঠবার মুখে সিঁড়িতে খগেনের মুখোমুখি। চোখ তুলে ব্যাগটা খগেনের হাতে দিল শিবানী। খগেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে শাড়ি-কাপড়, চিরুনি ঠাসা ব্যাগটা হাতে নিল।

ওখানে কি হচ্ছে? আঙুল দিয়ে খালটা দেখালো শিবানী।

জলছেঁচা হচ্ছে।

অত লোক?

মাছ ধরা হবে, বলে খগেন হেসে ফেললো।

শিবানীর পেছন-পেছন বিপিন। কি মাছ খাবে আজ শিবু?

শিবানী সে-কথার কোন জবাব দিতে পারলো না। কারণ সে আগেই খগেনকে বলতে শুরু করে দিয়েছিল, মৌরলা পড়লে দিয়ে যেয়ো তো।

ঠিক সেই মুহূর্তে খগেনের মাথার ভেতর কড়কড় করে বাজ পড়লো। এই বাজ আরেকবার পড়েছিল তার মাথায়। ইছাপুর শ্মশানে। দাড়িবাবা বলেছিল, যা বাবা! মড়ার মুখের শাড়িটা সরিয়ে দে একটু। এমন সুন্দর আকাশ। তাবার আলো পড়ুক চোখে।

নিশুতি রাত। অন্ধকার গঙ্গার জলছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস। নিভু-নিভু একখানা মোটে চিতা। শ্মশানবন্ধুরা সবাই কেটে পড়েছে। খগেন গিয়ে ভুরে শাড়ির আঁচলখানা মুখ থেকে সরাতেই ডোমনীর সে কি গালভরা হাসি। মেলায় বিক্রির হাসিখুশি আহ্লাদী পুতুল একদম। ডোমনীর মুখের ভেতর থেকে তখন ভুগ্‌ভুগ্‌ করে হাসি বেরিয়ে আসছিল একদম।

কানের পাশে চুলে ঢাকা একটা বগ থাকে। সেখান থেকে ঝিলিক তুলে বাজটা পড়েছিল মাথার ভেতর। কড়কড়কড়াৎ করে!

বাবা ডেকে বলেছিল, আয়। কাছে আয় বাপ! ব-পুষ্পের একটা তেলক কেটে দি তোর কপালে।

এই মুহূর্তে খগেনের মাথার ভেতরে বাবুর ভায়ের বলয়ের চোখ তুলে তাকানো, সিঁদুর টিপ মাঝামাঝি জায়গায় ফিকে হয়ে যাওয়া, বাঁ কানের ওপর চুলের লম্বা গুছির এলিয়ে পড়া—সবই ছাপ ফেলেছিল। আর অমনি সে চিনতে পারলো। তাই দৌড়ে আগে রিকশাওয়ালাকে ধরতে গেল। এ-রিকশাওয়ালা তার চেনা। ভীষণ চেনা।

বিপিনবাবু খালধারের দু-পারে ছায়াধরা গাছ বসিয়েছে। হলদেগুঁড়োর ফুল ধরেছে তাতে এখন। লাল সুরকি রাস্তাটায় ভোর-ভোর ছড়িয়ে পড়ে থাকে। বাতাসের সঙ্গে ওড়ে। লাল ধুলোর ঘুল্লির সঙ্গে-সঙ্গে।

এই সাইকেল রিকশাখানা করেই ভগবান এসেছিল সেদিন রাত্রে।

খগেন খালপাড়ে উঠে দেখলো, রিকশাওয়ালা জোরে চালিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বেশ দূরে চলে গেছে। সুরকি রাস্তার দু-ধারে বিপিনবাবুর বসানো গাছের নেমে আসা ডালপালা।

নিচু হয়ে হাজরা পাঁক ঘাঁটতে-ঘাঁটতে ওপরে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ও বাবা। তুই অমন ছুটছিস কেন ?

খগেন থমকে থামলো।

হাজরার কী একটা জানার ছিল। জলে দাঁড়িয়েই বললো, আজ পূর্ণিমে ?

ছুটতে-ছুটতেই খগেন বললো, পূর্ণিমে-অমাবস্যা ভদ্দরলোকরা খেয়াল রাখে। বিপিনবাবুকে বল।

হাজরা অবাক হয়ে ছুটন্ত বাবাকে দেখতে লাগলো।

খগেন দৌড়ে-দৌড়ে যখন প্রায় রিকশাওয়ালাকে ধরে ফেলেছে, পাঁচ রাস্তার জংশনে, দুটো বকুলগাছের মাঝামাঝি রিকশাখানা উবে গেল। একদম চোখের সামনে।

সন্ধ্যে এখনো নামে নি। পরিষ্কার আলো। হাওয়ায় মিশে গেল রিকশাখানা। কোন্‌দিকে যেতে পারে ? একদম বেকুব

বনে দাঁড়িয়ে পড়লো খগেন। কাছাকাছি কেউ নেই। সে নিজেকেই শুনিয়ে খুব আস্তে বললো, মাইতি বউদিদি তোমায় আমি চিনিছি।

দিনের আলো থাকতে-থাকতেই দক্ষিণ মালঞ্চে চাঁদের আলো এসে পৌঁছলো। হাজরা যা জানতে চাইছিল, সেই পূর্ণিমাই বোধ হয় আজ। খালের জল যত কমছে—মেশিন থেকে ওথলানো জলগুলো ততই ধানক্ষেতে গিয়ে পড়ছিল। পাঁক মাটি মেশানো জল। বেশি ফসলের বোরো ধান বেশ বলকারী হয়ে উঠবে। ধানক্ষেত ঘুরে সেই জল আবার খালের একদিককার বাঁধ দেওয়া ঘেরে গিয়ে পড়ছে। জল নষ্ট করার উপায় নেই। সামনে এখনো তিন মাস-ধরে ক্ষেতে জল দিতে হবে। মেশিনের নলের গোড়ায় বেশি করে গর্ত করার পর আবার বাঁধ খুলে জল ছাড়ার কথা। মতলবটা এইরকম: আগে খালের মাছগুলো ধরে ফেলো। সেইসঙ্গে সামনের চাষের সুবিধের জন্য মেশিনের নলের মুখটায় গর্ত করে জল মারাব ফাঁদ সেরে রাখতে হবে। জমা জল ধানক্ষেত ঘুরিয়ে খালেরই আরেক ধারের ঘেরে জমিয়ে রাখো। তারপর সব কাজ হয়ে গেলে বাঁধ ভেঙে খাল আবার জলের খাল করে দাও। এ সবই সম্ভব হচ্ছে দশ ঘোড়ার ইলেকট্রিক পাম্প আছে বলেই। তোড়ে মোটা করে জল টেনে খালের যে-কোন দিক এ-মেশিন শুকিয়ে দিতে পারে। কোম্পানির খালপাড়টাই এর মাঝখানের আড়াল। সেটাই চলাচলতির রাস্তা। তাতে বিপিন বসুর বসানো গাছের ছায়া। সুরকির পথ। আর জলের কিনারে-কিনারে বড়-ভাইদের বাসাবসতি। বাবলার ঝাড়। শেয়াকুলের হলদে ফুল। বুনো ডুমুর গাছ। খালের এ-পারে বিপিনবাবুর বাড়ি। ও-পারে পোড়ো ইটখোলার বাতিল গর্ত, ঝামার পাঁজা, বেজিদের আনা-গোনা। এসব পেরোলেই রেললাইন। আপ গাড়ি। ডাউন গাড়ি। নিশুতি রাতে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের রক্তচক্ষু। এর ভেতরেই ভগবানের নিজের রিকশা সাইকেলখানা এসেছিল।

খগেনের বড় আপসোস—একটুর জন্মে উবে গেল। যাবারই কথা। ভগবান কখনো সহজে ধরা দেন না। নানা ছল্লি-বল্লির লেকা ভগবান। কখনো বাঁশি বাজায়। কখনো টোপর পরে মাথায়। মাইতি বউদিদি। তুমি এতকাল পরেও একইরকম আছো। আমি তোমায় চিনিছি। আমার এই লুভী হাত এখন ভগবানের প্রাণীদের খপ্ করে ধরে। আমার হাতে আজও দুপুরে তাগা ছিল। তাগায় ছিল শিবলিঙ্গ ফল। কাল সকালেই কাক-শকুনে মরা চাঁদবুড়োর খবর পেয়ে যাবে।

জ্যোৎস্না তখনো পুরো পাপড়ি মেলে নি। তবে চাঁদ এসে গেছে আকাশে। লালচে কুসুম ফোটানো হলুদবর্ণ চাঁদ। দক্ষিণ মালঞ্চ স্টেশনে ঘণ্টাঘরেও এত বড় ঘণ্টা নেই। গোল আর ঢাউস। ভগবান নিজি হাতুড়ি পেটায় বলে এমন শব্দ করে আলো জ্যোৎস্না হয়ে চলে আসে এতটা পথ। মিঠে বাতাসে তিরিশ-চল্লিশ জন মানুষ উবু হয়ে খাল ঘাঁটছে। পায়ে মাছ পড়লে হাত ডুবিয়ে ধরা—তারপর মুঠো করে ধরে কোঁচড়ে গোঁজা। এই হলো গিয়ে কাজ।

দক্ষিণ মালঞ্চেরই লোকজন সব। কিন্তু এখন ওদের কাউকে চেনার উপায় নেই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এই নিকাশী খালের সঙ্গে সেই ধোসারহাটে একটা নোনা নদীর গাঁটছড়া আছে। সেখান থেকেই গোনে গোনে নদীর চিংড়ি চানা, ভেটকি দানা ডিমের দশায়-দশায় ভেসে আসে। আসে ট্যাংরা, ভাঙন। আর আশপাশের ভাসা মাছও পড়ে। সেইসঙ্গে আছে বোয়াল, বাণ, শোল, শাল।

কাদামাখা হাজরা উঠে এসে বললো, দৌড়ে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছিলি বাপ?

কি মাছ পেলি?

ক'টা ধান্সে পুঁটি। এই অ্যাত্ বড়ো।

মৌরলা পড়ে নি ?

জল শুকোলে সব ধরা পড়বে। অবিশ্যি আটলে গিয়েও ধরা পড়বে।

কোথায় পাতলি ?

মেশিনের টানা জলের ঘুল্লির মুখে।

বেশ। বুদ্ধি আছে তোর হাজরা।

বাপের মুখে প্রায় দশ বছর পরে নিজের প্রশংসা শুনে খুশি মেজাজে হাজরা গিয়ে আবার খালে নামলো। সে জানে, দশ ঘোড়ার মেশিন তোড়ে জল টানে। সেখানে জলে একটা ঘূর্ণি হয়। মাছ টান খেয়ে ওলোট-পালোট হয়ে যায় ওখানটায়। সেখানেই সে বেশ সাইজ করে আটল বসিয়েছে।

খালের ওপারেই আতাবাগানে সাধারণ গাছপালা পুরো জ্যোৎস্নায় অন্য রকম হয়ে আছে। ঝামার পাঁজায় আলো পড়ে ঝকমক করছে। বিপিনবাবুর বাড়ির পুকুরের বুকে একখানা ইলেকট্রি আলো জ্বলে সারারাত। ধানক্ষেতের পোকা উড়ে গিয়ে সে আলোর চারদিক ঘুরবে সারারাত। তারপর এক সময় টুপ করে পুকুরে পড়বে। তখন কাতলা কিংবা মৃগেলের আহার। আজ কিন্তু সে আলোটাও কাজে আসছে না কেন। ধানক্ষেতের পোকা তাড়িয়ে নিয়ে মাছের আহারে লাগানোর বাতিকলটাও আজ জ্যোৎস্নার আলোয় হারিয়ে যাচ্ছে। খালের ভেতর আলো পড়ে জায়গাটা এখন কোন শুকনো নদীর খাত। কালো রঙের। তাতে মাছ ধরা পড়ছে। আর আনন্দের কথাবার্তা। একটা বড় পাঁকাল কার হাত গলে ফসকে গেল। যাবি কোথায় বাছাধন? এই ধরলাম তোকে! এরকম আরও অনেক ফুর্তির শাপশাপান্ত খালের বুক থেকে ওপারের আকাশে উঠে আসছিল। এখন ক'দিন অভাবী মানুষজনের বাড়িতে মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল চলবে। ফুরিয়ে গেলে সবাই এসব মাছের কথা ভুলে যাবে। ততদিনে নতুন

মাছের ডিম পোনা জলে ভাসতে-ভাসতে খোসায়হাট থেকে দক্ষিণ মালঞ্চের দিকে রওনা দেবে। ঝাল-ঝোলের স্মৃতিসম্বল দক্ষিণ মালঞ্চ তখন নতুন কোথাও খাবারের খোঁজে নেমে পড়েছে। পুকুরের শালুক, নয় তো ঢ্যাবের ভেতরকার নালসে মতো বিচি। সূর্যের নিচে এই পৃথিবীতে খগেন লক্ষ্য করে দেখেছে—শুধু দুটো আহারের জন্যেই এত কাণ্ড। সে সকল জীবেরই। ভালো আহার হতে হাত-পা ছড়িয়ে খানিক ঘুমোনো। মাটি সারাদিন ধরে গরম হয়। সন্ধ্যেবেলা আতাবাগানে খসখসে পাতাগুলোও গরম ছাড়ে। গর্তের ভেতরেও ভাপ ওঠে। তখন কালাচ, হাসা কেউটে, চাঁদবুড়ো —সবাই বাতাস খেতে বেরিয়ে পড়ে। পথ ভাঙার সময় ওদের ফণা ভালো বাতাসে অল্প-অল্প দোলে। এরকম দুলতে-দুলতেই আহারের সন্ধান। এত্তেলা—

বিপিন বসু তার লাল বারন্দায় একা-একা বসে তাড়ির ঝাঁপটা খুললো। শিবু আর সিধু এখন ভেতরে। খগেনকে বিপিন দেখতে পায় নি। খগেন অন্ধকারে বাড়িটার ছায়ার ভেতর ভাঙা আলে বসেছিল।

আজ বিকেলের গোলমালের ভেতর তেমন করে খাওয়া হয় নি বিপিনের। পর পর দু' গ্রাস শরীরের ভেতরে পাঠিয়ে বিপিন চারদিকে তাকালো। এখনো পৃথিবীর মাটিতে ভগবানের অনেক দান। গাছের ছায়ায় হলুদ লাগাও। আদা বসাও। রোদ দেখে ধান। সর্ষের টান বুঝতে পারলে আগাম তিল চাষে নেমে পড়ো। খালে নানান ধারার মাছ। তারপর আছে হাবা টাইপের উইখোর গোসাপ। বিষধর সাপগুলো তো পড়েই আছে। এমন অবস্থায় কে আর অফিসে যায়। ক্যাজুয়াল লিভ পনেরো দিন। মেডিকেল বছরে আঠারো দিন। তারপর ত্রিশ দিনের প্রিভিলেজ লিভ। ঈদ মহরম দুর্গাপুজোর ছুটিছাটা দশ দিন। এই নানা রকম ছুটিছাটার ফাঁকে-ফোকরে সে মাঝে-মাঝে অফিসে চেহারা দেখাতে উদয় হয়।

এই করেই ঠেকা দিয়ে অফিসে চলে যায়। চাষবাসে, রাস্তা তৈরিতে আচমকা টাকার দরকার পড়লে যে অফিস মাইনে থেকে আগাম দেয়—তার সঙ্গে তো বেআইনি করা যায় না। সে এখন সিধুকে এই খোলামেলা নেড়া মাঠে—কিংবা বর্ষার সময় ভরা সবুজের ভেতর দেবী-দেবী ভাবে। যেদিন অবশ্য সাইনাসের চোটে মাথার যন্ত্রণায় সিদ্ধেশ্বরী সারাদিন শুয়ে থাকে—সেদিন তাকে কোন কাত করে শোয়ান মূর্তি বলেই ভেবে নেয় বিপিন।

কে ওখানে ?

আমি গো বিপিনবাবু।

ওখানে কেন ? ওপরে উঠে এসো খগেন।

নাঃ! বেশ আছি। আজ পূর্ণিমে ?

হ্যাঁ। চাঁদ হাসছে। তাই না ?

ফি পূ্ণমেয় অমন হয়।

বিপিন নিজে এক গ্লাস ঢেলে নিয়ে বারান্দার নিচে বাড়ির বেঢপ ছায়াটার অন্ধকারে বসা খগেনের কাছে গেল। নাও—

না। তুমি খাও।

আমার ওপর রাগ করেছো ?

কারও ওপর রাগ নেই আমার। থাকলে তো [illegible] যেতাম। রাগের জন্য চাই ইচ্ছে। আমার যে কোন ইচ্ছেই নেই বিপিনবাবু।

তাহলে তুমি এ-কাজ ছাড়ার ইচ্ছে জানাচ্ছো কেন ?

এর সঙ্গে খুন আছে বিপিনবাবু। খতমে আমার মন নেই।

আমারও তো কোন জিনিসে ইচ্ছে নেই। তবু বাঁচতে হয় আমারও। তাই কাজ বানাই। খাল সংস্কার করি। ধান লাগাই। নয় তো সত্যি আমার কোন ইচ্ছে নেই। তেমন-তেমন জোরালো ইচ্ছে থাকলে তো খগেন আত্মঘাতীও হ[illegible] পারতাম। সে ইচ্ছেই বা পাই কোথায় ?

তবু আমি খতমের কাজ পারি নে বিপিনবাবু।

সর্বক্ষণ তো কত রকমের খতম করো খগেন। সেই বেলায় ?

যেমন ?

ধান গাছের অন্ন ? আহার রান্নার কাঠ ? সে তো কোন গাছেরই গা ? হাঁটতে গিয়ে পোকা মাড়িয়ে মারছো না ? এত সাধু হওয়ার শখ কেন ? তাহলে সংসারী হয়েছিলে কেন ?

আমি তো সংসারী নই বিপিনবাবু।

ও! তিন-তিনটে ছেলে বাতাসে হয়ে গেল !

ও তুমি বয়সকালের ভুল বলতে পারো।

এরকম আরও না হয় দু-চারটে ভুল করলেই—

ঠিক এই সময় বাড়ির পেছন দিককার বারান্দার আলো জ্বলে উঠলো। সেই টানা বারান্দার সামনেই বাড়ির পুকুর। পেয়ারা গাছ। কলমের নারকেল। ল্যাংড়া আম। সব। আলোর সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরীর গলা। আমি কিন্তু শিবানীকে গরম-গরম ঘি-ভাত দিচ্ছি। পারলে দুটো মৌরলা চাও না খাল থেকে। খেতে চাইলো শিবু তখন—

না, না, বড়দি। কোন দরকার নেই। আমার কিন্তুক বড্ড লজ্জা করছে।

বিপিন সঙ্গে সঙ্গে খগেনকে বললো, ছাখো না। কেউ যদি পেয়ে থাকে।

মৌরলা তো হাতে ধরা পড়বে না। এক যদি আটলে পড়ে থাকে। দেখছি—বলে খগেন উঠলো। জল অব্দি এই সামান্য পথটুকু যেতে তার মাথা ঘুরে গেল। একদম চেনা গলা। এই গলাতেই তো সুমতি রোয়া করার সময় রাখালের মাথায় ডেকচি বোঝাই ভাত নিয়ে এসে খগেনদের ডাকতো। এলে ? এসে খেয়ে গেলে ? মেঘ আসছে কিন্তু একখানা। আবার ঝমঝম বৃষ্টি নেমে যাবে।

খালপাড়, খালের বুক—এখন আর তত অন্ধকার নয়। ওপর

থেকে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ মালঞ্চের অনেককেই এখন দেখা যাচ্ছে। সুন্দর আলোর সঙ্গে সারাদিন ধরে গরমের পর সুন্দর বাতাস। খগেন পাম্প মেশিনের গা ধরে পাতা আটলের কাছাকাছি নেমে গেল।

তখন সিদ্ধেশ্বরী ভাত বেড়ে দিয়ে শিবানীকে বলছিল, ঘরে বসলে পারতিস শিবু।

না দিদি। এই বেশ খোলামেলায় ভালো। যতদূর দেখা যায় শুধু চাঁদের আলো। এত ঠাণ্ডা বাতাস। কলকাতায় পাতাল রেল গর্ত খুঁড়ে-খুড়ে তোমার ঠাকুরপোর ফ্ল্যাটের সামনেটা একদম পাহাড়ের খাদ বানিয়ে বসে আছে। এই বড়-বড় ক্রেনের মাথা। ধুলো। বিকট আওয়াজ, তারপর লোডশেডিং।

এখানেও লোডশেডিং হয় শিবু?

হলো। কিন্তু বাতাস তো আছে।

বাতাসও বন্ধ হয়ে যায় অনেক সময়।

তাকিয়ে থাকবার মাঠ তো আছে দিদি। ওখানে তো চোখের সামনে বাড়ির পর বাড়ি।

ভালো লাগলেই ভালো। বলে সিদ্ধেশ্বরী আবার গলা তুলল, মৌরলা মাছ ধরে থাকলে দিয়ে যেতে বলো। আমি ভেজে দিই অন্তত ক'টা।

বিপিনের হাতে শেষ গ্রাসটা। সে সুস্থির থাকার চেষ্টায় গুলিয়ে ফেললো সব। ভীষণ কাঁপা গলায় বললো, লোক তো পাঠিয়েছি। ধরলে কেউ দিয়ে যাবে নিশ্চয়।

এমন কাঁপা গলা সাধারণত প্রাথমিক মাতালদেরই হয়। সে-গলা শুনে শিবানী আর সিদ্ধেশ্বরী একই সঙ্গে হেসে উঠলো। শিবানী হাসি থামিয়ে চেঁচিয়ে বললো, কি হচ্ছে বড়দা?

সিদ্ধেশ্বরী আস্তে বললো, ঠাকুরপো আজকাল খুব বেশি খাচ্ছে?

শিবানী গলা খাটো করে জবাব দিল, কোন মাত্রা নেই। একদম বেহেড হয়ে যায়। এলোপাথাড়ি তর্ক করে।

এরকম তো ছিল না স্নুদেব। বিয়ের আগে তো কোনদিন মদ খেতো না।

আমি তো আর শেখাই নি দিদি। এখন কোথাও মদের গন্ধ পেলেই হলো। অমনি ছোঁক-ছোঁক করতে-করতে গিয়ে হাজির হবে।

তুই না হয় সন্ধ্যেবেলা সেজেগুজে সঙ্গ দিলে পারিস।

আমার সঙ্গ নিয়ে তার না জানি কত মাথাব্যথা!

দুপুরে ভালো করে ঘুমিয়ে একখানা পাটভাঙা শাড়ি পরবি। একটা ডীপ রঙের ব্লাউজ। না হয় একটু সেন্ট মাখলি। একটা গান গাইলি। গান তো জানতিস শিবু।

সব করে দেখেছি দিদি। ভবি ভোলবার নয়। সন্ধ্যে হলেই চুকচুক। সেইসঙ্গে আবার ঘুমের বড়ি। তিনটে চারটে করে এক-একদিন। রাতে কাউকে চিনতে পারে না।

স্নুদেব তো মরে যাবে।

যাবেই তো। হার্ট উইক হয়ে যাচ্ছে।

আমি বলি কি শিবু—তুই বাচ্চাটাকে হোস্টেল থেকে এনে বাড়িতে রাখ। তাহলে সংসারে টান হবে স্নুদেব ঠাকুরপোর।

এক একদিন রাতে ভাবি, বিষ খাবো।

ছিঃ, শিবু। ওসব কথা মনেও আনবে না।

আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না দিদি। তোমাদের সে ঠাকুরপো আর নেই কিন্তু। নেশার ভেতর জাগিয়ে তুলেছি অনেক রাতে। বলেছি—খেয়ে নাও। এই তোমার ভাত। তখন বলে কি জানো—আমার আর ইচ্ছে নেই। কোন ইচ্ছে নেই। আমি অবাক্ হতে চাই—অবাক্ হতে পারি না আর। এই অব্দি বলে সে কি কান্না। থামানো যায় না বড়ো মানুষটাকে।

কোথাও বেড়িয়ে আয় তোরা।

তাও গেছি বড়দি। সেখানেও ওই এক কাণ্ড।

যেখানে মদ নেই, সেখানে যা।

গিয়েছি। মদ নেই তো কি? মহুয়া আছে তো। ডাক্তারখানা আছে তো। সেখান থেকে আমাকে লুকিয়ে রিকশাওয়ালাকে দিয়ে ঘুমের বড়ি যোগাড় করেছে।

এরকম কেন হলো বল তো শিবু? অন্য কোন মেয়ে?'

না, না। ওসব কিছু নেই। আসলে ওর কাছে নাকি এই পৃথিবীটাই বাসি আটার রুটি। এখানে ওর আর কোন ইচ্ছেই নেই।

এজন্যে তুই দায়ী শিবানী।

একথা বলছো কেন দিদি?

বিয়ের এক বছরের মাথায় দেখেছি—তুই স্রেফ শায়া পরে ধুপধাপ কাপড় কাচছিস। ব্রেসিয়ার পরা ছেড়ে দিয়েছিস। এটা ঠিক করিস নি কিন্তু। হাজার হোক ওরা পুরুষের জাত—

পুরুষের জাত না ছাই! আসলে স্বার্থপরের জাত। আগুন লেগে বিয়ের ন-মাসের ভেতর আমার পেট, পিঠ পুড়ে গেল। আমি সব সময় সব জামাকাপড় গায়ে রাখতে পারি নে। পোড়া জায়গায় চুলকোয়। আর অমনি আমার স্বামীর বিস্ময় কমে যাবে? ইচ্ছে নষ্ট হয়ে যাবে? ভালবাসা থাক হয়ে যাবে। তাই বলে পিপে-পিপে মদ গিলতে হবে?

তোকে নিয়ে শোয়?

শোবে না কেন? কিন্তু শুয়েই নাক ডাকতে থাকে।

ডাক্তার ছাখ্যা। হয়তো পলিপাস হয়েছে নাকে। হোমোপ্যাথি কর। সাইনাস থেকে অমন হয়। আমি জানি। আমি নিজেই তো সাইনাসের রুগী। তোর দাদা আমার অবস্থা দেখে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ওষুধ নিয়ে এলো। তিন মাসের ভেতর সেরে উঠলাম। আমার আর নাক ডাকে না এখন। চিত হয়ে শোয়?

হ্যাঁ।

কাত করে দিবি। আর রাতে বেশি খেতে দিবি নে। বেশি খেলেই ঘুমিয়ে পড়ে পুরুষমানুষ।

রাতে তো কিছু খায়ই না। খাবার শক্তি থাকলে তো!

দুপুরে নিশ্চয় খুব পেট ভরে খায়।

তা খায় দিদি।

দিবি না খেতে। সব কম করে দিবি। তাহলে খিদের চোটে জেগে থাকবে। তুই নিজে আগে বিছানায় এসে পেছন ফিরে শুয়ে থাকবি—আলো জ্বেলে। তাহলে তোকে দেখে ঠাকুরপোর আদর করার ইচ্ছে হবে। আর অমনি দেখবি—জীবনে সব ইচ্ছে ওর ফিরে আসছে। ওকি? ভাত মাখলি নে কেন?

তোমাদের মৌরলা আর এসেছে!

এবার সিদ্ধেশ্বরী রীতিমতো ঝাঁকিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বিপিন এক দৌড়ে খালপাড়।

খগেন তখন খালের জলের কিনারে অন্ধকারে আইলে হাত গালয়েছে। কুচে কইয়ের পিঠের কাঁটা হাতে লাগলো। বড় বড় ধান্তে পুঁটির লাফালাফি।

খালপাড় থেকে বিপিন বললো, কিছু পেলে?

কোন জবাব পেলো না বিপিন। আটলে মাছ ঢুকতে পারে। বেরোতে পারে না। জলের তোড় উলটো দিকে। তা ছাড়া বেরোবার পথে বাঁশের চোঁচ। গায়ে ফুটে যাবে। খগেন সাবধানে হাত গলিয়ে দেখছিল।

বিপিন আবার ডাকলো, কোথায় গেলি খগেন?

ঠিক এই সময়ে খগেনের হাতে ধরা পড়েও একটা মোটা মতো পাঁকাল মাছ পিছলে গেল। পাঁকাল তো এতটা লম্বা হয় না। যতবারই হাত গলায় ততবারই পাঁকালটা সটকে-সটকে স্লিপ খায়। বিপিন আবার ডাকতেই খগেন কী বুঝে যেন চাপা গলায় বললো, এখানে আছি। চেঁচাচ্ছো কেন?

মৌরল্লা ?

খগেন আর কথা বলতে পারলো না। সে পাঁকালটার গায়ে হাত লাগিয়ে দেখছিল—মাথাটা কোন্ দিকে। পাঁকালটাও সরে সরে গিয়ে বুঝতে দিতে চাইছিল না খগেনকে। খগেন কায়দামত খপ করে ধরলো। তবে রে! শেষে মাছ খেতে আটলে সেধোনো ?

আটলের বাইরে হাত আনতেই মেছো কেউটেটা লেজে খগেনের হাতখানা জড়াতে গেল। চাঁদের আলোয় বিপিন দেখলো, শান্তশিষ্ট খগেন খালপাড়ে উঠে আসছে মোষের ধাতে। নাক দিয়ে ফোঁসানো বাতাস অব্দি দেখা যায়। ভয় পেয়ে বিপিন সরে গেল।

খালপাড়ে উঠেই খগেন দুটো গাল দিল হাতের জিনিসটাকে। তারপর মাথাটা মুঠোর ভেতর চেপে ধরে শূন্যে তিনটে ঝাঁকুনি দিল। অমনি কালো মোটা সুতোটা খগেনের হাতে ন্যালবাল করে ঝুলতে লাগলো।

বিপিন বুঝলো, এই হলো গিয়ে বিষধর পাকড়ানোর কায়দা। সে মনে-মনে খুশিই হলো। খগেন তো ধরা ভোলে নি। বরং রীতিমতো রপ্ত। মুখে বললো, চল। আমার ভাইয়ের বউকে দেখাবি।

খেতে চাইলো মৌরল্লা। নিয়ে যাবো মেছো কেউটে !

তাতে কি। কোনদিন তো এরকম দেখে নি। কামড়াবে না তো ?

পাগল হয়েছো বিপিনবাবু! আমি আছি নে সামনে। মাথা তুললিই আরেক ঝাঁকুনি।

খগেন হাসছিল। পা এখন তার ভারি। লম্বা কালো সুতোটা হাতে বাড়ির পেছন দিককার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো খগেন—বিপিনবাবুর পেছন-পেছন।

ঝিলিক ফোটা জ্যোৎস্নায় দুই জা বসে-বসে কথাই বলছিল

বেশি। শিবানীর ভাঙা ভাত পড়েই ছিল। একটা জিনিস ছাখো শিবানী—

কি ?

খগেন। এসো তো সামনে।

খগেন এগিয়ে এসে হো-হো করে হেসে উঠে হাতের কালো সুতোটা শিবানীর ভাতের থালার পাশে ঠাণ্ডা মেঝেয় বিছিয়ে দিল। আর শিবানী অমনি চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়ালো। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও বলছি। উঃ! কী আঁষটে গন্ধ বাবা—

খগেন হেসে হেসেই বললো, আঁষটে গন্ধ তো হবেই। মাছ খায় যে।

জ্যান্ত ?

ওই তো মাথা তুলছে একটু-একটু—বলেই আবার হা-হা করে হাসলো খগেন। ভয় নেই। আমি আছি। মেছো কেউটে তো। আজ পূর্ণিমের রাতে বিষ ঝাড়তে বেরিয়ে মাছের লোভে আটলে গিয়ে ঢুকেছে।

খগেনের এই বেপরোয়া হাসি সিদ্ধেশ্বরী বা বিপিন—তুজনের কাছেই একদম অপরিচিত। তুজনেই একসঙ্গে অবাক্ হয়ে খগেনের মুখের দিকে তাকালো। এ-মুখ তারা কেউ চেনে না। ঠোঁটের তুই কষে দৌড়োদৌড়ির ঘামের ফোঁটা বা অন্য কিছু। বিপিনের মনে পড়লো, এক গ্লাস তাড়িও তো খায় নি খগেন। তবে অমন করে তো হাসার কথা নয়। এখন ভালোয়-ভালোয় কেউটেটাকে ও হাতে তুলে নিলেই ভালো। কেন যে এখানে দেখাতে নিয়ে এলাম!

কালো মোটা সুতোটা তখন ইঞ্চি তুই মাথা তুলে চারদিক দেখছিল। কালচে তুই জিভ একটু বেরোয়। আবার মুখের ভেতর চলে যায়। শরীরটা ভাঁজ করে যে শক্তি জড়ো করবে তার উপায় নেই। সারা গা ঝাঁকুনির চোটে লগবগ করছে।

খগেন ফের হো-হো হাসি হেসে বুক চিতিয়ে বললো, মাথা এখন বিষের ভারে ভারি। বেশি তুলতে পারবে না। ভয় নেই কোন।

শিবানী চেঁচিয়ে উঠলো। সরিয়ে নিয়ে যাও এক্ষুনি। কেউটে নিয়ে খেলা?

সিদ্ধেশ্বরী সরে দাঁড়িয়েছে। পরিষ্কার শাদা বারান্দায় কালো লম্বা সাপটা একটু-একটু করে নড়ে মাথা তুলছে। চারদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। স্টেনলেস স্টীলের থালায় শাদা ঝুরঝুরে ভাত। শিবানীর শাড়ির রোলেক্স পাড় অব্দি ঝকঝক করছে চাঁদের আলোয়। আজ তাহলে বৈশাখী পূর্ণিমা। একথা এ-অবস্থায় শুধু শিবানীরই মনে পড়লো।

নেবো। নেবো। এটা তো মদ্দা। মাদীও আছে একটা কাছাকাছি। বলেই খগেন খপ করে মাথাটা ধরে কালো সুতোর মুখটা মেলে ধরলো জ্যোৎস্নায়। সঙ্গে-সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরী বাবা গো বলে দেওয়ালে পিঠ রেখে টাল সামলালো। বিপিন বসু চেঁচিয়ে বললো, আজ এমন করছো কেন খগেন?

খাবাপ কিসির বিপিনবাবু? এই সাপ তো তোমায় পয়সা দেয়। তাব পিঠটা দেখলে কালো। এবাব বুকটা ছাখো। ফ্যাসফেসে শাদা একদম। বলেই সবার চোখের সামনে ঘুরিয়ে নিয়ে শিবানীর সামনে ধরলো, মদ্দাগুলো হাবা হয়। লোভে-লোভে ধরা পড়ে যায় মাছ খেতে গিয়ে। কিন্তু মাদীগুলো ধড়িবাজ! সহজে ধরা দেয় না। তাদের বুকগুলোও কালচে। সেটা আসে নি। আছে কিন্তু কাছাকাছি।

শিবানী নড়তে পারছিল না। তার এক হাতের ভেতর একটা পুরুষ মেছো কেউটের শরীর ফণা থেকে লেজ বরাবর উলটো করে চিতনো। জ্যোৎস্নায় শাদাটে ভাবটা চিকচিক করছে। সেই সঙ্গে বুনো আঁষটে গন্ধ নাকে উঠে এলো শিবানীর। সে চিনতে পেরেছে। এই লোকটাকেই সে মৌরলা মাছের কথা বলেছিল। একটু আগে।

ছয়

আরও অনেক বেশি রাতে খগেনকে ভালো করে চিনতে পারলো শিবানী।

তখন সারা দক্ষিণ মালঞ্চে শুধু বৈশাখী পূর্ণিমার শাসন। খালে কেউ নেই। বিপিনবাবুরা সবাই ঘুমে। হাজরার বড় ছেলেটা ঘুমের ভেতর বোবায় ধরে গোঁ-গোঁ করছে। জংশন স্টেশনের খবর—গুলিতে পেড়ে ফেলা মানুষটা বজরা নয়।

বজরা একটা বড় কাজে গিয়ে উধাও হয়েছিল। পার্ক সার্কাসের নতুন স্টেশনের গায়ে চার নম্বর গেটে এক চামড়াওয়ালার হয়ে কাজ করতে হলো এ ক'দিন। তারই চালান দেওয়া জিনিস চেনা ওয়াগন থেকে হাবিশ করে দেওয়ার কাজ। তাহলে রেল কোম্পানির কাছ থেকে দাম পেয়ে যাবে। আবার চামড়াটাও বিক্রি করা যাবে। সেখানেই সে শুনে এসেছে—গোসাপ, বিষধরের পাকা চামড়া চড়া দরে বিকোয়। আর চামড়া যদি না ছেঁড়ে—না কোঁচকায়—তাহলে তো মোটা পয়সা। বজরা জানে—তার বাপের ধরা জিনিসপত্তর ঘুম পাড়িয়ে তবে ধীরে-সুস্থে কাটা হয়। তাই কোঁচকায় না।

আজ রাতে দক্ষিণ মালঞ্চের অনেক ঘরে মাছের নানা কেরামতি। নানা জনে নানা মাছ পেয়েছে। কারও ভাগ্যে দু'তিনটে করে মোটা মতো বাণ পড়েছে। কারও ভাগ্যে এক ডজন লিকলিকে পাঁকাল। পাঁকাল তো পাঁকাল, তাই সই, ঝাল দিয়ে রগরগে করে অনেকেই রেঁধেছে।

মাছ কি অন্য কিছু—যেখানে একদম খাওয়া হয় নি—তা হলো বিপিনের বাড়ি।

বিপিন বসুর সন্ধ্যেটাই আজ হকচকিয়ে গেল। তাড়ির ঢিমে

আমেজ খগেনের একদম বেমক্কা কাণ্ডকারখানায় ভণ্ডুল। খগেনকে কোনদিন এ রকম দেখে নি বিপিন। এই হো-হো হাসি। গুণীনের খাঁচে জ্যান্ত বিষধর হাতে এমন লম্বাই-চওড়াই হাঁটাচলা সে কোন দিন দেখে নি। অথচ এই না খগেন বিকেল থেকে বলে আসছিল—অন্য একটা কাজ বের করো বিপিনবাবু। ভগবানের প্রাণী এভাবে ধরে ধবে কোতল করতে চালান দেওয়া—মনে নেয় না। হাতটা লুভী হয়ে গেল।

নেটের মশারির ভেতর জ্যোৎস্না এসে লাফিয়ে পড়ল। বিপিন জানে—সিধু জেগে আছে।

সিধু নিজেই বললো, ঠাকুরপোর নাকি সব ইচ্ছে নষ্ট হয়ে গেছে। ইচ্ছে আবার নষ্ট হয় নাকি?

শুনেও বিপিন কিছু বললো না। এই রোগটা এখন চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদেও ছড়িয়ে পড়েছে। কত কত জায়গায় লোক বলে—তাদের আর ইচ্ছে নেই। চোখের দৃষ্টি তখন ঝুলন্ত হয়ে যায়। ইচ্ছে মরে গেলে জীবনটা তো শুকনো শ্যাওলা। বিপিন ভেবে পেল না—এই সামান্য বয়সে তার ছোট ভাইয়ের এ দশা হলো কেন? তাহলে কি জীবনের অনেক কিছু ভীষণ তাড়াতাড়ি করে বসে আছে? আগ্রহ, বিস্ময় কলকাতায় পাচ্ছিল না বলেই তো বিপিন এখানে চলে আসে। তা ছাড়া সে নিজে তো নিঃসন্তান। তাব এ দশা হতেই পাবে। কিন্তু আমার ভাইয়ের তো এ অবস্থা নয়।

সিধু শুয়ে শুয়েই বললো, শিবানীর জন্যে আমার খুব চিন্তা হয়। ছেলেবেলা থেকে সুখে মানুষ। ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে হয়ে কী ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেছে বল তো?

বিয়ের পর যে কোন মেয়ের এ রকম তো হতেই পারে সিধু।

তুমি তোমার ভাইয়ের দিকটাই দেখলে!

আমার ভাই তো তোমার ঠাকুরপো।

চুপ করো। চুপ। ওই শোন—ঘুমের ভেতর শিবু কী সব বলছে।

উঠে দেখবো?

না। কাজ নেই। একা থাকতে দাও শিবুকে। কিছুদিন এই খোলামেলায় থাকলে নার্ভগুলোর টান-টান ভাব কেটে যাবে।

বিপিন চুপ করে থাকলো। নিশুতি রাতে পেয়ারার পাতাগুলো শুধু খড়র-মড়র করে যাচ্ছে। নয় তো সারা চরাচরে শুধু জ্যোৎস্না ফুটে ওঠার পাতলা ফুটফুটে শব্দ।

আসলে শিবানী তখন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। তার নাইকুণ্ডলী থেকে একটা আগুনের শিখা বুক বেয়ে গলার ভেতব দিয়ে মুখে বেরিয়ে পড়তে চাইছিল। এই তো কিছুদিন আগে কোটা সিল্কের শাড়ি পবে সে চা বানাচ্ছিল। তোলা উনুনে কেটলি। কি করে বাতাসে শাড়ির আঁচল গিয়ে উনুনে পড়লো। গোড়ায় দেখতে পায় নি। যখন পেলো, তখন শায়ার দড়ি কাটা দবকার। দরকার গায়ের জামাটা খুলে ফেলা। সাহস করে সব ছিঁড়ে ফেলেছিল। তাতেই বুকের খানিকটা, পেট আর দু'হাতের আঙুল খানিক খানিক ঝলসে যায়। হাসপাতালে দু'হপ্তা। মলম। ইঞ্জেকশন। রক্ত পালটানো। কত কি।

আজ নিশুতি রাতে সেই আগুনের শিখাটা আবার অনেকদিন পরে তার নাইকুণ্ডলীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ঝপাং করে শ্বাসনালী দিয়ে শিখাটা ঠোঁটের বাইরে লাফিয়ে চলে এলো। শ্বাসনালীর দেওয়ালটা একদম পুড়ে গেল। শিবানী অবাক্! আরে! এ তো সেই আগুন নয়। এ যে খগেনের হাতের ঝাঁকুনিতে ঝিম-ধরা সেই মেছো কেউটেটা—যার মাদীটাকে ধরা ভয়ঙ্কর কঠিন।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শিবু। সামনের দরজা খোলা। তাতে জ্যোৎস্নার একটি চৌকো কার্পেট। সে কার্পেটের ওপর

দিয়ে মদ্দা মেছো কেউটেটা চলে যাচ্ছিল। শিবানী ছুটে গিয়ে তাকে ফলো করতে লাগলো।

একদিকে বড়দার অসময়ের বোরো ধান। স্থির হয়ে গাছগুলো রাতের ঠাণ্ডা শিশির শুষে খাচ্ছিল। আরেক দিকে খানিকটা মাঠ। ন্যাড়া। যা কিনা দক্ষিণ মালঞ্চের সব জায়গায়। বড়দার কথায়—সবাই তো আর আগ্রহে ভুগতে চায় না। বেশির ভাগ লোক আগ্রহকে ভুল করে নাম দিয়েছে—লোভ, ফসল, মুনাফা। বেশিব ভাগ লোক কিছু একটা বানিয়ে তোলার বিস্ময়ে তো ভোগে না। ভুগলে মাঠগুলো বর্ষার চাষের পর এতখানি ন্যাড়া পড়ে থাকতে পারে ?

এসব কথা ভাবতে গিয়ে শিবানী পিছিয়ে পড়েছিল। মদ্দা মেছো কেউটেটা দ্বারিকপোতার মাঠে নামার আগে একবার ফিরে তাকালো। ডালের হাতার চেয়েও বড় সাইজের ফণা। একদম চিকচিক করছে। কী একটা মিষ্টি গন্ধ—আর কী সুন্দর! শিবানী ফাঁকা মাঠের ভেতর চেঁচিয়ে বলে উঠলো, যাই।

তেমাথায় সরু শুকনো খালটা পেরিয়েই দ্বারিকপোতার মাঠ। সেখানে পা দিতেই শিবানীর সব মনে পড়ে গেল। সে আগে আগে চলন্ত কেউটেটাকে বললো, একবার বাইশ বিঘের বড় দাগটা দেখে যেতাম ?

সাপ কোন জবাব দিল না। সে তার ঠিক করা সোজা পথ থেকে একটুও বেঁকলো না। যেমন এসেছিল—তেমনই যেতে লাগলো। অগত্যা—

খানিক গিয়ে শিবানী গাবতলা পেল। পরপর তিনটে গাবগাছ। পাকা গাবের লোভে নিশুতি রাতে একঝাঁক টিয়ে। বাইরে এত আলো। গাছের ভেতরটা এত অন্ধকার। টিয়াগুলো ডাল পালটে-পালটে ঘুরছে। আর ফুর্তির হর্‌রা।

এখানে খগেন নস্কর তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতো। সন্ধ্যের মুখে,

যখন সে মাইতিমশায়ের জন্যে চাষীদের দিয়ে অম্বুরী আনতে পাঠাতো স্টেশন বাজারে। খগেন এগিয়ে এসে বলতো, আমি এনে দেব ?

সে ঝাঁঝ তুলে বলতো, না। তুমি কেন ?

মেছো কেউটে আবার ফিরে তাকালো। ফণা তুলে। এসো। জ্যোৎস্না ফুরোলে কিন্তু যাওয়া হবে না বলে দিলাম সুমতি।

যাচ্ছি গো। যাচ্ছি। একবার মাইতিমশায়ের খরিদা সম্পত্তিটা দেখে যাবো না। বাইশ বিঘের দাগ—

যাওয়া হলো না। মেছো কেউটে চলে বড়ো খরো-খরো। কোথাও দাঁড়ায় না। পিছিয়ে পড়লে ফিরে দাঁড়ায় শুধু। আর ডাকে—এসো। দাঁড়ালে কেন ? এই তো তোমার নিজির জায়গা!

দেশ গাঁ তো বেশি সুন্দর, না। এই জ্যোচ্ছনা, মেঘ, বর্ষা, কুয়াশা, ধুলোর ঝড়, শিলবৃষ্টি, যা কিছু মোলায়েম—সুন্দর, অন্য রকম করে রাখে—করে তোলে আর কি! সেই সঙ্গে টিয়ার ঝাঁক, কালো গাইয়ের হামলানো, লাউমাচা—ওরাও দেশ-গাঁকে একটু একটু সুন্দীর করে দেয়।

এবার আর শিবানীকে পথ দেখাতে হলো না। সে নিজেই দৌড়ে দৌড়ে পাকুড়তলায় এসে হাজির। মেছো কেউটেটা যে কোন্ দিকে গেল ? হয়তো পাকুড়তলার পুকুরেই নেমে গেল।

সে সাত তাড়াতাড়ি নিজের উঠোনে গিয়ে হাজির। এ মা! ছ্যাল পড়ে গেছে। তাও তোলে নি কেউ ? কী এমন খাটুনির কাজ ? তিনটে লোক তিন বেলা খাটলে দিব্যি ছ্যাল উঠে যায়। উঠোনে তার নিজির হাতে বোনা ডাঁটার পয়লা ঝাড়টি এখন বাঁশ-বন করে ফেলেছে জায়গাটা।

ঘরের মধ্যে জ্যোচ্ছনার চৌকো। তার মানে গোলপাতার ছাউনি শকুন বসে-বসে ভেবে গেছে। ক'দ্দিনের গোলপাতা। পচে গিয়ে এই দশা। ঘোরানো মাটির বারান্দার সব ক'টা খুঁটিতেই ঘুণ।

পাতিহাঁসগুলো থাকতো এই বারান্দারই খোদলে। বাইরে থেকে দেখা যাবে না। সন্ধ্যেবেলা হাঁস ঢুকিয়ে দিয়ে হুড়কো তুলে দিতো। মাইতিমশায় তখন কলকেয় অম্বুরী চড়িয়ে টান দিতো। ওখানটায় বসে।

তার খানিক দূরে পা ভাঁজ করে বসলো শিবানী। তার কাঁধে জ্যোচ্ছনার একফালি খাঁড়া। যে কোনও সময় গলাটা নামিয়ে দিতে পারে। এত ধার এখানকার জ্যোচ্ছনায়।

ভাঙা ভাল টপকে এই সময় খগেন ঢুকলো, এসে গ্যাছো? জানতাম। তুমি আসবে সুমতি।

চিনলে কী করে?

তোমারে ভোলা কঠিন।

বেস্পতি?

ঘুমে এখন কাদা। সেই সন্ধ্যেতারাটা যখন পুবের আকাশে মিটিমিটি হবে—তখন তিনি উঠবে।

বলো না সত্যি করে—চিনলে কি করে?

ভগবানের রিকশো করে এলে! আমি ছুটে গে দেখি—রিকশোটা মাঝপথে উবে গেল।

যাঃ! সত্যি?

মিথ্যে বলে লাভ আমার সুমতি? আর—

আর কিগো? বলো না? থেমে গেলে কেন?

সেই সিঁদুর কৌটোটা মনে পড়ে তোমার? মাইতিমশায় বেঁচে থাকতে দিলাম—

হ্যাঁ। সিঁদুর তো ঘুচে গেল একদিন!

সেই কৌটোয় একটা বিষ-পাথর ছিল। মনে পড়ে সুমতি?

খুব। এই তো। ত্যাখো। আংটি করে পরেছি। মানায় নি?

খগেন এগিয়ে গিয়ে হাতখানা ধরতে গেল সুমতির।

উঁহু! অ্যাতো কাছে এসো না। যেখানে আছো থাকো।

কেন গো ? বিষ-পাথরটা দেখবো না সুমতি ?

আমি তো এখনো পরস্ত্রী। তা চিনলে কি করে আমায় ?

ওই বিষ-পাথরটা চিনিয়ে দিল।

তাই বুঝি। কি করে ?

বিষ-পাথরটা খুব সিঁদুর খায়।

আগে বলো নি তো ?

বলা হয় নি সুমতি। সিঁদুর কৌটোয় বসে সিঁদুর খায় পাথরটা। সেই খাওয়া সিঁদুর কপালে দিয়ে দেন। যখন ভগবানের রিকশো থেকে নামলে—তাকিয়ে দেখি—যা ভেবেছি তাই। সিঁদুরখোর পাথরটা সিঁদুরের আর কিছু রাখে নি। সেই সিঁদুর তোমার কপালে। টিপটা কেমন খাওয়া-খাওয়া—

তোমার বাবু এখন আমার ভাসুর। মেছো কেউটেটা নিয়ে সন্ধ্যে রাতে অমন পাগলামো করছিলে কেন ?

তোমায় চেনা দেব বলে।

তর সইছিলো না।

কতকাল পরে বলো সুমতি !

অত কাছে এসো না। এই তো বেশ আছি আমরা।

বাবুর ভাইটি কেমন সুমতি ?

বিয়ের সময় তো বেশ ছিলো। এই ক'বছর কি হয়েছে—বুঝি নে। নেশার পর নেশা। সেই সঙ্গে ঘুমের বড়ি গিলে একদম বেহেড্। এক একদিন লাশ টেনে তুলতে পারি নে বিছানায়।

ওর কপালেও একটা সিঁদুরের টিপ দিয়ে দিও।

পুরুষ মানুষ সিঁদুর পরবে কেন ? রাজী হবে কি ?

বেহেড্ অবস্থায় টিপ পরিয়ে দিও। আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে।

নেশা ছাড়া ওর কিছুতেই অভ্যেস হয় না।

কেন ? কেন ?

ওর নাকি কিছুতে আর ইচ্ছে নেই।

এ এক ভারি রোগ তো! চাদ্দিকে ছড়াচ্ছে তাহলে। ইচ্ছে কমে গেলে তো বিপদ ভীষণ।

তাই নাকি?

তোমায় একটু ছুঁয়ে দেখবো সুমতি?

তারপর অনেক রকম ইচ্ছে হবে তোমার। তখন সামলাতে পারবে?

খুব পারবো।

না, তা পারা যায় না। এই তো বেশ আছি। তুমি ওই বাঁশের মাচাটায় বোসো না।

খগেন বসতে পারছিল না। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, কে যেন আসে নি? সে আসে নি? সে কে? মুখ ফসকে বলেই ফেললো, মাদী কেউটেটা কিন্তু আসে নি। কেমন সেয়ানা দেখেছো।

একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে মাথায় ঘোমটা তুলে নিল সুমতি। তা আমাদের একটু সেয়ানা হতেই হয়। না হয়ে উপায় কি বলো! তোমাদের তো আবার ইচ্ছে উবে যায়। কী মারাত্মক অসুখ বলো তো।

খগেন আর কিছুই দেখতে বা শুনতে পেল না। তার কানের ভেতর লোহার ওপর লোহার র‍্যাঁদা ঘষার শব্দ ঘুরে-ঘুরে ঢুকে যাচ্ছিল। কান এফোঁড়-ওফোঁড় করে।

চোখে জ্বালা দিয়ে চোখ খুলে গেল খগেনের। সে বাঁশের মাচায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছের জানলায় যা সব গাছপালা—একদম শুকনো। শিশিরের ছিটেফোঁটাও নেই। কত বেলা? বলেই লাফ দিয়ে উঠলো।

উঠোন থেকে সেই র‍্যাঁদা ঘষার শব্দটা এবার ঘরে ঢুকে ঘর ভরে দিতে লাগলো। ঘুমের শেষ দিকে এ শব্দটা তার পিছু নিয়েছে। খুব বিরক্ত হয়েই খগেন বাইরে বেরিয়ে এলো। এতক্ষণ তার দুই

জ্জর মাঝখানটায় বিষ-পাথরটার ঠাণ্ডা ছোঁয়া টের পাচ্ছিল। এবার উঠোনে দেখলো, বজরা আপন মনে বসে পাইপগানের নলের ভেতরটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে উকোয় ঘষছে। খগেনকে দেখে বললো, চামড়াপটিতে এক সাঙাতের কাছে ডজন দুই নতুন টোটা ছিল। তুলে আনলাম। দেখি এ নলে চলে কিনা।

কোথায় চালাবি এসব ?

কেন ? তোমার ওই বিপিনবাবুর আস্তানায়।

খবরদার। লোকটা তো কোন ক্ষেতি করে নি আমাদের।

ক্ষেতি বলে ক্ষেতি ! চামড়া পিছু পাঁচ ছ টাকা করে ঠকাচ্ছে।

সে আমি বুঝবো। তাতে তোর কি ?

কেন বাবা শুধু শুধু ঠকো ?

তাতে তোর কি ? আমার রোজগারের পয়সা আমি বুঝে-সুঝে নেব।

তবু ঠকবে ?

ঠকবো।

তুমি তো বাবা একবার বাণ মেরেও বিপিনটাকে মুখুণ্ডী করে দিতে পারো।

তারপর ?

তখন সিন্দুকটা হাতড়ে দালালির পয়সাগুলো ঝেড়ে দাও।

সিন্দুকে আছে নাকি ?

হ্যাঁ। বড় কাঠের সিন্দুক। ওপরে লেপ-তোশক রাখে।

তুই জানলি কি করে ?

কেন ? সেবারে যে তিন ভরির হার, বিয়ের টিকলি ফর্সা করে দিলাম।

তাহলে যা ভেবেছি তাই। তোরই হাতের কাজ।

ওই একটা কাজই তো আমি জানি।

খগেন আর কথা বলে না। এখন সে বাঁশের খুঁটির চেনা গর্তে

নোট, আধুলি, কাঁচা টাকা, খুচরো রাখে। বেস্পতি থেকে হাজরার বউ—সবাই সেখান থেকে হাতায়। চেয়ে নেয়। আবার না চেয়েও নেয়। নেয় না শুধু ঘটি। পুরো ব্যাপারটাই জানে খগেন। সে জেনেও চোখ বুজে থাকে। কিচ্ছু বলে না খগেন। চেয়েছিল পয়সা। নিজের এলেমে। পয়সা আসে—এইটেই যথেষ্ট। তার তবিলদারিতে খগেনের কোন ইচ্ছেই কাজ করে না। এখন সে তার বয়সের একটা নিষ্ফলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন তার ছেলে হবে না। মেয়ে হবে না। গাই বিয়োবে না। বউ বাপের বাড়ি থেকে আসবে না। এখন আর কি কোন ইচ্ছে থাকে! এখন সে মানুষদের ভেতর দক্ষিণ মালঞ্চের সেই ধর্মের ষাঁড়। বৃষ্টি, রোদ্দুর—কিছুতেই তার সাড় নেই।

বেস্পতি দুধ নিয়ে বেরিয়েছে। ঘটি হাওয়া। হাজরা নিশ্চয় খালে। বড়টা কার বাড়ি ধান সেদ্ধ শুকানো করতে গিয়ে হাত-সাফাই করছে কিনা কে জানে!

খগেন খরো পায়ে গিয়ে মিনিট দশেকের ভেতর খালপাড়ে উঠলো। এখন চান্দিক জ্বলে যাচ্ছে। পৃথিবী জুড়োবে সেই সন্ধ্যের পর। ততক্ষণে লাশ হও বসে বসে। ঘুরে ঘুরে।

বিপিনবাবু বেলাবেলি অফিস বেরোচ্ছিল। লাগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধেশ্বরী দেখলো—তার ছোট জা গতকালের চেয়ে অনেক শান্ত হয়ে পুরনো ছবির অ্যালবাম দেখছে বড়ঘরের খাটে বসে। সামনেই বিঘে দশ বারোর বোরো ধানের চাষ। বেঁটে জাতের বেশি ফলনের জয়া—কাবেরী। সারখোর এই ধান হয় খুব বেশি—ঠিক ঠিক সময়ে তোয়াজ করলে। গাঢ় কালচে সবুজ সব পাতা। এক এক গোছায় মোটা করে বিয়েন কাঠি ছাড়বে। জনা দুই জন-খাটুনে উবু হয়ে নিড়েন দিচ্ছিল। আর খুঁজছিল পোকা। যদি পাওয়া যায় তো ওষুধ ছিটোতে হবে বিকেল-বিকেল। শ্রীপঞ্চমীর পর রোয়া এ-চারা খুব বলকারী হয়ে ঠেলে উঠেছে।

এসব বাদ দিলে চারদিকে কোন লোক নেই। নির্জন হ্যাড়া। সিদ্ধেশ্বরী অভ্যেস বশে বিপিনকে একটা শুকনো চুমো দিতে গেল। দিয়েছিল প্রায়। দেওয়া হলো না। তার চোখের সামনে বারান্দার নিচেই খগেন দাঁড়িয়ে।

বিপিন কিছু বুঝতে না পেরে বললো, কি হলো সিধু? এখনো? এই বয়সেও কিপটেমি!

আহা! কে দাঁড়িয়ে হ্যাখো—

বিপিন চমকে ঘুরে তাকিয়ে বললো, ওঃ! খগেন। কখন এলে?

খগেন সেদিক দিয়ে একেবারেই না গিয়ে বললো, কলকেতা যাচ্ছো?

বেরুচ্ছিলাম। অফিস যাই নি পাঁচ দিন। আজ একবার চেহারাটা দেখাবো।

বিষের দরটা জেনো তো।

খুশিতে বিপিন প্রায় লাফিয়ে উঠলো। তুই—আবার ধরবি খগেন? ধরবি, সত্যি?

বুড়ো থুথুরে পাকা চামড়ার রেটটাও জানা দরকার।

ওসব তো আমার নখের ডগায়। অফিসে যাবো। ফোন করবো। আর খবর চলে আসবে।

ঠকাচ্ছো না তো আমায়?

তোকে ঠকিয়ে যাবো কোথায় আমি! আমি কি ধরতে জানি? তাহলে তুই ধরবি তো। পাক্কা কথা?

আগে মাগীটাকে ধরি। মাদী মেছো কেউটে বড় ধড়িবাজ হয়। মাছের লোভে ঘোরে। কিন্তু ধরা দেয় না।

গো-সাপদের এবার ক'মাস জিরেন দিয়ে মাদী মদ্দা সব্বাইকে পাকড়াও কর।

আগে মাদী মেছোটাকে ধরি তো। তারপর বাকি সব—

খুব ভালো। খুব ভালো খগেন। এই তো মতি হয়েছে তোর।

মদ্দাটাকে কী করলে ?

কাল রাতে তুই ছুড়ে দিতে মাঠের ভেতর দলা পাকিয়ে ঝিমোচ্ছিল।

তারপর ?

আঁকশি দিয়ে তুলে গাইয়ের জাবনা দেওয়ার সিমেণ্ট করা মেছলায় চাপা দিয়ে রেখেছি। ভোর থেকে ফোঁসাচ্ছে।

চিন্তা কোরো না। ওটাকে আমি ঠিক করে রাখবো। তাইয়ে তাইয়ে রাখতে হবে। মাদীটাকে ধরতে কাজে দেবে যে।

কামড়াবে না তো ?

কামড়ালে আমায় কামড়াবে। তোমার কি ? নিশ্চিন্তে কলকেতার কাজ পাকা করে এসো। মাদীটা আজ সন্ধ্যে-সন্ধ্যে ঠিক মাছ খেতে আসবে। তাছাড়া —

দাঁড়িয়ে পড়লো বিপিন। কি রে খগেন ? বাকিটা বল।

বর বউ দু'জনারই মাথায় বিষ জমেছে। বাবু না নয় মেছলায় ছোবল মেরে ঢালবে। বিবি কোথায় ঝাড়বে ? তাকে তো ঢালতেই হবে! কোথাও তো ঠোক্কর মেরে বিষটা ঢালতে হবে। তখন ? তখন কোথায় যাবে ?

যা ভালো বুঝিস কর। আমি ওসব বুঝি নে।

তোমায় কিছু বুঝতে হবে না। যেখানে যাচ্ছো যাও।

খগেনের গলা পেয়ে শিবানী এক ছুটে বারান্দায় চলে এলো। এতক্ষণ পুরনো ছবি ঘাঁটছিলো। দক্ষিণ মালঞ্চে এ-বাড়ি তৈরি হওয়ার আগেকার ফাঁফা মাঠ। বাড়ি তৈরির ইটের লরি আসছে—ধুলো উড়িয়ে—তার ছবি। বড়দার ফুলশয্যার ছবি। তার স্বামীর ছাত্রজীবনের পাসপোর্ট সাইজ ফটো। এতক্ষণ একদম এসবের মধ্যে

ডুবে ছিল শিবানী। কিন্তু খগেনের গলা কানে যেতেই যে কী হয়ে গেল।

এক ছুটে বারান্দায়।

কাল সন্ধ্যের কথা মনে পড়তেই ফাঁকা বাড়ির বারান্দায় খগেনের একদম মুখোমুখি সিদ্ধেশ্বরী কাঁটা হয়ে গেল। আজই বিপিনের অফিস যাওয়া উচিত হলো না বোধহয়। সে আরও আশ্চর্য হলো—শিবানীর ভাবগতিকে দেখে।

শিবানী ভয় পাবার কথা দূরে থাক—যেন কতদিনের চেনা পরিচিত—এইভাবে প্রায় কাছে এগিয়ে গেল খগেনের, আজ কিন্তু মৌরল্লা চাই।

এই তো মুশকিল! এখন আমি মৌরল্লা খুঁজতে বেরোই জাল হাতে—

তা কেন। বড়দা আজই ভোরে বাঁধ কাটিয়ে খাল আবার জলে ভরে দিয়েছে। কিছু মৌরল্লা কি আর নেই জলে?

খুব অবাক হলো খগেন। বিপিনবাবুর ভাইয়ের বউয়ের বুদ্ধি আছে তো! আর থাকবেই বা না কেন? জল তোড়ে পাম্পে ঢোকে। সেই তোড়ে কিছু মাছও ঢুকে যায়। মৌরল্লা ঢোকা আশ্চর্য নয়। তারা মাঠ ঘুরে জলের সঙ্গে আবার বাঁধেই তো ফিরে এসেছে। সে-বাঁধ কেটে জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সারা খালে। কারণ কাল রাতে জনা চারেক লোক রেখে বিপিনবাবু নলের মুখটায় খাল বেশ খানিকটা গভীর করে নিয়েছে—সামনের সনের চাষের কথা মনে রেখে।

সিদ্ধেশ্বরী আরও অবাক হলো খগেনের হাবভাবে। এই না লোকটা তারই স্বামীকে ধমকে কথা বলেছিল। আর এখন বিষধর সাপের খোঁজ ছেড়ে দিয়ে মৌরল্লার জন্যে জাল হাতে জলে নামবে নাকি? হায় পুরুষ মানুষ! হায় বয়স!

ওসবের জন্যে তুমি বিপিনবাবুকেই বলো। আমি যে অন্য কাজ হাতে নিয়ে বসে আছি। মা, বলুন না আপনি—

সাক্ষী মানায় সিদ্ধেশ্বরী কিছু খুশি হলো বটে। কিন্তু বাড়ির ভেতর যাবার আগে একটা কথা গড়িয়ে দিয়ে গেল। আমার জা হয়! দাও না ধরে ক'টা মৌরল্লা—

খগেন কিন্তু অস্বস্তিতেই পড়লো। ফাঁকা লাল বারান্দায় এখন শুধু সে আর বাবুর ভাইয়ের বউ। এ অবস্থায় বিপিনবাবুর বউ কি তাকে ইচ্ছে করেই ফেলে গেল? না, ভদ্দরলোকের বাড়ি এমনিই হয়ে থাকে?

খগেন একদম সোজা গিয়ে খালপাড়ে উঠলো। আমার এখন মৌরল্লা ধরার সময়!

কেন? শুধু সাপ ধরে বেড়াবে সারা জীবন?

খগেন দেখলো, বাবুর ভাইয়ের বউ এখন একদম তার মুখোমুখি। সে ফস করে বলে বসলো, কাল তো মেছো কেউটে দেখে ভয়ে নীল!

তখনো তোমায় চিনি না।

খগেন এ-কথায় ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো। আমি আপনার চেনা?

আমি তো তোমায় চেয়ে অনেক ছোট। আমাকে আপনি বলছো কেন? আমার ভাসুরকে না তুমি বলো?

কে? বিপিনবাবু?

হ্যাঁ। কালই তো চিনলাম—জানলাম—তুমি কে?

নির্জন খালপাড়। রোদ্দুরের কোন মা-বাপ নেই। পায়ের নিচে খগেন গরম ঘাসগুলোকে চেপে দাঁড়িয়েছিল। পরিষ্কার বললো, আমি কে?

এবার শিবানী কেঁপে গেল। তবু সাহস করে বললো, তুমি খগেন।

আর কিছু না?

আমার ভাসুরের হয়ে সাপ ধরো তুমি।

আর কিছু ?

আর—বলে মনে করতে গিয়ে একটা অস্পষ্ট উঠোন, জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ওপারে এমন একখানি মুখ শিবানীর মনে এসেও আবার হারিয়ে গেল। সে অস্পষ্ট গলায় বললো, কোথাও দেখেছি তোমায় ?

সে আপনি জানেন।

ফের আপনি !

তা না তো কি ! কিছু মনে পড়ে না ? হাতের ওই বিষ-পাথরটা কোথাকার ?

শিবানী একটাও কথা বলতে পারলো না। ভ্যাপসা রোদে তার চোখে জল এসে গেল। আর একটুও না দাঁড়িয়ে শিবানী ছুটে বাড়ি ফিরে এলো। খগেন এই ছুটে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় টের পেল—তার সামনের বাতাসে মেয়েছেলেটি নেই। তার সামনে এখন ফেরত-জলে ভরা খাল—জলের কিনারে কিনারে কতকগুলো ঘোগ। সে-সব খোগ কাঁকড়াদের কীর্তি হতে পারে। আবার হতে পারে বড়ভাইদের আস্তানা।

বড়ভাইরা সাধারণত নিজের বাসা নিজে বানাতে পারে না। বানাতে জানেই না। কিংবা সে ধৈর্যই নেই কোন সাপের। ধান পাকলে ভুঁই-ইঁদুরের পাল এসে হাজির হবে। তারা ধান চুরি করে। চোরাই ধান নিজেরাই গর্ত করে জমায়। কোনদিন সন্ধ্যেবেলা সেই গর্তের মুখে ইঁদুর এসে দেখে—তার বানানো ধানের গর্তে তারই জন্যে স্বয়ং যম এসে বসে আছে।

এইভাবে ইঁদুর উৎখাত করে সাপ বাসা বানায়। খগেন সে-সব বাসা চেনে। বিড়ে পাকিয়ে থাকা অভ্যেস বড়ভাইয়ের। গায়ের আঁশ বড়ভাইয়ের বাসাবাড়ির দেওয়াল তেলতেলে করে ফেলে। এরকম তেলতেলে গর্ত দেখলেই খগেন আলাদা গন্ধ পায়।

এসব বাসা থেকে বড়ভাই উৎখাত হয় দুজনের হাতে।

একজন হলো—তার মতো লোক। যে কিনা হাত ঢুকিয়ে বড়ভাইকে তুলে নেবে। কিংবা বিষধরের আহারে বেরোবার রাস্তায় তার মতো লোকই বেতের ডুলি পেতে বসে থাকে!

আর যে বিষধরকে ঘরছাড়া করে থাকে—সে হলো দেশ-গাঁয়ের হা-ঘরে মানুষ। কোথাও কিছু না পেয়ে অভাবী মানুষ বিষধর সাপ তাড়িয়ে ইঁদুরের জমানো ধান নিজের কোঁচড়ে তুলে নেয়। আরও যদি ধান পাওয়া যায়—এই আশায় গর্তটা খুলে খুবলে একদম হলহলে নালা বানিয়ে তোলে। তাতে আর সাপ ফিরে এসে থাকতে পারে না। সেসব গর্তের আর কোন আড়াল-আবডাল থাকে না তো।

খগেনের চোখের সামনে এখন খালের ওপারের ঝামার পাঁজা। এবড়ো-খেবড়ো বাতিল ইঁট। খালের জল ভেঙে খগেন ওপারে গিয়ে উঠলো। পাঁজার ইঁটের ছায়ায়—নয় তো আতা গাছের ডালপালার নিচে চলন্ত অন্ধকারে মাদী মেছো কেউটেটা আছে নিশ্চয়। এ হয়তো এখন দূর থেকে খগেনকে দেখছে—আর আসছে। চারদিক ন্যাড়া। একটা ট্রেন এসে খানিক গোলমাল নামিয়ে দিল দক্ষিণ মালঞ্চে। তারপরই আবার রওনা হলো একটা নির্জন মাঠের দিকে। সেখানে একটা জায়গায় থেমে কিছু গোলমাল ফেলে দেবে। এগোতে গিয়ে খগেন থমকে থামলো। সেই ফেলে দেওয়া চাঁদবুড়োর শরীরটা পড়ে আছে। শরীর বলতে মাংস খাবলানো মাথাটা। চোখ নেই। গা-টা পচে উঠেছে। খগেনের চোখে পড়লো, আশশ্যাওড়ার বেঁটে জাঙালের নিচে টুকরো ছায়ায় তিনটে সরু মুখ। মাংস রংয়ের। হ্যাই! যাঃ!

তুর তুর করে ছুটো পালালো বেজি তিনটে। আহা রে চাঁদবুড়ো! কী রূপ ছিল তোর। আহা রে! পাকা চামড়া রে।

ওদিকে ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে শিবানী চোখে বালিশ চেপে শুয়ে পড়লো। সিদ্ধেশ্বরী তাকে ও অবস্থায় দেখতে পেল খানিক

বাদে। একঢাল চুল মাথায়। কোমরের কাছটায় পোড়া দাগ। কী হয়েছে শিবু? শুয়ে পড়লি যে অসময়ে?

কোন জবাব না পেয়ে সিদ্ধেশ্বরী তার মুখটা তুলে নিল কোলে। এ কি? কাঁদছিস?

এবার শিবানী হু-হু করে কেঁদে উঠলো। তারপর কান্না মিশিয়ে বললে, আমি বড়দি কাল সন্ধ্যে থেকেই কেমন হয়ে গেছি।

কি হয়েছিস?

তোমার ঠাকুরপোর যেন কেউ নই আমি। এখানেই যেন কোনদিন ছিলাম। আবার সব খুঁজে পাচ্ছি।

পাগলি! তোর সন্তান রয়েছে, সংসার রয়েছে। এরা কেউ নয়? আমরা কেউ নই? তুই আচমকা এখানকার হয়ে গেলি?

হ্যাঁ দিদি। এই মাঠ। ওই পোড়ো পাঁজা। এখানে কোথায় একটা গাছতলায় যেন আমার ঘরদোর ছিল। সংসার ছিল এক সময়। ওই খগেন পর্যন্ত আমার চেনা।

পাগলামি করিস নে। স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছিস হয়তো। ও ফিরুক অপিস থেকে। বলে দেব কাল অপিসে গিয়ে যেন ঠাকুরপোকে চলে আসতে ফোন করে।

না দিদি। এই আমি বেশ ভালো আছি। আমার নিজের জায়গায় যেন চলে এলাম।

হ্যাঁ। ভালো আছো। খুব ভালো আছো। শুধু শুধু কাঁদে কেউ?

কাঁদতে ভালো লাগছে আমার দিদি।

ওমা! সে কি কথা রে শিবু। কাঁদতে কারও ভালো লাগে?

লাগে দিদি। যদি চেনা জায়গা খুঁজে পেয়ে কেউ আনন্দে কেঁদে ওঠে—সে কান্নায় সুখ আছে। গাছপালার ভেতর বসে বসে কাঁদতে ইচ্ছে যায় খুব। কিন্তু লজ্জায় পারি নে। যদি কেউ দেখে ফেলে—

এসব কি বলছিস শিবানী। আমার তো ভয়ে কাঁটা দিচ্ছে গা।

ভয়ের তো কিছু নেই দিদি। এভাবেই মানুষ একদিন নিজেকে চিনতে পারে।

দর্শন রেখে দে তোর। চল পুকুরঘাটটায় গিয়ে বসবি। আমি আজ তোর মাথা ঘষে দেব।

ওমা! এই নির্জন দুপুরে আমি তোমার সঙ্গে একা-একা পুকুরঘাটে যাবো না।

কেন লা শিবু?

শেষে যদি মাথা ঘষতে বসে কিছু একটা মাথায় টিপে দাও—আর অমনি আমি চিরকালের মতো পাখি হয়ে উড়ে যাই—

গল্প উপন্যাস পড়ে তোর মাথায় যতো আজগুবি প্ল্যান আসে শিবু।

এ তো ঠাকুরমার ঝুলির গল্প দিদি। রসিকতাও বোঝো না তুমি?

সব বুঝি শিবু। কিন্তু একটা জিনিস তোর আমি কিছুতেই বুঝি নে। আগানে-বাগানে ঘুরে বেড়ায় ওই খগেনটা। গায়ে সাপের গন্ধ। দাঁত মাজে না কতদিন। চোখ লাল। তার সঙ্গে তোর এত কি কথা থাকতে পারে?

মাছের কথা বলতে গিয়ে দেখলাম—লোকটাকে যেন কতদিন পরে আবার দেখলাম।

আসুক তোমার ভাসুর অপিস থেকে। সব বলবো আজ।

শিবানী সে কথায় কোন ভ্রূক্ষেপও করলো না। সে আরেক জায়গা থেকে শুরু করে দিল। জানো দিদি, আংটিতে বসানো এই বিষ-পাথরটা আমি কোথায় পেয়েছিলাম?

বিষ-পাথর নাকি?

হ্যাঁ। কলেজ থেকে আমাদের জিওলজিক্যাল প্র্যাকটিকালে রক ফসফেট দেখাতে নিয়ে গেল জব্বলপুরে। সেখানে শুকনো

পাহাড়ী গর্তে পাইথন থাকে। এক বেদেনী আমায় পাথরটা দিয়েছিল।

কত দাম ?

কোন দাম নেয় নি দিদি। তাঁর ছাগলছানাটা টাঙা চাপা পড়ছিল টুরিস্টদের। আমি ছুটে গিয়ে বাঁচাই। পাথরটা সাবধানে রেখে দিতে বলেছিল। আমি সাবধান করে সিঁদুর কৌটোয় রেখে দি বিয়ের পর। কিছুদিন অন্তর দেখি, সিঁদুর কৌটো ফাঁক। ভর্তি কৌটোতে পাথরটা রেখেছি। শেষে দেখি দিদি—পাথরটা ভীষণ সিঁদুর খায়।

পাথরে সিঁদুর খায় ? কোনদিন শুনি নি তো।

হ্যাঁ দিদি, খায়। কিন্তু বিপদ-আপদ কাটিয়ে দেয় আবার। মরতে-মরতে বেঁচে গেছি পাথরটার গুণে। কথা বলতে-বলতে শিবানী চুপ করে গেল। কান খাড়া করে কী শুনে বললো, কিসের শব্দ দিদি ?

কাল সন্ধ্যের সেই কেউটেটা। জাবনার মেছলায় আটকে রাখা হয়েছে তো। রাগে রাগে ফোঁসাচ্ছে।

এত জোরে ওরা ফোঁসে ? ছেড়ে দাও না বেচারাকে। তোমাদের এই সাপ ধরাধরি আমার একদম ভাল লাগে না।

আমারই কি লাগে ? কিন্তু কি করবো বল। তোর দাদা ওতে পয়সা পায়।

আমি গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবো ? রাগে কী রকম গরগর করছে। ওই শোন।

বাতাসে চাপা গোঙানির খানিকটা গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে গেল। খবরদার শিবানী। ওসব নাড়াচাড়া করতে যাবি না।

আমার সবাইকে চেনা লাগছে দিদি। আমি সারা মাঠের সব গর্ত দেখতে পাচ্ছি। সব জিভ্। বেরোচ্ছে। আবার ভেতরে টেনে নিচ্ছে। আজ রাতেই দেখো—কত খোলস ওরা ছেড়ে রেখে যাবে। শাদা ফক-ফক করবে সারারাত—মাঠে শিশির মেখে।

থামবি শিবু।

খগেন তখন আতাতলায় ছায়ায়। এক ধাড়ি গোসাপ তাকে দেখলো—না-থমকে দেখলো। চোখাচুখি হতেই প্রাণ নিয়ে ইট-খোলার গর্তে দৌড়। সেকি দৌড়। প্রাণের মায়া সবচেয়ে বড় মায়া। খগেন তাকে কিছুই বলতো না। তার দিকে সে মনও দেয় নি। সে এই গাছতলায় এসেই একটা বুনো আঁষটে গন্ধ পেয়েছে। পেয়েই মনে মনে বলছে, তুমি এখানে তাহলে! ও হরি! আমি শত রাজ্যি ঘুরে মরি। সব সময় ভাবি—কে আসে নি? কে আসে নি? এবার বেরিয়ে এসো। ও আমার মাগী বউ—এবার দেখা দাও।

মাদী মেছো কেউটেটা অনেকক্ষণ ধরেই খগেনকে দেখছিল। নিষ্পলকে। একঠায় একখানা ঝামার রংয়ের সঙ্গে নিজের গায়ের রংটা মিশিয়ে দিয়ে।

সেদিনই বেশ রাতে বিপিন বসু তার বউকে ডাকলো। সিধু। এই নোটগুলো কাঠের সিন্দুকে রাখো।

এত টাকা?

আজকাল বিষ, চামড়া—দুই-ই বিদেশে যায়। আগাম দিল পার্টি।

সাত

গভীর রাতে সিধু বিশনকে জাগালো। আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না।

বন্দী অবস্থায় সাপ অমন গোলমাল করে। নিশ্চিন্তে ঘুমোও তো।

আমি সাপের কথা বলছি না। ঘুমের ভেতরেও সাপ-সাপ কোরো না। আমি বলছি অন্য কথা।

কি?

তুমি এই সাপ ধরা ছেড়ে দাও তো।

কাল সকালে এসব কথা বোলো।

আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না। তুমি ঠাকুরপোকে কালই একটা খবর দেবে?

কেন?

নিজের বউ নিজে এসে সামলাক।

কি সব বলছো বলতো মাঝরাতে?

ঠিকই বলছি। শিবানীর ভাবগতিক সুবিধের নয়।

কী দেখলে তুমি?

যে খগেনকে দেখে কাল সন্ধ্যেবেলা ভয়ে নীল—আজই তার সঙ্গে খালপাড়ে দাঁড়িয়ে কত কথা—

কলেজে পাস মেয়েরা অমন হয়। তাতে ভয়ের কিছু নেই। আর খগেন কত বড়।

আমিও তো কলেজে পড়েছিলাম।

সে তো আমিও পড়েছি সিধু। আমরা তো পাস করি নি।

তা হোক না। পাস করলে কি পাখা গজায়? খগেনের সঙ্গে কত কথা খালপাড়ে দাঁড়িয়ে।

শহরে থাকে তো। তাই মাছের কথা, সাপের কথা, বৃষ্টির কথা—এসব বোধহয় খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছিল।

না। আমাদের মেয়েদের চোখে খারাপ লাগলে বুঝবে ভুল নেই কোন।

ঘুমের ভেতরেই বিপিন বললো, তোমরা মেয়েরা বড় হিংসুটে। শিবু অমন মেয়ে নয়। খগেনেরও ওসব দোষ নেই। আর আমার ভাই কি ফেলনা মানুষ!

সিদ্ধেশ্বরী বুঝলো, আর কথা এগোবে না। তার পাশের প্রাণীটির এবার নাক-ডাকতে শুরু করলো। বাড়ির লাগোয়া গোয়ালঘরে আরেকটি প্রাণী তখন প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছিল। তার ফোঁসফোঁসানি সিদ্ধেশ্বরী বিছানায় শুয়েও টের পেল।

নির্জন জ্যোৎস্না এসে সিদ্ধেশ্বরীর শোবার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়েছে।

ঠিক এমন সময় শিবানী খাট ছেড়ে উঠে পাশের ঘরের দরজাটা খুললো। নিঃশব্দে। তারপর বারান্দায় একটুক্ষণের ভেতরে সে টের পেল, তার পায়ের নিচের ধানকাটা মাঠটা এখন ভিজে। বাতাসের ভেতর ঠাণ্ডা সব খাল এখন অদৃশ্য। গায়ে শীত-শীত লাগে শুধু।

আজ রাতে আর পথ চিনতে একটুও কষ্ট হলো না শিবানীর। সে ঠিক করলো, পাকুড়তলায় পৌঁছেই খানিকটা কেঁদে নেবে। এমন সুন্দর রাত। এমন শাদা রংয়ের মাটির রাস্তা। পুকুরধার। ধানের গোলা। খড়ের গাদা। থাক-থাক বসানো ওল চারা। এই সময়টায় পাকুড়তলায় বসে পড়ে দু' হাতের বাঁধুনিতে হাঁটুজোড়া বেঁধে নিয়ে গলা খুলে কাঁদতে ভালো লাগে। এ আমারই জায়গা ছিল। আমারই ভাশুরের বাড়ির গায়ে আমারই বাড়ি—আমি না দেখে—না চিনে কী জীবন কাটাচ্ছিলাম কলকাতায় এতকাল।

নিজের বাড়িতে ঢুকে আজ শিবানী সব ঘরে গেল। একটা

খটাস ছানাপোনা নিয়ে শুয়েছিল। সে তড়াক করে উঠে পালাতে পারলো। বাকিরা পারলো না।

আহা রে! তোরা ক। তবু ঘরে জ্যান্ত কিছু থাকে। শুধু শুধু চাঁদের আলো বয়ে যায়। শুধু শুধু দখিনা বাতাস বয়ে যায়।

জ্যান্ত আরও কিছু কিছু জিনিস ঘরে ছিল। মোট তিনখানার ভেতর বড় ঘরখানার আড়ায়-আড়ায় একটি রাতকানা কালনাগিনী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যদি টিকটিকি কিংবা আরশোলা পাওয়া যায়। জ্যোৎস্না একদম সয় না ওর চোখে। রাতকানাটির আন্দাজে ঘোরাফেরায় লাভের মধ্যে ব্যাপারটা দাঁড়ালো—আড়া থেকে মাথার ওপর ঝুলে-পড়া তার ফণাটি শিবানীর ঘোমটার ওপর দিয়ে একচুল তফাতে দুলতে লাগলো।

উঠোনে দাঁড়ানো খগেন চেঁচিয়ে বললো, বসে পড়ো। বসে পড়ো এখুনি।

কিছু বুঝতে না পেরে শিবানী বাইরে বেরিয়ে বারান্দায় কালকের জায়গাটিতে বসলো। কেন গো?

তোমার মাথার ওপর কালনাগিনীর ফণাটা দুলছিল।

ছুটে এলে না কেন?

তাহলে তোমায় ছুঁয়ে ফেলতাম।

ছুঁতে।

তুমি যে বারণ করলে কাল।

সব বারণ শোনো তুমি?

না শুনলে যদি আবার উবে যাও। আমার তো কিছুই বিশ্বেস হয় না। এই যে তুমি আছো না নেই—আমি তা ভালো করে জানিই না।

খুব হয়েছে! এখন আর অত পছন্দসই কথা বলে আমার মন ভালো করতে হবে না।

এতকাল ছিলে কি করে কলকাতায়?

তুমিও তো এতকাল একইভাবে থেকে গেলে এখানে।

তা সত্যি। আমার আবার জীবন। ওই তো আমার বজরা। সারা দিনরাত যন্ত্রপাতি নিয়ে আছে। টোটা পালটাচ্ছে। তার কাটছে। নয় তো শ্লিপার সরানোর মতলব ভাঁজছে।

কেন? বড় ছেলে কোথায়?

হাজরা। তার কথা আর বোলো না। যে ক'দিন কাজ পেল ভালো। তারপর হাঘরে হাভাতে জোয়ান মাঠে মাঠে ঘুরবে ডাণ্ডস হাতে। গর্ত থেকে সাপ খুঁচিয়ে বের করে ইঁদুরের মজুত ধান ধামায় করে বাড়ি বয়ে আনবে। সে ভাতে হাভাতেটার যে ক'দিন চললো। ফুরোলেই আবার ডাণ্ডস হাতে মাঠে।

ঘটি? ঘটির খবর কি? বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

ডেকে আনবো। ঘুমোচ্ছে।

না। ঘুমোতে দাও।

ঘটিটা আগান-বাগান ঘোরে। শেকড়-বাকড় চিনতে চায়। তা ওর মা বেম্পতি কি সে ফুরসত দেবে ওকে? এখুনি বলে—ভালো দেখে একটা গাই গ্যাখো। তারপর হুধেব কারোবারে নেমে যা।

শিবানী বললো, আর কাছে এসো না। এই তো বেশ আছি আমরা। সেই মাদী মেছো কেউটেটার খবর কি? কোন খোঁজ পেলে?

পাবো না মানে। আমার চোখ এড়িয়ে যাবে কোথায়? আতাগাছতলায় দেখা হলো।

পেছন থেকেও দেখতে পাও তুমি?

সব দিক থেকে। আমায় যদি কেউ দূর থেকে দেখতে থাকে—তবে সে-দেখা আমার গায়ে এসে বেঁধে। আমি টের পাই। টের পেয়ে গিয়ে তাকাতে থাকি। তখনই সে আমার চোখে ধরা পড়ে যায়। আমি তাকে দেখতে পাই।

তোমাকে নজরে ধরেছে কেউটে মেছুনীর।

তাই তো মনে নেয়। আজ আমায় দেখছিল—না, তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছিল—কে বলবে। জিভ বের করে—আবার মুখের ভেতর জিভ টেনে নেয়।

দেখো। চুমু খেয়ে বোসো না যেন।

এ ঠাট্টা একদম গায়ে না মেখে খগেন বেশ শান্ত গলায় বললো, জানো। এতদিন আমার খালি মনে হয়ে আসছে—যেন কে আসে নি? আসে নি কে? কে যেন আসে নি? তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই।

আতাগাছতলায়। বাতিল ইটখোলার পোড়ো পাঁজায়!

একথায় দুজনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো।

শিবানীর ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন তার পায়ের কাছে হাত দিচ্ছিল। তড়ক করে উঠে বসলো। একি? তুমি দিদি? এত সকালে? এখানে?

সকাল কোথায় রে! তোর দাদার দাড়ি কামান হয়ে গেল। খগেন তার বাড়ির রস দিয়ে গেল এক ভাঁড়। আমরা খেলাম। তোর জন্যে রেখেছি।

খগেন? কোন্ খগেন?

খগেন আবার ক'টা এখানে? যার কাছে মৌরল্লা মাছ চেয়েছিলি।

এসেছে? কোথায়?

অমন করছিস কেন? ওই তো।

সিদ্ধেশ্বরীর আঙুল বরাবর তাকালো শিবানী। আটো ফতুয়া গায়ে, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, উঁচু সিকের মুখ নিয়ে একজন মধ্যবয়সী লোকে আতাগাছ তলার ছায়ায় ঢুকছে। তার পেছন-পেছন সকালবেলার টাটকা রোদ অনেকটা। শিবানী কিসের যেন

আশা হারিয়ে ভাঙা মনে খাটে বসে পড়লো। কিছুই আর তার মনে নেই। একটু আগেও যেন তার মাথার ভেতর আস্ত একটা নগর সে বসাচ্ছিল। এইমাত্র তার সমস্তটাই এক মুহূর্তে কে মুছে দিল। তুমি কি করছিলে পায়ের কাছে?

এত চোরকাঁটা কেন তোর শাড়ির পাড়ে?

তাই বাছছিলে বসে বসে! তুমি আমায় বড় ভালবাসো দিদি।

একদম না হতচ্ছাড়ি। সারারাত ঘুমালি তো এত কালি কেন চোখে? একদম কাজল টেনে দিয়েছে কে?

ভীষণ ঘুমিয়েছি সারারাত।

তাই বুঝি ঠাকুরপোর কথা ভেবে-ভেবে কেঁদেছিস? আমায় লুকাবি না বলে দিলাম।

হেসে ফেললো শিবানী। তুমি না কিছুদিন কলেজে পড়েছিলে?

পড়তে দিলো কোথায় তোর ভাসুর? গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

তোমায় খুব ভালোবাসে কিন্তু। সেই অনুপাতে তুমি দিদি বড় হেলাফেলা কর কিন্তু মানুষটাকে। না-হারালে মানুষের দাম বোঝা যায় না।

কি অলুক্ষণে কথা বলছিস সকালবেলা। সধবা হয়ে ওসব কি কথা মুখে?

আমার আবার সধবা আর আইবুড়ো।

ত্যাখ শিবানী। আজেবাজে কথা বলবি না। তাহলে তোর দাদা কলকাতায় যাবার সময় আজ তোকে নিয়ে যাবে। তোর দাদাকে আমি কি ঢ্যাড়া পিটিয়ে ভালবাসবো? আমাদের ভালবাসা গোপনে-গোপনে।

এত গোপন কেন দিদি? জিনিসটা কি বাবা?

কঠিন কথা বলবি না বলে দিলাম।

এই সময় আতাতলা পেরিয়ে খগেন গিয়ে একটা ডাঙায় পড়লো। কোন এক সময় কেউ বোধহয় ধানচাষের চেষ্টা করেছিল। তখনকার শক্ত আল পাথর হয়ে আছে। আলের ওপর ছুঁচলো ডগার ঘাস। নোনা শাদা মাটি চিকচিক করছে। দশ হাতের ভেতর পাকা বাঁশের বাগান। সকালবেলার বাতাসে সামান্য ক্যাঁচকোঁচ।

খগেন এইমাত্র মেছুনীটাকে সরে যেতে দেখেছে। ধমকালো চড়া গলায়, সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয় মাগী। আমি বাপের বেটা খগেন নস্কর। কারও তোয়াক্কা রাখি নে।

খগেনের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। কখন ঠিক তার পায়ের গোড়ায় এসে হাজির হয়েছে। মাটি থেকে প্রায় আধ হাত উঁচুতে ফণা। এক্ষুণি পা না সরালে ছোবল দেবে। গায়ের রঙটি শুকনো বাঁশপাতার সঙ্গে মিশেল দিয়ে নিঃসাড়ে এগিয়ে এসেছে। যম নিজি।

জোড় পায়ে লাফ দিয়ে খগেন পা দু'খানা বেড় করে মাগী কেউটের ফণার নিচে আঘাত দিতে গেল।

পারলো না। মেছুনী বুঝতে পেরেছে—তার একটা সুবর্ণ সুযোগ গেল। এমন সুযোগ সহজে পাবে না। নোনা-ওঠা আলে ছোবল বসিয়ে আবার সারা শরীরটা নিয়ে সটকানো। এখানে নিশ্চয় কোথাও কোন লুকোনো গর্ত আছে। নয়তো—এই আছে —এই নেই—হয় কি করে?

বাঁশের কঞ্চিতে খানিক এগিয়ে জায়গাটা প্রায় দুর্গ। সব দেখা যায়। কিন্তু এগোনো যায় না। পরিষ্কার শুধু মোটা বাঁশের পাকা হলুদ দাগের নিচেটা। কিন্তু এগোনো কঠিন। ওদের কঞ্চি এসে মাথা, বুক, চোখ, গায়ে বিঁধে যাবে।

সেই সুযোগটা নিয়ে মাগী কেউটেটা দশ-বারো হাত দূরে বাঁশ-ঝাড়ের পরিষ্কার তলায় গিয়ে প্রথমে বিড়ে পাকালো। তারপর ফণাটি নাচিয়ে উঠে বসলো। এবার আয় না এখানে—

পরিষ্কার গলা শুনে খগেন একটুও ঘাবড়ালো না। সে জানে, পথিকজন ভোলাতে ওরা অবরে-সবরে মানুষের গলায় কথা বলে আকর্ষণ করে।

সাহস থাকে তো তুই বেরিয়ে আয়—মাদী কাঁচ্চিয়া।

মুখ খিস্তি করা ভোলাচ্ছি তোমায়।

থাম। অনেক দেখা আছে ওরকম।

তুই তো আমারই হাতে প্রাণটা দিবি। তার আগে বল—কোথায় আটকে রেখেছিস ওকে?

খুঁজে নে।

খুঁজে আমি বের করবোই। তারপর তোদের আমি একটা একটা করে দেখে নেব। পরিষ্কার হিসেব নেব আমি।

যা যা। হিসেব কি নিবি মাগী। তার আগেই মাছের লোভে আটলে গিয়ে ধরা পড়বি। তোর ভাগ্যে এই লেখা আছে মাগী—সারাদিন ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াস তো!

খাওয়ার জন্যেই শুধু—তো দুটো আহারের জন্য খগেন—এত ছুটোছুটি!

খগেন বাঁশ বাগানের পেছন দিয়ে যাবার চেষ্টা দেখলো। কঞ্চির নিরাপদ আড়ালে বসে মুখে মুখে তকরারি? তাও 'ক কেউটে মাগীর! বরদাস্ত করতে পারছিল না খগেন। এখন সকাল আটটা সাড়ে আটটা হবে। আজ ডাউন ট্রেন লেট। এতক্ষণে দক্ষিণ মালঞ্চে একগাড়ি লোক এসে যায়। খগেন পেছন থেকে এগোচ্ছে দেখে মাদী কেউটেটা কঞ্চির ঘন পাহারার পেছনে পরিষ্কার জায়গায় গিয়ে বসলো। ফণাটা আরেকটু উঁচু—আরেকটু বাহারী করে।

ঘুরে গিয়ে এ অবস্থায় মেছুনীকে দেখে খগেনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমি খগেন গুণীন। আমার শেকড়ে মানুষ হোক—পশু হোক—বোবা হবেই হবে। আমি পায়রা নামাই। ডাকলে বাতাস থেকে সাপ বেরোয়। আমি মেঘ মুছে দিই। অন্ধকারে

আলো আনি। আলোতে অন্ধকার। আর আমারই চোখের সামনে আমাকে নিয়ে মসকরা ?

মেছুনী তখন বাহ'রী করে ফণাটা খগেনের চোখের সামনে দোলাতে লাগলো। দুজনের মাঝখানে কঞ্চির ঝাড়। একটা বড় গর্ত। এক সময়কার আল—এখন শক্ত, পাথুরে। দৌড়ে আসতে গেলে খগেনের মাথায় নির্ঘাত বাঁশ ঝাড়ের নিচের বাঁশ লেগে যাবে।

খগেন চেঁচিয়ে বললো, ভালো চাস্ তো ধরা দে।

হঠাৎ কেন ধরা দিতে যাবো ? কোন্ দুঃখে ? আমি কি আত্মঘাতী হবো বলিচি ?

এমনিও ধরা পড়বি। অমনিও ধরা পড়বি। তার চেয়ে—

ধরা পড়তেই হবে—এমন কথা লেখা আছে নাকি ?

খগেন চুপ করে গেল। শক্ত পাথুরে একখানা ঢেলা তুলল বাঁ হাতে। কিন্তু তুলে দেখলো, এ ঢেলা তো সোজা গিয়ে মেছুনীর মাথা থেঁতলে দিতে পারবে না। পথে তিন চারটে বাঁশ। ওর মাথা ছাতু করতে হলে এ ঢেলার এঁকে-বেঁকে ছুটতে হবে। তা তো হবার নয়।

খগেন গলা নরম করে বলল, হয়রান হয়ে লাভ হবে কোন ? তার চেয়ে আয়—ধরা দিয়ে দে।

আর অমনি তুমি আমায় হাবিস করে দাও।

ও কথা উঠছে কেন ? খোলসা করে বল।

সারা তল্লাটে একটা গোসাপ দেখা যায় না এখন। তারা কোথায় ? কোথায় তাদের হাবিস করেছো ?

কেন ? খগেন নস্করকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি ?

কেন দেবে না ? পরিষ্কার করে বলো—আটল থেকে পাকড়াও করে তাকে রাখলে কোথায় ? কোথায় পাঠালে ?

মুখ ফসকে বেরিয়ে এল খগেনের—কেন ? সব হিসেব তোকে দিতে হবে মেছুনী মাগী ?

বাঃ! তোমার ইচ্ছেমতো আমাদের ধরা দিতে হবে। তোমার ইচ্ছেয় হাবিস হবো। আমরা তো আমরা—তাই না? তা আমাদের হিসেবটা চাওয়া দোষের হলো?

নে অনেক হয়েছে। দৌড়োদৌড়িতে হয়রান হয়ে তো লাভ নেই কোন। ধরা দে।

বারে খগেন! কিছুই দেখি নি ডাঙার। কিছুই দেখা হয় নি জলের। তারপর তো বাতাস পড়ে আছে। এরই ভেতর ধরা দিয়ে বসে থাকবো?

ধরা দে মাগী। আমি তোকে সবকিছু দেখাবো।

যেমন দেখাচ্ছো মদ্দাটাকে! আচ্ছা সে গোঁয়ারকে রেখেছ কোথায়? মরে যাবে—কিন্তু আপসে মিটমাটের পাত্তর নয় সে।

ভালো জায়গায় রেখেছি। চল। তুইও থাকবি তার সঙ্গে।

গোসাপরাও আছে সেখানে। তাই না?

মেছুনীর জিভ এবার দু'বার বাতাসে বেরিয়ে পড়ে খগেনকে ভ্যাংচালো। খগেন কোন কিছু বুঝতে না দিয়ে ওকে কথায় ব্যস্ত রাখল। অনেকেই আছে। আমরা থাকি।

সে তো সবাই থাকে। ডাঙা জায়গাটাই বড়। তাই না?

ভীষণ বড়।

কত বড়?

তা ধর এই আমাদের খালের চেয়ে দশ বারো গুণ বড়।

ওরে বাবা! আচ্ছা, তার বাইরেও তো ডাঙা আছে?

নিশ্চয় মাগী।

মুখ খারাপ করছ কেন সকালবেলা? এত বড় ডাঙার বাসিন্দে আমরা সবাই। তুমি। আমি। ভাবলে কিন্তু অবাক্ লাগে। কত বড় ঠিক এই ডাঙা?

তা সে অনেক খালের জলের চেয়ে বড়। কত গাছ আছে।

কোটি কোটি দুর্বো। তাদের শেকড়। বাঁচার রসও এই ডাঙা থেকেই বাজবরণ চুষে নেয়।

তুমি অ্যাত্তো জানো খগেন। আচ্ছা বল তো, জল কত বড় ?

জলও অনেক বড়। নদীতে থাকে। টিউকলে থাকে। আবার মেঘেও থাকে। ডাঙা আর আকাশের ভেতর জলের যাতায়াত। কেন ? এসব কথা কেন ? আমার ইস্কুল নিচ্ছিস নাকি মাগী ?

আচ্ছা, তুমি যে আমাদের হাবিস করে দিচ্ছে—এত সব জেনেও হাবিস করে দিচ্ছে—একবার কি পেছন ফিরে ভেবে দেখেছ ব্যাপারটা ?

ভাবার কি আছে ? তুইও থাকবি না। আমিও থাকবো না।

আমি থাকবো খগেন। তুমি দেখে নিও। এত বড় ডাঙা, জল, আকাশ ছেড়ে আমি অত তাড়াতাড়ি যাচ্ছি নে।

হ্যাঁ। তুমি বাঞ্চোত থাকবে না তো কে থাকবে ? আমরা মানুষ। আমাদের ইতিহাস পুরাণ আছে। আমরা চলে গেলে একটা করে দাগ পড়ে ডাঙার গায়ে। বড় দাগ যার—সে হয় কেউকেটা।

আর আমরা হলাম গে কেউটেটা !

এই তো ধরেছিস। তা হলে তো গোসাপ, বিষ পিঁপড়ে, দুব্বো ঘাস, গোখরো, ব্যাঙ—সবার কথাই রাখতে হয় পুরাণে—গানে। অত দাগে ডাঙার গা ভরে যাবে। আয়, ধরা দে।

সেই এক কথা। আচ্ছা, আকাশ তো তা হলে সবার চেয়ে বড়।

তা তো হবেই। বাতাস দিয়ে তৈরি আকাশ। আমাদের এতগুলো প্রাণীর নিঃশ্বেস। তা ছাড়া সবাই আমরা শেষবারের মতো পুড়ে গিয়ে ওখানেই গিয়ে তো জমা হই। জায়গা লাগবে না আকাশে ?

খগেনের একথায় কিছু ছিল। বাতাস থেমে গেল। কিন্তু এক

হাবা ফড়িং ফর-র-র করে উড়েই যাচ্ছে। কঞ্চিঘেরা ছোট্ট আকাশ-টুকুর ভেতর।

লেট করে ডাউন ট্রেনগুলো এসে একে একে দাঁড়াচ্ছে এখন। দক্ষিণ মালঞ্চের দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে বোতলের জল ফিরি হচ্ছে—চাই জল-অ্—

বেলা বাড়ছে আর রোদও কড়া হচ্ছে।

মেছুনীর কথায় বেশ বাঁধুনি আছে। খগেন এবার মিষ্টি গলায় বলল, চলে আয়। কোন ভয় নেই। আমার এই ডান হাতখানায় ছোবল দে।

দিতাম। অনেক আগেই দিতাম খগেন। কিন্তু দিয়ে কোন লাভ নেই। তোমার শরীরের ওই কুঠো মাংসে বিষ এগোতে পারবে না।

ঢেলেই ছাখ না। নিতেও তো পারে!

কেন মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছ? যাও না-ঘরে গে ঘুমাও—নয় তো খেলাধুলো করো।

এই তো আমার খেলাধুলো। এই যে তোর সঙ্গে আছি। আয়। আমার হাতে এসে বোস।

আমি তোমার ময়না!

খগেন এবার আঁষটে গন্ধের মেছুনী কেউটেটাকে কঞ্চির দুর্গের বাইরে আনার একটা মতলব বের করল। চন্দ্রবোড়াটি মরেছে অপঘাতে। তার কঙ্কালটা এখনো পাশেরই ওই পোড়ো পাঁজার গায়ে ডোবাটার সামনে পড়ে আছে।

পরিষ্কার দিনের আলোয় খগেন মনে মনে আদর জানিয়ে তিন বার ডাকল। আয় রে চাঁদবুড়ো—আয়—

চাঁদবুড়োর চেহারাটি তো দশাসই ছিল। নিজের কল্পনাতেই খগেন তাকে দেখতে পাচ্ছিল। জোর ইচ্ছে একত্র করলে তবে এক একটা জিনিস বাতাস ফুটো করে বেরিয়ে আসে—চেহারা পায়।

ট্রেনের গোলমাল, বাতাসে বাঁশ বাগানের ক্যাঁচকোঁচ, ফড়িংটার ফর-অর-র-র— ।

এত শব্দের ভেতর খগেন অনেক কষ্টে নিজের ইচ্ছেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করল। তারপর ভাবলো, চাঁদবুড়োর কঙ্কালে সর্বত্র নতুন টাটকা মাংস লেগে গেছে। তার ওপর সুন্দর পালিশের শাদা কালো কলটানা চামড়া। চ্যাটালো থাবার চেয়েও বড় ফণা।

অপঘাতে সাবাড় সেই চাঁদবুড়ো খগেন নস্করের ইচ্ছেয় একদম বাঁশ বাগানে এসে হাজির। দিনের আলোয় টাটকা শরীরখানা একদম চকমক করছে। নতুন শরীরের এত জৌলুস।

চাঁদবুড়োকে দেখে তো মেছুনীর চক্ষুস্থির। এত রূপ। এত শক্তি। এত ঝাঁঝ—

সে প্রায় শঙ্খ লাগে গিয়ে।

মেছুনীর অবস্থা দেখে খগেন মনে মনে খুব একচোট হাসছিল। চাঁদবুড়ো পাকা বাঁশের গা দিয়ে পুরো শরীরটা তুলে দুধারে ঝুলিয়ে দিল প্রথম। ভাবখানা—ছাখো। আমার শরীর ছাখো আগে। তাতে মজলে তো ভাল। নয়তো এর পরে শঙ্খ লাগবো। গায়ে গা। লেজে লেজ। আষ্টেপৃষ্ঠে।

কিন্তু এই সময়টাতেই খগেনের ভয়। মেছুনী যা ধড়িবাজ— তাতে শঙ্খ হবার সময় তার নিজের গায়ে আরেকখানা গা লেগে যাওয়া দরকার। কিন্তু নতুন শরীরের এই চাঁদবুড়ো তো তা পারবে না। ওর তো শরীরই নেই। সবটাই খগেন নস্করের ইচ্ছেয়। প্রবল ইচ্ছেতে ওর শরীর।

চাঁদবুড়ো বাঁশের গা বেয়ে অনেকটা শূন্য থেকে ধপাস করে মেছুনীর কঞ্চির দুর্গের ভেতরে পড়ল। অমন সুন্দর শরীরটায় ধুলোর পাউডার লেগে যাওয়ায় মাদী কেউটেটা আর চোখ ফেরাতে পারছিল না। সে ফণা নামিয়ে চাঁদবুড়োর দিকে এগিয়ে এলো।

অ'ব অমনি খগেন নস্কর চাঁদবুড়োকে কঞ্চির আওতার বাইরে আকর্ষণ করতে লাগল।

খুব আস্তে। মেছুনী যাতে টের না পায়—যে সে নিজের অজান্তেই নিজের দুর্গের বাইরের বিপদে গিয়ে পড়ছে।

চাঁদবুড়ো পাকা খেলুড়ের কায়দায় এক ফণা এগোয় তো—দু ফণা পিছোয়। মেছুনী যত তাকে ছুঁতে চায়—ততই ছুঁতে পারে না। একটুব জন্যে চাঁদবুড়োর পাকা চামড়ার চকচকে শরীরটা পিছলে যায়। এই করে করে আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের চেষ্টায় খগেন যখন চাঁদবুড়ো সমেত মেছুনী মাগীকে কঞ্চির বাইরে প্রায় এনে ফেলেছে—ঠিক তখনই—

ও খগেন! তুমি এখানে?

খগে.নর জড়ো করা সব ইচ্ছে এক ঝাঁকুনিতে আছাড় খেয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ই.চ্ছয় তৈবি কবা চাঁদবুড়োটি বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর মেছুনী তো রে.গ অস্থিব। তার তখন আগুন ওঠা শবীর। এ কি করলে খগেন? এত বড় ঠাট্টাটা না কবলেও পারতে।

খগেনের চোখেব সামনে মেছুনী কেউটের সেকি দাপাদাপি! লম্বা একটা ফণা তুলে নিজেই নিজের শরীরের পেছনের আধখানা ধুলোর পাউডারে আছড়ে ফেলল। কাল.চ আংটি-আংটি দাগ-গুলো ধুলোয় মাখামাখি। ঘন ঘন জিভ বেরিয়ে আসায় সেখানেও মিহি গুঁড়োর ধুলো লেগে গেছে।

এ সময়টায় দক্ষিণ মালঞ্চের মাটি ফেটে গিয়ে শাদা নোনা ফোটে।

কিন্তু এসব দিকে তার তাকাবার ফুরসত নেই এখন। শঙ্খ লাগার ইচ্ছেটা খগেন নিজেই চাঁদবুড়ো হয়ে জাগিয়ে তুলেছিল। গোড়ায় নিজির শরীরে। তারপর শরীর স্বাদে মেছুনীর গায়েও সে-আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। এইভাবেই খগেন কেউটে মাগীকে কঞ্চির দুর্গের বাইরে টেনে এনে ধরে ফেলার চেষ্টায় ছিল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়টাতেই—

ও খগেন। তুমি এখানে?

আপনি? তুমি? এলে কি করে?

শিবানী বলল, কেন? বড়দা অফিস চলে গেল। দিদি বাথরুমে। চলে এলাম খাল পেরিয়ে।

তোমার এ রকম আসা ঠিক হয় নি সুমতি।

আমায় একটা নতুন নাম দিলে তুমি!

খগেনের নিজের ইচ্ছেয় তৈরি সেই আগুনটা এখন বহু বছর পরে তার নিজের শরীরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল।

মেছুনী তার নিজের দুর্গের ভেতর শখের ইচ্ছেয় আরেকবার আছাড় খেল। শরীরের অনেকটা ওপরে তুলে। শিবানী তাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ওবে বাবা—

মেছুনী থেমে পড়ে ধুলোমাখা চোখে খগেনের দিকে তাকাল। ইটি কে?

খগেন কোন কথা না বলে সারা শরীরের আগুন সমেত কঞ্চির পরোয়া না করেই সবকিছু ভেঙে মাড়িয়ে এগোতে লাগল। একটা মেছো কেউটেনীর এত বাড় ভাল নয়।

করছ কি? ও খগেন? কামড়াবে তো—

কামড়াক না। কত সাহস দেখি।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মেছুনী নিজেই সাত তাড়াতাড়ি পাথুরে আলে একটা প্রাচীন গর্ত খুঁজে নিয়ে ঢুকে পড়ল। আরেকটু হলে খগেন অন্তত লেজটা ধরতে পারত। মেছুনীরও অজানা গর্ত। সারা শরীরটা সেঁধোবে কিনা জানা ছিল না। গর্তের গা এবড়ো-খেবড়ো। এখনো ভাপে তেতে ওঠে নি। শরীরে আগুন ছিল মেছুনীর—তাই। নয়তো শরীরের অনেকটাই গর্তের দেওয়ালে ছেঁচড়ে গেল।

গর্তটা ভালো করে ঢেকে রেখে খগেন যখন শিবানীর কাছে

ফিরে এলো—তখন কঞ্চিতে তার ফতুয়া খানিক ছিঁড়েছে। মুখখানা লালচে। শিবানী খগেনের ঝিক তোলা মুখখানায় কী দেখল কে জানে? ছুটি করমচা ভ্রূ। শক্ত সবল হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা। বুকখানা ন'-চওড়া, না-কাবু। চোখে সারা মাঠঘাটের তাবৎ দুব্বো ঘাসের সবুজ। কে বলবে—এই মানুষটির সঙ্গে তার কোন পরিচয় ছিল না কোনদিন—বিশেষ করে এভাবে সে যে কেন খাল পেরিয়ে এল—তা নিজেই জানে না শিবানী।

একি করেছ সারাটা শরীর। কাছে এসো।

বিপিন বসুর ছোটভাই অফিস থেকে ফিরলে শিবানী বসু ঠিক এই বাংলায় তার শার্টের টাই খুলে দিত। তখন জামাকাপড়ে সে পুরুষালি গন্ধের জন্যে উৎসুক হয়ে থাকত। মানুষের ইচ্ছে উবে যাওয়া যে কী বিচ্ছিরি রোগ।

খগেন এগিয়ে আসতেই শিবানী দিব্যি তার গা ঝেড়ে দিতে লাগল দু-হাতে। সে তার বড় জায়ের কাছে শুনেছে—গাঁ দেশে একটু বেশি কম বয়সেই বিয়ে-থা হয়। তাই তিন তিন ছেলের বাপ হয়েও খগেন মানুষটি জোয়ানটি। একটু ভবভুলে।

সুমতি। তোমার এভাবে খাল পেরোনো উচিত কাজ হয় নি।

তুমি যদি ও নামে ডেকে সুখ পাও তো পাও। আমার কোন আপত্তি নেই।

চড়া রোদে বাঁশ বাগানের হাওয়া বোলানো ছায়ার আলাদা একটা আকর্ষণ আছে। তার ভেতর দিয়ে খগেন শিবানীর দু-কাঁধে হাত রাখল।

এখানে কেন আসা? ভয় করে না?

শিবানী সরাসরি খগেনের সবুজ চোখে তাকাল।

কোথায়? দক্ষিণ মালঞ্চে?

না। এখানে।

এখানে কিসের ভয়। এখানে তো তুমি আছো খগেন।

খগেনের দু-খানা হাত তখনো শক্ত করে শিবানীর দুটো কাঁধ ধরে ছিল। খারাপ লাগছিল না শিবানীর। পায়ের নিচে পাউডার ধুলোয় শুকনো বাঁশ পাতা সরে সরে যাচ্ছিল। গায়ে লাগছিল সবুজ শক্ত ধাপালো বাঁশ পাতার ছোঁয়া। খগেন প্রায় উনিশ বছর আগে শেষ চুমু খায় বেস্পতিকে।

আজ সে নিজেই নিজের ইচ্ছে হয়ে চাঁদবুড়োর অলীক শরীরে শঙ্খ লাগার ইচ্ছে জাগিয়েছিল। এই তো খানিক আগে। সেই ইচ্ছের আগুন এখন আর অলীক নয়। কেননা, তার নিজের একটা শরীর তো আছে।

অনেকটা ঝুঁকে শিবানীর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল খগেন।

শিবানী এই প্রথম খসখসে আতার পাতায় সবুজ অথচ বুনো স্বাদ পেল। তাতে ভর্তি ইচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শিবানী দু-হাতে ভীষণ জোরে খগেনকে জড়িয়ে ধরল।

এদিকটা বহুদিনের বাতিল ইটখোলা। পোড়ো জায়গায় অযত্নের গাছ সব। কিন্তু বেশ ঝাঁকড়া। তাতে লতাপাতা। পাশাপাশি কিছু ছায়া। মাটির উঁচু ঢিবি। শেয়ালের চিবোনো মাংসহীন বড় সাপের মাথা। কয়েকটা বৃষ্টিতে ধুয়ে ধুয়ে একদম শাদা। শিবানী সেই পাউডার ধুলোয় শুয়ে পড়ে খগেনকে টানল। খগেন নিজের জাগানো শঙ্খ আগুনে নিজেকে সেঁক দিচ্ছিল এতক্ষণ। এবার সে বুঝল—নানা প্রাণীর নিঃশ্বেস দিয়ে তৈরি যে বাতাস—তা কম পড়লে আকাশটাও ফাঁকা লাগে।

এই উনিশ বছরে ভুলে-যাওয়া সব জিনিস খগেনকে একে একে মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল শিবানী। সব ভুলে যাওয়া চক্র। দাড়িবাবা ডুরে শাড়ির আঁচলটা সরিয়ে দিয়ে ডোমনীর মুখে বোতলটা দিত। আবার নিজেও নিত। ডোমনীর বুকে বসে। বাঁ হাতে নদীর আকাশের মেঘ মুছে দিয়ে ডান হাতে সেখানে দুটি কি তিনটি তারা বসিয়ে দিত।

খগেন উঠে বসে বলল, এখানে এলে কেন ?

তোমার সেই ধরা সাপটা মেছলার ভেতর ভীষণ দাপাচ্ছে।

দাপাবেই তো।

ঘরে বসে সে আওয়াজ শোনা যায় না। শিবানী একটু থেমে বলল, তুমি এসব ধরাধরি ছেড়ে দিলে পারো।

এটাই তো আমার কাজ সুমতি।

ভালো কথা—যখন শুধু তুমি আর আমি থাকবো—তখন আমায় সুমতি বলেই ডেকো।

এই মাত্তর একটা পাপ হয়ে গেল। তাই না ?

পাপ কিসের ? এরকম তো হয়ই মানুষের। তারপর দুজনে হাঁটতে হাঁটতে যখন আবার খালপাড়ে এসেছে—তখন শিবানী আবার বলছিল, এই ধরাধরি না হলেই না ?

তোমার বটঠাকুরকে বলো না। আমি চাইলাম পয়সা—নিজির এলেমে পয়সা। তা আমি তো আর কিছু শিখি নাই। তাই—এই—এই ধরিয়ে দিল বিপিনবাবু। এই আমার সই—!

শিবানী নিচু হয়ে বলল, তোমার পায়ের পাতা দুটি বাঁকা বুঝি ?

হ্যাঁ। কেন ? তুমি জানতে না সুমতি ? আমি তো ভালো করে বীজ ভাঙতে পারি নি তোমার চাষে। তাই শেষদিকে আমায় সর্দার চাষী করে দিলে তুমি। তদারকি দিয়ে। মনে পড়ে না কিছু ?

কি বলছো খগেন ? আমি বুঝতে পারছি না কিছু।

কিছুই মনে পড়ে না তোমার ?

নাঃ। কি মনে পড়বে ?

একটা পাকুড়তলা। পেরিয়ে গিয়ে মাটির দু দল ভেঙে পড়েছে।

কিচ্ছু মনে পড়ছে না আমার। তবে—

কি সুমতি ?

খগেনের উৎসুক চোখে তাকিয়ে শিবানী বলল, ভোরবেলা

ঘুম ভাঙলে মনে হয়—খানিক আগেও আমার মাথার ভেতর একটা নগর বসেছিল। অনেক লোকজন। চোখ চাইতেই সব মুছে গেল।

শিবানী বুঝলো, মানুষের মুখেও মেঘের মতোই ছায়া পড়ে। হতাশার। অনিচ্ছার। আনন্দের। খগেন এখন রীতিমত ম্রিয়মাণ। চোখ নামালো।

এই শিবু? ওখানে গেলি কখন? চলে আয়।

খগেন আর শিবানী একসঙ্গে চমকে উঠল। খগেন তাকাতেই সিদ্ধেশ্বরী রীতিমত চড়া গলায় বলল, তোমার তো বয়স হয়েছে খগেন। বাবুর ভাইয়ের বউকে যেতেই বা দিলে কেন ওখানে?

কি হয়েছে দিদি?

শিবানীর একথায় কান না দিয়ে খগেনের মুখে খালের ওপার থেকে কৈফিয়ত চাওয়ার ধাঁচে তাকিয়ে আছে তার বড় জা—শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী বসু। বাঁজা। বিয়ে হয়েছে তা ষোল-সাতেরো বছর।

আট

মেছলার ভেতর মদ্দা কেউটেটা ভয়ঙ্কর দাপাচ্ছিল। এক পূর্ণিমা ঘুরে আর আরেক পূর্ণিমা এসে গেল। সেই সঙ্গে কিছু মেঘ। কিন্তু তারা বৃষ্টি দেয় না। অথচ মাঠে খুব জল দরকার। বেটে জাতের ধানে এখন বিশেষ করে জল রাখতে হবে। নয়তো ধান চিটে হয়ে যাবে।

বাবু বিপিন বসুর ঘুম ভেঙে গেল খুব সকালে। কাল রাত থেকেই তিনি চিন্তিত।

এক নম্বর কারণ, খালে জল কমে এসেছে। অথচ এখনো অন্তত তিন হপ্তা জল চাই ক্ষেতে।

দু নম্বর কারণ, মেছলায় আটক মদ্দার বিষ এর ভেতর দু-বার ঝাড়ানো হয়েছে। খাবার-দাবারও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ও মেছো কেউটে পোষ মানার নয়। কয়েকবার খগেনকে ব্যাপারটা বলেছে বিপিন। খগেন কানে নেয় নি। তার কথা একটাই। বিষ তো দিব্যি বেচে দিচ্ছো। থাক না ও মেছলায়। ও না থাকলে মাদীটাকে ধরা কঠিন হবে। কোন হদিসই পাওয়া যাবে না।

কেন? পাকা চামড়ার মাল তো। চালান করে দিলেই হয়—

তাহলে মাদীটা তুমিই ধরো বিপিনবাবু। আমি বিদেয় হই।

ওভাবে সব কথা ধরিস কেন খগেন? একটা বন্দী বিষধর—সারা দিনরাত ফুঁসছে—তাকে পাশে রেখে ঘুমোনো যায়?

আর ক'টা দিন ছাখো না।

বিপিন বসুর দুশ্চিন্তার আরও বড় কারণ হলো—মাদীর খোঁজে ঘুরে ঘুরে খগেন নস্কর চোখের সামনে দিয়ে কালচে, কালনাগিনী গেঁড়িভাঙা, চন্দ্রবোড়া—সবাইকে সটকাতে দিচ্ছে—আর মাদীটা ওকে লেজে নাচাচ্ছে। এভাবে কি বিষের ব্যবসা—চামড়ার ব্যবসা

হয়? সে কথা বললে খগেন আরও বিগড়ে যায়। অথচ বেশ কিছু নগদ টাকা আগাম খেয়ে বসে আছে বিপিন। তাই তাকে কলকাতার তাগাদাও খেতে হচ্ছে।

এর ভেতর সিদ্ধেশ্বরী এক নতুন ফ্যাকড়া তুলেছে। সে গভীর রাতে উঠে দেখেছে—শিবানী বিছানায় নেই।

যতসব গাঁজাখুরি। বাঁজা মেয়েমানুষের পেটে পেটে এত সন্দেহ থাকলে জীবন তো অতিষ্ঠ হবেই। তার ওপর সিধু আবার অনিদ্রার রুগী। বিপিন বলেছে, তোমার চোখের ভুল সিধু। হয়তো বাথরুমে ছিল শিবু।

না, না। আমি সারা বাড়ি আঁতিপাতি করে খুঁজেছি শিবুকে।

ওই নিশুতি রাতে?

হ্যাঁগো। আমারই ছোট জা। মনের কষ্টে আছে। আমাকে দেখতে হবে না?

তোমার চোখের ভুল হতে পারে।

একদম না। শিবু ফিরে আসে ভোর রাতে। ছাখো নি? শাড়ির পাড়ে কত চোরকাঁটা বিঁধে থাকে।

সে তো দিনের বেলায় ঘোরাঘুরির জন্যেও হতে পারে।

কক্ষণো না। আরেকটা কথা। তোমার ওই খগেন নস্করের ভাবগতিক ভালো নয় কিন্তু।

মন থেকে সন্দেহটা তাড়াও সিধু। খগেন এমনিতে দেবতুল্য লোক। আর মেয়েছেলের দোষ এ বয়সে হয় না পুরুষের।

পুরুষ লোক আমি জানি। অত ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

তা ছাড়া শিবু আমাদের কলেজে পাস মেয়ে। তার স্বামী শহুরে তুখোড় পুরুষ। ওদের পাশে খগেন! তুমি পাগল হয়েছো সিধু?

আমি পাগল! বেশ, তুমি দেখো কী হয়।

এইসব কাণ্ডর সঙ্গে রোজ সকালে একটি সূর্য ওঠে। তার কাজ শুধু দগ্ধানো। টাকার তাগাদা। ধানের জলের চাহিদা। মন্দা কেউটের দাপানো। সেইসঙ্গে ভ্যাপসা গরম। বৃষ্টির দেখা নেই। শিবানীকে নিয়ে যেতে কলকাতা থেকে ভাইটাও আসে না। তারপর আছে সিদ্ধেশ্বরীর সন্দেহ। শিবুর শাড়ির পাড়ে চোরকাঁটা। নিশুতি রাতে উধাও। সেই মাদীর খোঁজে একবগ্‌গা হয়ে খগেনের খালপাড় তোলপাড়। সকাল নেই। সন্ধ্যে নেই। দিন নেই। রাত নেই। অথচ ভালো ভালো মালদার বিষধর চোখের ওপর দিয়ে কেটে যাচ্ছে। এর নাম ভাগ্য!

ঘুম থেকে উঠে বিপিন বসু দেখলো, সিদ্ধেশ্বরী তখনো ঘুমে। ভারি চোখ। সুন্দর চিবুক। কনুইতে বয়সের কোন দাগ নেই। খুব সামান্য শব্দ করে নিঃশ্বাস ওঠে পড়ে। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ভীষণ বেশি করে নেল-পালিশ।

দক্ষিণ মালঞ্চের ভোরবেলার বাতাসে শীতকালের ঠাণ্ডা থাকে। ভাসুর হয়ে ভাদ্রবউয়ের ঘরে উঁকি দেওয়া যায় না। সত্যিই কি শিবানী রাত-বিরেতে বেরিয়ে পড়ে? অসম্ভব। আর শহরের দু-দুটো পাস দেওয়া মেয়ে শিবানী—সে তো দু-চারখানা কথা বলবেই খগেনের সঙ্গে। এসবই খারাপ লেগেছে সিধুর চোখে।

বিপিন খালপাড়ে উঠে দেখলো, খগেন কখন তার কাজে এসে লেগে গেছে।

খালের জলের কিনারায় নানা সাইজের ঘোগ্। নরম, ঠাণ্ডা মাটির গর্ত। বর্ষায় জলের নিচে পড়ে যায় এসব ঘোগ্। খগেন ভোরবেলাতেই কল্কে ফুলের মালা গলায় দিয়েছে। কপালে কালচে কিসের তেলক। চোখ চাইতেই লক্ষ্য করলো, ভোর-ভোর খগেন কাজলও দিয়েছে চোখে।

আজ কিসের পুজো রে খগেন?

কোথায় পুজো?

তাহলে ?

খালের জলে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের গলার মালার দিকে তাকিয়ে খগেন বলল, এসব ? দিলাম নিজিকে উচ্ছুগ্য করে।

কার কাছে উৎসর্গ করলি ?

মা মনসার দুয়োরে। মাকে বলি—আর কত ঘুরোবে মা ? আমি তো আর পারি নে। তোমার দলবল দিয়ে আমারে কাটো। আমি ফুটে যাই মা।

ওকি অলুক্ষুণে কথা খগেন। এখনো কত কাজ বাকি তোমার।

সব হবে বিপিনবাবু। কোনো চিন্তে কোরো না। ও মেছুনী এবার আমার কোঁচড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এই কথা তো তুই মাসখানেক ধরে বলে আসছিস।

এবার ওর ধরা পড়ার সময় হলো। তুমি বরং পুরুষটারে খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখো। ওর বিবির দেখা করাবো আমি বলে দিলাম।

তোর চোখের সামনে দিয়ে কালাচ, কালনাগিনী, শামুকভাঙানী লেজ নাচিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের দিকেও তো তাকাবি খগেন। নয়তো কারোবারো চলে কিসে ?

তবে এ কারোবারো তুলে দাও।

তাই বলিছি আমি ?

ওদের কথা ভাবো কেন ? একদিনে তিনটে চারটে করে ধরে দেব দেখো।

ধরলেই ভালো।

বিপিন খালপাড়ে দাঁড়িয়ে একটা জিনিসের আন্দাজ নিতে থাকে। এ খালপাড় চুয়ান্ন বিঘে বারো কাঠা তিন ছটাক। সেই কোন্ কোম্পানির আমলে কাটা। চওড়ায় জায়গায় জায়গায় শ' ফুটের ওপর। এই খালপাড় গিয়ে শেষ হয়েছে আরেকটা খাল এসে এ-খালের সঙ্গে মেশার জায়গায়। তাও মাইলখানেক হবে।

তারপর আবার কোম্পানির বাঁধ। খালের কাটা মাটি উপুড় করে ফেলে এই বাঁধ। বর্ষায় এক চেহারা। শীতে আরেক। সকালে এক রকম। বিকেলে আরেক রকম।

আরেকটা খাল এসে যেখানে মিশেছে—সেখান থেকেও খগেনদের ঘরবাড়ি অন্তত মাইল দেড়েক। একটা পথ রাত-বিরেতে পার হয় কি করে শিবানী? এসবই সিধুর মাথায় গজানো কেচ্ছা। দিনের বেলাতেই একটা মেয়ে রোদ মাথায় দিয়ে এতটা পথ কাবার করতে পারে কখনো?

বিপিন বসু দেখল, আরেকটু ঘুমোলে শরীরটা আরও তাজা হয়ে যায়। সে ফিরে গিয়ে আবার সিধুর পাশে শুয়ে পড়ল।

খগেনের চোখে ধুলো দিয়ে মেছুনী তখন জলের কিনারা ধরে ধরে ফিরছিল। বেরিয়েছে রাত থাকতে। আহারের যোগাড়ে। তিনখানা মাঠ, দুটো আতাগাছতলা, একখানা পোড়ো পাঁজা আর একটা খাল এলোপাথাড়ি খোঁজাখুঁজি করে নিজের জন্যে জোটে দুটি কচি ব্যাঙ, একটি উচ্চিংড়ে। ফসকে গেছে তিনটি ব্যাঙের ছানা। দুটি বড় আকারের ভুঁইপোকা। ওরই ভেতর একখানা গোঁড়া ধুমসো বাঁশ-পোকা অনেক কষ্টে কাবু করেছিল মেছুনী। সেটাকে আধো-জ্যান্ত অবস্থায় মুখে করে বিপিনবাবুর গো হালে যেতে হয়েছিল তাকে। মেছোটা গভীর রাতেও ফুঁসছিল। তার গায়ের গন্ধ পেতেই একদম চুপ। মেছুনী চারদিক ঘুরে ঘুরে একটা ফাঁক পায়। এখান থেকেই বোধহয় বিপিনবাবুরা আহার যোগায়। সেই ফোকরে আধো-জ্যান্ত ধুমসো পোকাটাকে চেপে ধরতে হয়েছিল মেছুনীর। মেছোর সাধের খাবার কি কি, সে তা জানে। ধুমসো তো নামার পাত্তর নয়। তাকে চেপে ধরে হড়কে নিচে ফেলতে হলো। ওপর থেকে মেছো বলে, তুমিও এসো।

আ মরণ! আমি যাই কি করে? তোমার বেরোবার রাস্তা

তো একদম বন্ধ হয়ে যাবে তা হলে। বাইরের খবর একটাও পাবে না তখন।

আসলে তুমি আমার সঙ্গে একত্রে মরতে ভয় পাও।

একসঙ্গে এতদিন বাঁচলাম। তাতে তো ভয় পাই নি। মরতেও পাবো না। যদি বলো মেছলার ভেতরে যেতে—যাবো আমি। কিন্তু তাতে কি তোমার কোন উপকার হবে?

সে আমি বুঝবো। তুমি চলে এসো। কতদিন আর একা একা থাকবো বল তো।

আমি তো সারা দিনরাত কাছাকাছিই থাকি। বেশ। বলছ যখন যাবো। তবু একটা রাত সময় দিলাম—ভালো করে ভেবে ছাখো—আমার কি মেছলায় গিয়ে ঢুকে পড়া ঠিক হবে?

ভেতর থেকে ভারি গলায় পোকাটা মুখে নিতে নিতে মেছো বলল, আচ্ছা। ভালো করে ভেবে দেখি।

মেছুনী এসব কথাই ভাবতে ভাবতে ফিরছিল। জীবনটা কী হয়ে গেল। একদিন বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যেয় আমরা দুজন মাছ খেতে নেমেছি খালে। কী আর এমন খাই আমরা। এই চুনোচানা আর কি। ডাঙা এক বিরাট জায়গা। আমাদের কোন গর্তই ডাঙাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করতে পারে না। জলই বা কত? এই যে খাল সাঁতরে ওপারে যাই। ওপারে গিয়ে আবার জলকে পাই। দীঘিতে। ডোবায়। বর্ষায় আকাশ নিজেই জল দেয়। আকাশ কীভাবে বাতাস দিয়ে সারা চরাচর—ডাঙা, জল, পথঘাট, ইটের পাঁজা ধরে আছে। সেই পূর্ণিমার রাতেই এই মানুষটা আমাদের আলাদা করে দিল।

এই খগেন নস্কর।

খগেনের ঘুম নেই। ভয় নেই। ক্লান্তি নেই। ও আসলে জোয়ান নয়। বুড়ো নয়। মানুষ নয়। ও যে আসলে কী—তা আমি জানি নে। তবে এটুকু জানি—আমাদের ছন্নছাড়া করে দিয়ে

ও দিব্যি ফুর্তি করে যাচ্ছে। এই তো সেদিন। ওই বাঁশবাগানে।

খগেন তখন জলের কিনারায় ঘোগের মাথার ওপর ঘাস আর কাঁটা বাবলার গুঁড়িগুলো ছুঁচলো চোখে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। একটা পূর্ণিমা, একটা অমাবস্যা পেরিয়ে আবার পূর্ণিমে এসে গেল। এত বিষ কোথায় ধরে রাখবে মেছুনী? ধরে রাখা তো সম্ভব নয়। ধরে রাখলে মাথা ছিঁড়ে পড়বে। সে মাথা তুলে কাউকে ভয় দেখাতে পারবে না। চলাফেরাই করতে পারবে না।

নিশ্চয় কোথায় বিষ ঢেলেছে।

কিন্তু কোথায় ঢালতে পারে মাগী? কাছেপিঠে কাউকে তো সাপে কাটে নি। কোন গরু ছাগলও বিষে নীল হয়ে জিভ কেলায় নি। অবিশ্যি দক্ষিণ মালঞ্চের ধর্মের ষাড়টার পায়ে ছোবলালে মেছুনীর মুখখানাই থেঁতো হয়ে যাবে। এত চর্বি—এত পুরু চামড়া। চোখে এত ঘন কাজল। গায়ের এঁটুলিগুলো রক্ত খেয়ে ঢোল। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পরোয়াও নেই। দক্ষিণ মালঞ্চের সাক্ষাত বিবেক।

কোথায় বিষ ঢাললি রে মাগী? বলতে বলতে জল ভেঙে এগোচ্ছিল খগেন—আর বাবলা গাছের গুঁড়িগুলো দেখছিল।

ঠিক এই সময় মেছুনী আর থাকতে পারলো না। একেই রাত জাগা শরীর। মাঠে মাঠে কম ধকল যায় নি আহার যোগাড়ে। তারপর এই ঠ্যাকার দিয়ে দিয়ে কথা। মেছুনী তার এই পূর্ণিমার বিষে ভারি মাথাটা নেশার ঝোঁকে পুরো মেলে ধরল। এই তো আমি। সাপ হয়েছি—বিষ ঢালবো না?

খগেন মাথা ঠাণ্ডা রাখল। এ হলো গিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো যম। সে নিজেও তৈরি হয়ে এসেছিল। কপালে ব-পুষ্পের তেলক। চোখে কলাপাতায় তুলে রাখা কাজল। গলায় উচ্ছুগ্যের কলকে ফুলের মালা। হেসে বলল, চেহারা ছিরি তো বেশ বাহারের করেছিস।

মেছুনী ক্ষেপেই ছিল। বিষ ঢালাঢালি নিয়ে অত কথা কিসির? আয়। সামনাসামনি আয়। বাপের ব্যাটা হোস তো এগো—

আচ্ছা! তু কিস্তি বিষ ঢাললি কোথা?

সে খবরে তোর কি হারামজাদা?

মুখ খিস্তি করছিস কেন সকালবেল? কার ঘরে যমকে ডাকলি —তাই শুধোচ্ছিল ম।

ইচ্ছে ছিল—তোর ঘরে যম নামাই। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো কোথায়?

তাহলে বল পাতিঘাসে ঢেলেছিস?

যেখানেই ঢালি।

কথায় ব্যস্ত রেখে খগেন চোখে চোখ রাখলো মেছুনীর। কাজল টানা এ চোখের মায়ায় নির্ঘাত ভুলবে মাগী। তারপর বিষের একটা ঘোর আছে সারা শরীরে।

ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! শেষে পাতিঘাসে! নয়তো বাবলার গুঁড়িতে—

কেন? তোর ফুর্তির মেয়েমানুষের শরীরে ঢালি নি বলে দুঃখু করছিস?

ফুর্তি? ফুর্তি দেখলি কোথায়?

বাঁশবাগানে সব দেখিছি আমি।

ওই শুকনো গর্তে বসে বসে। তোর চোখও বটে মাগী।

তুই তো সেদিন মিছিমিছি আমার শরীরটায় শঙ্খ জাগালি। ইচ্ছের আগুনটা জ্বেলে দিয়ে নিজ্জির বানানো চন্দ্রবোড়া হাবিস করলি। আর সেই অবস্থায় আমার মতো সামান্য একটা সাপকে তাড়া করে নিজ্জি শেষে শঙ্খ হলি! ছি, ছি, ছি! ভেবে ছাখ একবার—কি করেছিস তুই?

আমার খুব অন্যায় হয়েছে। ঘাট মানছি। আয়। ধরা দে।

তা তো দেবোই! ধর। ধর আমারে।

খগেনের হাঁটু বরাবর প্রমাণ সাইজের মানুষের চেটোর সমান রাহারী ফণাটা নেমে এলো।

খগেন সামান্য সরে গেল। মেছুনীর ফণাটা নরম মাটিতে গেঁথে গিয়েছিল প্রায়। প্রাণের মায়া বড় মায়া। মাগী সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়ে ফণা পিছিয়ে নিল। মুখের গোড়ায় পাঁক মাটি। তাতে চেরা জিভখানা বেরোবার পথ পায় না।

খগেন খপ করে ধরতো। কিন্তু একটুর জন্যে পারে নি। চেঁচিয়ে বলে উঠলো, শেষ অব্দি পাঁক মাটিতে অমন দামী গরল ঢাললি? কী জিনিসের কী ব্যবহার!

মেছুনীর ঘোর লাগা মাথাটা তখন খানিকটা হালকা। ঝরঝরে। হাসতে হাসতে বললো, জষ্ঠি মাসের পূর্ণিমেতেও যে এমন বিষ জমে তা জানা ছিল না খগেন।

আমিও কি জানতাম তোদের ধরে ধরে একদিন চালান দেব!

ই চ্ছুই যদি না থাকে তবে দিস কেন?

তোদের বিপিনবাবুকে শুধো।

শুধোবো কি! সোজা গিয়ে মাঝরাতে পালঙ্কে উঠবো। আর নেমে আসবো। বর বউ ঘুমের ভেতর ঢলে পড়ে থাকবে। তোর ওই ফুর্তির মেয়েমানুষটাকেও টেকে রেখেছি। এমন দংশাবো একদিন—

তার আগেই নিকেশ হবি—বলতে বলতে খপ করে মাথাটা ধরলো খগেন। কিন্তু কী হলো—দিব্যি হড়কে গিয়ে মেছুনী তার শরীরটা আঁকাবাঁকা করে দিব্যি এক ঘোগে ঢুকে গেল।

খগেন জানে—এখন শাবল এনে এ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কোন লাভ নেই। কারণ, এক ঘোগ থেকে আরেক ঘোগে যাবার রাস্তা এরা আগে থেকেই কাঁকড়া চালান করে বানিয়ে রাখে। চালান মানে- তাড়-খাওয়া চিতি কাঁকড়ার ঝাঁক নিজি নিজিই গর্ত বানিয়ে রাখে। এসব গর্ত ওই ছেনাল মাগীদের বিপত্তারণ মধুসূদন।

খগেন বুঝলো, এবেলা আর দেখা পাওয়া যাবে না মেছুনীর।

খালপাড়ে উঠে এসে দেখলো, ধানের শীষ তো এবার ঢলে পড়বে। শ্রীপঞ্চমীর পরদিন থেকে রোয়া। দুধ এসেছে কিছুদিন। এবার দুধ শক্ত হয়ে ঢলে পড়ার সময়। তখন থেকেই রংঝাল দেবে। আর তো সময় এসে গেল এ-ধানের। আবার গাছ শুকোবে। তবু এই ধানের আরেক নাম অমরলতা। অমরলতার দুটি ফল খাবার জন্যেই আমাদের এত ছুটোছুটি। বেশ চলে কিন্তু মেছুনী। ফণাটা তুলে—বাহার ছড়িয়ে— দুলে দুলে।

ভোরে যখন কাজে এসেছিল—তখন অন্ধকারে ডোবানো ধানের মাঠ অস্পষ্ট ছিল। আকাশে একটা জ্বলজ্বলে তারা। এই হলো গিয়ে নিশাচরদের ফেরার সময়। সময় বুঝেই খালের জলের কিনারায় দাঁড়িয়েছিল খগেন নস্কর।

বিপিনবাবুর বাড়ির পুকুরের বারান্দায় রান্নাঘর। সেখান থেকে দু পেয়ালা চা হাতে শিবানী বেরিয়ে এলো। তারপর হাসিমুখ করে খগেনকে হাসি দিয়ে ডাকলো। মানে এসো। একসঙ্গে চা খাবো।

খগেন গোড়ায় গেল না। সে বোঝে, বাবুর বউয়ের চোখে এসব ভালো ঠেকে না। এবার শিবানী তাকে দূর থেকে হাত তুলে মারের ভান করলো।

কি করা যায়? খগেন নস্কর ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখেছে। বাবুর ভাইয়ের বউ তার বড় ছেলে হাজরার বয়সী হবে। বিয়ে-থা হয়েছে। বাচ্চা আছে। স্বামী জীবিত। তবে বেহেড্ মাতাল। বিপিনবাবুরই তো ভাই হয়। তাও নাকি ইচ্ছে ফুরিয়ে গেছে। তাই বিলিতি মদের সঙ্গে ঘুমের বড়ি খায়। কিসির দুঃখু কে জানে? ভদ্দরলোকদের প্রায়ই এমন হয় নাকি। আত্মঘাতী হবার এটা একটা পলিসি।

এ অবস্থায় তিতিবিরক্ত বউটা যদি ভাসুর বাড়ি এসে খোলা মাঠ,

গাছপালা, দখিণা বাতাস পেয়ে সব ভুলে যায়—মনটা নেচে ওঠে—আর অমনি একবার তার সঙ্গে শোয়-ই—তবুও তো এতকাল পরে মাইতি বউদি সুমতি আর ফিরে আসতে পারে না। যতই না এক রকমের মুখ হোক। চোখ হোক। একই ধাঁচে মাথায় চুলের গুছি ঝুলে পড়ুক।

খগেন নস্কর নিজেকে বললো, এসব জেনেশুনেও যদি এগোই—তবে তার নাম তঞ্চকতা। তার নাম লোভ। এক লোভ থেকে আরেক লোভ আসে। এক একদিন অন্ধকার থাকতে ভোর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে খগেন নস্কর সেই নিশাচর মেছুনীর খোঁজে এসে আকাশের নিচে দাঁড়ায়। কী অন্ধকার—কী অন্ধকার। তখন নিজির লোভের চেহারা দেখতে পায় সে। কারণ এই সময়টায় নিজির মুখ তো আর দেখা যায় না। কোন লজ্জা থাকে না। কোনো বিচার থাকে না তখন। তখনই খগেন বুঝতে পারে অন্ধকারেরও একটা শক্তি আছে। কী ভীষণ ক্ষমতা অন্ধকারের।

নয়তো, সে চেয়েছিল পয়সা। নিজির একেমে পয়সা কামাতে। একেবারে পরোয়া না করে পয়সা ওড়াতে। পুরুষ লোক হয়ে কতকাল বউয়ের হাতে ধরা হয়ে থাকে! আসলে তার তো দরকার খুবই কম। সামান্য কিছু হলেই তার জীবন চলে যায়। যাচ্ছিলও তাই। কিন্তু ওই তুচ্ছতাচ্ছিল্য! সেইটেই ভেতরটা তার ক্ষেপিয়ে দিল।

আর অমনি আমি পয়সার জন্য নেমে পড়লাম। আমার একটা আলাদা সমীহ ছিল। ছিল আলাদা সম্ভ্রম। সে-সব শিকেয় তুলে দিয়ে আমার হাতেই এ তল্লাটের গোসাপ প্রায় নির্বংশ।

আর সেই লোভ থেকে আরেক লোভে। বাবুর ভাইয়ের বউটা না হয় পাগলী-পাগলী—কিন্তু আমি তো খগেন নস্কর। কোনদিন লুভী ছিলাম না। চিরকাল ছেড়ে এসেছি। কিছু কেড়ে খাই নি কোনদিন। দিয়েই এসেছি লোককে। এ আমার কি হলো?

এক লোভ থেকে আরেক লোভে? গোড়ায় পয়সা। তারপর মেয়েমানুষ। তাও নিজির এলেমে নয়। একজন মদে বেহেড়—আর আমারে ঘিরে নানান গল্পকথা—তাই না দেখে মেয়েটা—আর আমিও তেমনি মানুষ! ভুলেই ছিলাম—আমি যে একজন পুরুষ। ভগবানের এ পৃথিবীতে এমন শক্তি ধরে আকাশ, ডাঙা, জল, বাতাস। সেখানে মেয়ে পুরুষের চিহ্ন দেওয়া মানুষ হয়ে কী এমন উপরি লাভ? তার চেয়ে শুধু জ্যান্ত প্রাণী হয়ে থাকাই কি ভালো না? তবু আমি লোভের হাতে ধরা দিলাম। আমি খানিকক্ষণ কেন পুরুষ হলাম?

এখন শিবানী নাম ধরেই ডাকছে। এই খগেন। খগেন! এসো। আমরা সবাই আজ একসঙ্গে চা খাবো। বড়দা ডাকছে তোমায়।

যেতেই হলো খগেনকে। এক খুরি করে চা খাবে। তার জন্যে আবার এত আয়োজন। বাবু বিপিন বসু তার বউকে নিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলে কাপ রেখে চুক-চুক করে চা খাচ্ছিল। বাবুর ভাইয়ের বউ মোড়ায় বসে—হাতে পেয়ালা। খগেনকে দেখেই বললো, ঢেলে নাও। এখনো গরম আছে।

খগেনের তখনই মনে পড়লো, বহুকাল আগে সে নিজেই এক হাসা কেউটেকে তাড়ির কলসীর ভেতর রেখে দিয়েছিল। রোজ সকালে বেস্পতি তার জন্যে চা করে দিত। হাসা কেউটেটা দিব্যি চা খেয়ে নিত। তখন তো আর এসব ফন্দি-ফিকির মাথায় ছিল না খগেনের। পাকা চামড়া বেচব! বিষ বেচব! ঘুম পাড়িয়ে সাপ চালান দেব! তাই সাপটাকে সে মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। কতদিন সকালবেলা সে সাপ প্রায়ই ছেঁচতলায় এসে হাজরে দিতো। তখন তাকে এক খুরি চা না দিলে সে বান্দা যাবার নয়।

আমিও কি একটা সাপ? খালি ছোঁক-ছোঁক করি মেছুনীর

মতো? কই চাঁদবুড়ো তো এমন করে নি। মেছো কেউটেটা ধরা পড়েও তো তেজের ওপর আছে। জিদীর পরিচয় দিচ্ছে সর্বক্ষণ। কী ফোঁসফোঁসানি। বাপস্! আর আমি? কোথায় ছুটো পয়সা। কোথায় একটুক্ষণের জন্যে শঙ্খ লাগা। তাও এই বয়সে! সম্ভ্রম—সমীহ—সবকিছু ধুলোয় ফেলে দিয়ে। ছিঃ! ছিঃ!

সেদিনই নিশুতি রাতে খগেন নস্কর ভাঙা ড্যাল পার হয়ে সুমতির পোড়ো বাড়িতে গেল। ঢুকেই একটা মিষ্টি গন্ধ পেল। এ গন্ধ খগেনের চেনা। অনেকটা কাঁঠালি চাঁপার বাস। যেখানে ফিকে—সেখানে সজনে ফুল। মাথার ওপরের আকাশে তিন-চারখানা শাদা মেঘ চাঁদখানাকে মাড়িয়ে যাচ্ছিল। তাই উঠোনটা ছায়াগেলা আলোয় ভরে গেল। সুমতির বসানো লাউচারা মাচায় শুকিয়ে ছাগলের দাড়ি। তবে গোড়াটা এখনো বেঁচে। আর কয়েকটা বহুকালের হলদে লাউয়ের খোল পড়ে আছে। তাতে না আছে লাউ—না বীচি। সবই পাখিদের ভোগে গেছে। খগেন বুঝলো, ঘরের ভেতর কোন কালনাগিনী সঙ্গীর সন্ধানে একদম পাগল হয়ে আছে এখন। এই সময়টায় ওরা বাঁশি ভালবাসে। তাছাড়া আর কিছু নয়। নাচতে বললে নাচবে। দুলতে বললে দুলবে।

ও শিবানী। ওখানে ঢুকছো কেন? বেরিয়ে এসো।

কে শিবানী? বলতে বলতে ঘর থেকে যে বেরিয়ে এলো—সে সুমতি। কার কথা বলছো?

তুমি?

হ্যাঁ। শিবানী কে গা?

তোমার একটা নতুন নাম দিলাম সুমতি।

ওঃ! তাই বলো। শুনে তো আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। আমি ভাবি, না জানি এই বয়সে আবার কার সঙ্গে মেশামেশি শুরু করলে। অনেকদিন তো আমি নেই।

এ বয়সে আমার কি কিছু হওয়ার ?

তা হতেই পারে। তুমি তো খগেন এখনো ছিমছামটি আছো। সেই এক পোশাক। হাঁটুর ওপর ঠেঁটে ধুতি। গায়ে ফতুয়া। চুল দু-চার গুছি পেকেছে শুধু।

তোমার তো একটাও পাকে নি। বলেই খগেন চেঁচিয়ে উঠলো, সরে বসো শিবানী। সরে বসো।

আবার শিবানী! ওঃ! আমি তো ভুলেই গেছি। ওটা আমারই আরেক নাম। তাই না ? তোমার দেওয়া—

সরে বোসো।

কেন ? অত অস্থির হচ্ছো কেন ?

দেখতে পাচ্ছো না ? তোমার পায়ের কাছে কালান্তক যম।

ওঃ! কালনাগিনী। তুমি জানো না ? আমি এখন ওদের এক্তিয়ারের বাইরে। আমার গায়ের ওপর দিয়ে গেলেও কিছু বলবো না।

খগেনের মনে হলো, সে যেন টিকিট কেটে বিভীষিকা দেখছে। কালনাগিনী বারান্দার আড়া থেকে নেমে সিধে শিবানীর পায়ের ওপর দিয়ে বয়ে চলে গেল।

শিবানী জানতে চাইলো, ওরা আজকাল আর তোমার কথা শোনে না ?

কোথায় শোনে ?

তুমি সব ভুলে গেলে !

সব। হাতের ভিতর বাতাস এখন আস্ত বরফ। মুঠো করা যায় না। লাগে ভীষণ।

ভগবানের সঙ্গে আর দেখা হয় না তোমার ? আসেন না এদিকি ?

সেই একবার এসেছিল রিকশোয়।

সে তো মাইতিমশায় !

কাঁঠালি চাঁপার গন্ধটা এখন এতই ঘন—খগেন আর স্থির থাকতে পারছিলো না। অন্য কথায় গিয়ে খগেন চেঁচিয়ে উঠলো। তোমায় তো দংশাবে—

রাখো! অত চিন্তে করতে হবে না আমার জন্যে! খুব হয়েছে।

তুই কে শিবানী? তুই কে?

আমি? আমি সুমতি। সুমতি দাসী।

তুই কে সুমতি? তুই কে?

ওই যে নাম রাখলে আমার! আমি শিবানী। শিবানী দাসী।

আমি যে কিছু বুঝে উঠতে পারি না।

ছাখো খগেন। শুধু শুধু গুলিয়ে দিয়ো না। আমি একটা মেয়েছেলে। আমারে মাথায় তুলো না। সে বাইশ বিঘের দাগ কি করলে? চাষ তোলো তো সারা বছরে?

না। সে ভাগচাষীরাই কেড়েকুড়ে নিলে।

আর অমনি তুমি দে দিলে? ভালো তো। ওটা মাইতিমশায়ের খরিদা সম্পত্তি।

খগেন কোন জবাব দিলো না। তার নিজের বুকের ভেতর গুড়গুড় করে ডাকছিল। অথচ আকাশের মেঘগুলো এখন সাফ। চাঁদের আলোটিও বেশ পরিষ্কার। খগেন আবার হাউমাউ করে বললো, তুই কে আসলে? তুই কে? ঠিক করে বল। আমার দিব্যি—

অত দিব্যি কাটা কেন! আমি আসলে এট্টি মেয়েছেলে। মল পরালি ঝুমঝুম করে হাঁটবো। গামছা পরালি জলার পেত্নী হয়ে ঘোরবো। কিনা! ঠিক বলি নি বল।

তবু বল তুই কে?

আমি আমার সুমতি। মাইতিমশায়ের বেওয়া। তোমার ওই যেন কী নাম—আঃ! মনেও পড়ে না। শিবানী। বেশ নামখানা কিন্তু। কোথায় পেলে?

খগেন আর কথা বলতে পারলো না। এখন তার ইচ্ছে হচ্ছিল —ডান হাতে এই পোড়ো বাড়িটা মুছে ফেলে—বাঁ হাতে এখানে নির্জন দুপুরবেলার খালপাড় বানিয়ে ফেলে। মেছুনীটা এই মাস্তর পাথুরে আলোর এবড়ো-খেবড়ো গর্তে সেঁধোলো। আর বাঁশ-বাগানের পেছন দিককার আতাগাছের লতার ছায়ায় শুকনো বাঁশ পাতার ডাঁই পেরিয়ে ডুব্বোর শয্যায় ঘন, তিজী মেয়েমানুষটা—শিবানী তাকে টেনে ধরুক। গায়ে শহুরে সাবানের গন্ধ। তাতে ঘাম। সেই সঙ্গে সু তার ফুল তোলা শাড়ির পাড়ে পাউডার ধুলো।

এসবের কিছুই ঘটলো না। তার বদলে ডাঁটার জঙ্গলের ভেতর থেকে কালনাগিনী ফণা তুলে দাঁড়ালো।

রোজ রোজ এ পোড়ো বাড়িতে কী দরকার নস্করমশায়?

খগেন পরিষ্কার দেখলো, চাঁদের ছুরি বসানো আলোয় কালনাগিনীর মুখের ডগায় পাউডার ধুলো। চেরা জিভেও তাই। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল এর ফলে।

খগেন বললো, মুখটা ধুয়ে আসুন। ধুলো লেগে গেছে।

সে আমি বুঝবো। রোজ রোজ নিশুতি রাতে কী দরকার আপনার এখানে? আমাদের কি সুখে শান্তিতে থাকতে দেবেন না? আপনি যা ইচ্ছে করুন গে—আপনার এলাকায় তো আমরা যাই নে।

আমিও আসি নে। এই সুমতি এলো বলে—

সে তো আপনার টানে টানেই আসেন। এ আপনি ভালো করেই বোঝেন।

ও কি আসলে সুমতি?

কালনাগিনী থতমত খেয়ে বললো, কেউ কেউ শিবানীও বলে।

ও কি আসলে শিবানী?

কেউ কেউ তো সুমতিও বলে। তা এখন গুলিয়ে দিচ্ছেন কেন আমাদের?

আমাদের মানে ? আর কে আছে ?

ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।

আরে! এ তো সেই মেছো। এ এলে কি করে ?

বলতে না বলতে খগেনের নিজের হাতে বৈশাখী পূর্ণিমের সন্ধ্যেবেলা আটলের ভেতর থেকে পাকড়াও করা মদ্দা মেছো কেউটেটা ফণা তুলে দাঁড়ালো।

মেছলা ভেঙে বেরোলি কি করে ?

একগাল হেসে মেছো বললো, ভাঙবো কেন, তোমার শিবানী ডালা খুলে ছেড়ে দিলে।

শিবানী! বলেই খগেন বারান্দার দিকে তাকালো। তুমি ছেড়ে দিয়েছো শিবানী ? ওর বিষ কিন্তু ঝাড়া নেই।

একগাল হেসে মেছো বললো, ছাড়া পেয়েই মাঠ ভেঙে আসছি। দেখি কি দক্ষিণ মালঞ্চের ধর্মের ষাঁড়টা একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় চান করছে। দিলাম ওর হাঁটুতে ছোবল। চর্বির পিণ্ডি। টেরও পেল না। পোড়ো ইটখোলার দিকে তাকিয়েছিল। বিষটা ঢেলে মাথা হালকা হয়ে গেল।

ছাড়লে কেন শিবানী ?

মাসখানেক ধরে ফুঁসছে। বন্দী বিষধর। এ দৃশ্য দেখা যায় না খগেন।

তোমার বড়দা জানে ?

কেউ জানে না। ছেড়ে দিয়েই—তুমি আসবে বলে আমি চলে আসি এখানে।

তুমি না সুমতি ?

হু।

তাহলে একদম শিবানী হয়ে গেলে কি করে ?

তুমিই তো হওয়ালে খগেন।

এবার খগেনের নিজেরই সব গুলিয়ে গেল। তার চোখের

সামনে আকাশের বাতাসের ভাগটা শুকিয়ে সময়ের দানা হয়ে গেল। বড় দানার বালি একদম। ফলে চাঁদখানা তার আসল বর্ণ পেল এবার। হলুদপানা। তাতে দু-খানা গোক্ষুরের ছাপ? না দাড়িবাবার খড়মের ছাপ? পরিষ্কার হবার আগেই শিবানী বলে চেঁচিয়ে উঠে খগেন ডাঁটার জঙ্গলে হেলে পড়লো।

পরদিন ভোর-ভোর বাপকে খুঁজে পেল হাজরা। তার এখন আর কাজ জোটে না। সে এই কিছুদিন হাভাতে হাঘরেদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। কোথায় ক্যাঙালী ভোজন। কোথায় শনি সত্যনারায়ণের সিন্নি। সে-সব না জুটলে আলে-আলে ঘোরে। শুকনো পাথুরে আল। ইঁদুরের গত সনের মজুত ধানের গর্তে আগুন দিয়ে সাপ খুঁচিয়ে তাড়ায়। তারপর সেই ধান শুকনো সেদ্ধ করে পিণ্ডিরক্ষা।

তা ছাড়া আছে বাতিল ইট ভাটির দীঘির পাতালে ডুব দিয়ে ভ্যাটফুলের মণ্ড খোঁজ। পেলে তাও ভেজে খায়। তবু বেম্পতি তার হেঁসেলে ভাগ বসাতে দেয় না হাজরাকে।

হাজরা আশায় আশায় বসে আছে। এইবার তোম্বাবু বিপিন বসুর ধান কাটা হবে। হপ্তা দুই ধরে কাজ তার কপালে বাঁধা। সেই আশায় আশায় আজ ভোরে বেরিয়ে হাজরা মাইতিমশায়ের নারকেল গাছে উঠেছিল। সকাল সকাল একটা ডাব চুরি করে খাওয়া তার অভ্যেস। ওপরে উঠে দেখে, মাইতিমশায়ের উঠোনের জঙ্গলে শাদা মত কী পড়ে আছে।

ওপর থেকে ভেবেছিল—দূর গাঁ থেকে ভেসে-আসা কোন ভোঁ-কাটা ডাকঘুড়ি।

পোড়ো বাড়িটায় ঢুকে দেখে—তার নিজির বাবা।

কেন যে এই বয়সে পয়সা কামানোর শখ হলো? কেন যে এই বয়সে শেকড়বাকড় চিনে বেড়ানো? আর সাপ পাকড়ানো। কে তোর পয়সা খাবে বাবা?

অনেক কষ্টে পিঠে তুলে বাড়ি নিয়ে আসে হাজরা। নুন মাটি কুড়োতে মাঠে তখন ভাঙা কলাই থালা, ঝিনুক হাতে লোকজন নেমে পড়েছে। ফাস্ট ট্রেন কলকাতা থেকে এসেই চলে গেল। চাঁদ ডুবে সূর্যের জায়গা করেছে সরে। বড় ছেলের পিঠে খগেনের মতো গুণীনকে বস্তা হয়ে বাড়ি ফিরতে দেখে মাঠ থেকে সবাই ছুটে এলো।

গাই ছাড়তে গিয়েছিল বেম্পতি। খবর পেয়ে ছুটে এলো। উঠোনে দাঁড়িয়ে সেই পুরনো চোপা। পাশেই তো শুয়েছিল সারারাত। কখন আবার উঠে গিয়ে ওই পেত্নীর পোড়ো ভিটেয় ঢুকলো?

খবরটি তখন সারা দক্ষিণ মালঞ্চে ছড়িয়ে পড়েছে কেউ সে খবর তাড়ির সঙ্গে চুষে চুষে খাচ্ছিল। কেউ বা চায়ের সঙ্গে ভিজিয়ে। যার যেমন সংস্থান।

বাবু বিপিন বসুর সঙ্গে বায়না ধরে শিবানী যখন খগেনদের উঠোনে এসে হাজির—তখন খগেন চোখ চেয়েছে—কিন্তু মুখ খোলে নি। চোখে ঘোরলাগা ঝিমধরা ভাব।

একে একে ভিড় কেটে গেল।

বেম্পতি এসে বললো, কী কাজেই লাগালে মানুষটারে নিশুতি রাতে বেরিয়ে পড়ে?

সে তো আগেও বেরোতো। বলে মনে মনে অঙ্ক কষছিল বিপিন। এদেশের নিয়মই এই—তোমার কোন কাজে নেমে কারও যদি ক্ষতি হয় তো ক্ষতি পূরণ করতে হবে। অসুখ করলে চিকিৎসা। তার মানে গোটা পনের টাকা গচ্চা যাবে এখন।

তোমার কাজের জন্যি এখন তো একদম নিশাচর হয়ে উঠেছিলো।

আমার কাজ দিনির বেলায়।

হাজরা তেরিয়া হয়ে এগিয়ে এলো। সেবারে কুকুরটাকে মুখুজ্যী

করে বাবু বিপিন বসুর সামান্য কয়েক ভরির গহনা হাতানো গিয়েছিল। আশা ছিল অনেক বেশি। তাই রাগে-রাগে দরকারি কাগজপত্তর কুচিকুচি করে ছিঁড়ে রেখে আসে নিশুতি রাতে। সে-রাগ তার এখনো পড়ে নি। বাড়ির ভেতরকার সুলুক-সন্ধান তার জানা। শুধু বাপটার জন্যে কিছু করতে পারছে না। পথের বাধা তারই বাবা।

ভালোয় ভালোয় দু খানা গজ ছাড়ুন।

গজ ?

পাতি? পাত্তি চেনেন না? এত সাপ চালান দিচ্ছেন। কলকাতা থেকে পাত্তি আসছে না আপনার?

চালান কোথায়? চালান তো বন্ধ মাসখানেক। তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো।

বাবার এখন কথা বলা বারণ।

দেখি তো আগে খগেনকে। বলে ঘরে ঢুকে পড়লো বিপিনবাবু। সঙ্গে তার ভাদ্রবউ—শিবানী।

খগেন কিছু না বলে সোজা বাবু বিপিন বসুর চোখে তাকাল।

কি হয়েছিল খগেন? ওখানে গিয়েছিলে কেন?

খগেন কোন কথা বলতে পারলো না। পাশে দাঁড়ানো শিবানীর মুখখানা তার বড় চেনা লাগলো। মনে পড়ছে—মনে আসছে—কিন্তু আবার গুলিয়ে যাচ্ছে।

কিছু বলবে খগেন? কিছু দরকার আছে? টাকা রেখে যাবো?

মাথা নাড়লো খগেন। বিড়বিড় করে বললো, বাঁশের খুঁটিতে অনেক নোট আছে বিপিনবাবু।

তা থাকুক না। আরও দরকার লাগতে পারে।

খগেন মাথা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ উঠে বসে শিবানীর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। তুই কে? তুই কে সুমতি?

শিবানী চমকে গিয়ে পরিষ্কার গলায় বললো, আমি শিবানী।

নয়

ধান উঠে গেল বিপিনের—ভালোয় ভালোয়। আবার সারা দেশের মাঠগুলো দুগ্‌গাপুজোর বায়না পেয়ে গেল। হাল নামে-নামে মাঠে। কয়েকটা মাঠে বর্ষার চাষের থেকে বীজতলাও তৈরি। কেউ করেছে শুকনো কাঁকড়ি বীজতলা। এক একদিন আষাঢ়ের আকাশে মেঘ এসে জমা হয়। কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। ইলেকট্রিক ট্রেনের ভেতর ডেলি প্যাসেঞ্জারদের আলু সেদ্ধ অবস্থা।

বাবু বিপিন বসুর বোরো চাষে ধান ভালোই উঠেছিল। খাবার লোক নেই। তাই সম্বচ্ছরের জন্যে বস্তা দশেক রেখে দিয়ে বাকিটা বড়িনা[illegible] গোলায় পাঠিয়ে দিয়েছে বিপিন।

খগেন বললো, বিপিনবাবু, বর্ষার চাষটা করবে না?

দেখি।

এর আবার দেখি কি! বীজতলা বানাও।

বানাবো।

আর কবে? সবাই ধান ফেলেছে কলা করে। অসুবিধে থাকলে কাঁকড়ি বীজতলা করো। তিন মই দিয়ে মাটিটা ভালো করে ধুলো করে দেব। তারপর মাটির নিচি ভালো দেখে পুষ[illegible] ধান চাপা দাও।

সবই দিতাম রে খগেন। তুই-ই তো ডোবালি!

আমি কি ডোবাবো তোমায়? তুমি হলে গিয়ে শহুরে মানুষ বিপিনবাবু। তোমার সঙ্গে বুদ্ধিতে পারি আমি!

আমি সিধে বুদ্ধির লোক খগেন। একটা মাগী কেউটের পেছন পেছন দুটি মাস কাটিয়ে দিলি। এভাবে কারোবার চলে?

ঠিক চলবে। ওটাকে এবার ধরে ফেলবো।

আর ধরেছিস!

হ্যাঁ, বিপিনবাবু। এবার ঠিক ধরে ফেলবো। তার পরই বাকি সব ক-টাকে সাত দিনের ভেতর পাকড়াবো।

অত সোজা ?

মেছুনীর পেছন পেছন ঘুরে ওদের সব ক-টা আস্তানা—গতিবিধি এখন আমার নখের ডগায়। যেভাবে জাল পেতেছি—এবারে মেছুনীর পালাবার পথ নেই।

না থাকলেই ভালো। আমি আর কলকাতার তাগাদা সহ্য করতে পারি না।

অমাবস্যা পূর্ণিমায়—মেছোটা তো বিষ দিচ্ছে।

সে আর কতটুকু! আর—

খগেন বিপিনবাবুর চোখে তাকালো। আর কি বিপিনবাবু ?

খালপাড়ে এখন কোন লোকজন নেই। বাতাসে মেঘের ছায়া পড়ে—আবার রোদ্দুর লাফিয়ে পড়ে তা মুছে দেয়। বিপিনবাবুর বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। সে রাতে সুমতিদের পোড়ো বাড়ির উঠোনে ঘুরে পড়ার পর খগেনের সঙ্গে শিবানীর দেখা হয় কম। কথা হয় আরও কম। সে এখনো জানে না—এর পেছনে বিপিনবাবুর কোন কারণ আছে কিনা। তবে থাকতেই তো পারে।

কাঁহাতক মেছোকে বন্দী করে রাখা যায়। পোষ মানার কোন লক্ষণই নেই। সব সময় গজরাচ্ছে। আহার দিলে কোনদিন খায়। কোনদিন ব্যাঙের কচি ছানাগুলোকে থেঁতলে চটকে মেরে রেখে দেয়।

মানবে। পোষ মানবে বিপিনবাবু। আগে মেছুনীকে ধরি। ধরার পর ওদের একসঙ্গে রাখবো তিনদিন। তখন দেখো।

তার আগেই তো কখন ছাড়া পেয়ে যাকে সামনে পাবে তাকেই কাটবে।

ঢাকনাটা খুলবে না কিন্তু কখনো। খাবার দিও ফোকর দিয়ে। তাহলে অন্ধকার সয়ে যাবে চোখে।

সেদিন তোর কি হয়েছিল রে খগেন ?

কবে ?

হঠাৎ নিশুতি রাতে পোড়ো বাড়িটায় গিয়ে ঢুকলি কেন ?

ঢুকে গেলাম।

মেছুনীর খোঁজে খোঁজে ?

খগেন চুপ করে থাকলো। বিপিনবাবু আবাব বললো, বেছে বেছে ওই মাদী সাপটাকে তুই ধরতে চাস কেন ? ওর মাথায় কি বেশি করে বিষ জমে ?

খগেন পালটা জানতে চাইলো—একদম অন্য জায়গা থেকে—তুমি তো ষণ্ডাগণ্ডা পুরুষ মানুষ। টাকা-পয়সার টান নেই। তুমি কেন ওই বাঁজা মেয়েমানুষটার সঙ্গে আঁঠা হয়ে লেগে আছো ?

সিংহবাহিনী ? সে তো আমার ধর্মপত্নী।

পয়সাওয়ালা পুরুষেব আবার ধর্মপত্নী কি জিনিস বিপিনবাবু ? শহর কলকাতায় যাতায়ত তোমাব। মাস গেলে মাইনে পাও। ধান বিক্রি করো। পুকুরের মাছ বিক্রি কর। বাড়িভাড়া লাগে না। তারপর তো এই কারোবার। বাড়তি পয়সাগুলো কর কি ?

হাতে থাকে না রে খগেন।

বাজে কথা বোলো না বিপিনবাবু। হাতে বাড়তি পয়সা—সংসারে খাবার লোক মোটে দুটি। কলকেতায় ঘুরতে-ঘুরতে সোনাগাছি যাবার মন হয় না ?

খগেন আকাশে আঙুল তুলে দেখালো।

ওঃ! বলে বিপিন আর তখন তখনই এগোতে পারলো না।

সেদিনই চারটে শ-চারটে নাগাদ দক্ষিণ মালঞ্চে এক বাবু ট্রেন থেকে নামলো। বিকেলের বাতাসে মাথায় চুল খালের জল হয়ে দু-পাশে ভেঙে পড়ছিল। রিকশো সাইকেলগুলো প্যাঁক-প্যাঁক করে এগিয়ে এলো। একটাতেও উঠলো না বাবু। গায়ে ছাই রঙের

বুশ শার্ট। চেক ট্রাউজার। জামার হাতার বাইরে দু-খানা ডানা মানুষটার হাঁটা-চলার টাল সামলে রাখছে সব সময়।

হাজরা নস্কর কোত্থেকে এক ধামা ধান কুড়িয়ে ফিরছিল। নিশ্চয় সাপ তাড়ানো গর্ত থেকে—ইঁদুরের জমানো ধান। সে বিজনবাবুকে আগেও দেখেছে। বিপিনবাবুর ছোট ভাই। চল্লিশ হয় নি। হাসিখুশি। হাজরাকে দেখে বললো, কেমন আছো হাজরা?

ভালো। আপনি?

ভালো। আমার দাদা বৌদি?

সবাই ভালো। আপনার বউও ভালো আছে।

চিনলে কি করে?

ও আমরা চিনি।

খানিক বাদে এই বিজন খালপাড় ধরে এগিয়ে এলো। বছর তিনেক আগে একবার এসেছিল। দাদার বাড়িটা সারা গায়ে ধানের ধুলো মেখে আগের চেয়েও হতশ্রী। ফাঁকা মাঠে এদিক-সেদিক এক-এক চৌকো সবুজ কার্পেট। বিজন চেনে। সে তার দাদাকে ও বস্তুটাকে বীজতলা বলে ডাকতে দেখেছে।

চারদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছিল বিজন। এখনো বউদি তাহলে বিকেলের চায়ের জল চাপাতে ওঠে নি। শিবানী নিশ্চয় তার পাশে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আর মোটা হচ্ছে। শিবানীর একখানা পোস্টকার্ড সে কলকাতায় পেয়েছে। এই দু-মাসে। এখানকার ভাত খুব মিষ্টি। কচি পাঁঠার মাংসও খুব খেতে ভালো এখানে। কারণ বোধহয় এখানকার ঘাসই খায় শুধু।

লাইনটা মনে পড়তেই বাবু বিজন বসু—বয়স উনচল্লিশ—নিজে নিজেই একবার হাসলো। তার লেখার ইচ্ছে হয়েছিল—তাহলে এখন থেকে খিদে পেলেই ছুটি ছুটি করে মাঠের মিষ্টি ঘাস ছিঁড়ে খেয়ো। কিন্তু এ লাইনটি বিজনের আর লেখা হয় নি। কারণ

সেদিন তোর কি হয়েছিল রে খগেন ?

কবে ?

হঠাৎ নিশুতি রাতে পোড়ো বাড়িটায় গিয়ে ঢুকলি কেন ?

ঢুকে গেলাম।

মেছুনীর খোঁজে খোঁজে ?

খগেন চুপ করে থাকলো। বিপিনবাবু আবার বললো, বেছে বেছে ওই মাদী সাপটাকে তুই ধরতে চাস কেন ? ওর মাথায় কি বেশি করে বিষ জমে ?

খগেন পালটা জানতে চাইলো—একদম অন্য জায়গা থেকে— তুমি তো ষণ্ডাগণ্ডা পুরুষ মানুষ। টাকা-পয়সার টান নেই। তুমি কেন ওই বাজা মেয়েমানুষটার সঙ্গে আঁঠা হয়ে লেগে আছো ?

সিদ্ধেশ্বরী ? সে তো আমার ধর্মপত্নী।

পয়সাওয়ালা পুরুষের আবার ধর্মপত্নী কি জিনিস বিপিনবাবু ? শহর কলকাতায় যাতায়াত তোমার। মাস গেলে মাইনে পাও। ধান বিক্রি করো। পুকুরের মাছ বিক্রি কর। বাড়িভাড়া লাগে না। তারপর তো এই কারোবার। বাড়তি পয়সাগুলো কর কি ?

হাতে থাকে না রে খগেন।

বাজে কথা বোলো না বিপিনবাবু, হাতে বাড়তি পয়সা— সংসারে খাবার লোক মোটে দুটি। কলকেতায় ঘুরতে-ঘুরতে সোনাগাছি যাবার মন হয় না ?

বেলা দুটো তিনটে হবে। বিপিন আজ অফিস যায় নি। নির্জন খালপাড়। তুই ও জায়গার নাম জানলি কি করে ?

কলকেতায় কত ঘুরিচি। নাম জানবো না কেন ? তুমি যাও নি কোনদিন ওখানে ?

না।

যাবার ইচ্ছে হয় নি কোনদিন ?

হয়েছে। কিন্তু—কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। তা ছাড়া এই ক-বছরে তো সব রকমের ইচ্ছেও গেছে।

ইচ্ছে ফুরোলে কেউ কারোবারে নামে বিপিনদা? হাসালে তুমি। আমার আরও হবে। আরও চাই। ওটা না হলি নয়। এ জন্যই মানুষ খেটে মরে। ভাত খায়। ঘুমোয়।

তাহলে তোরও খগেন ইচ্ছে শুকোয় নি। শুকোলে কি তুই এভাবে এক মেছুনীর পেছনে দু-মাস পড়ে থাকতে পারতিস?

আমার কথা আলাদা। আমি ওদের চিনি। এত বড় সাহস মেছুনীর—আমায় লেজে খেলায়? আমি ওকে ধরবোই।

এটাও বোধহয় তোর এক রকমের দখলে রাখার ইচ্ছে।

ইচ্ছে না বলে জেদ বলো বিপিনদা।

জষ্টি মাসের পূর্ণিমার রাতে তুই কার খোঁজে গিয়েছিলি খগেন? সত্যি করে বল তো?

খগেন কোন কথা বললো না।

ও রকম পোড়ো বাড়িতে ঢুকতে তোর বুক কাঁপে না? নিশুতি রাতে? তারপর একটু থেমেই বিপিন বললো, সুমতি কে?

তুমি এ-নাম শুনলে কার মুখে?

তোরই মুখে। আমরা তোকে দেখতে গেলাম খবর পেয়ে। তুই শিবুকে দেখে বললি, তুমি যে সুমতি? মনে নেই তোর খগেন?

মেছুনী এখন লেজে খেলাচ্ছে– ঘুরে-ঘুরে আমার মাথার ঠিক নেই।

উহুঁ। সুমতি নিশ্চয় কেউ ছিল। নয় তো সবাই বলছিল—ওই পোড়ো বাড়িটা একদিন তোকে আবার নিশুতি রাতে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। বিষধর সব সাপের আস্তানা হয়ে আছে।

এবারও খগেন চুপ করে থাকলো।

সুমতি কতদিন নেই ওখানে ?

অনেকদিন।

কোথায় এখন ?

খগেন আকাশে আঙুল তুলে দেখালো।

ওঃ! বলে বিপিন আর তখন তখনই এগোতে পারলো না।

সেদিনই চারটে শ-চারটে নাগাদ দক্ষিণ মালঞ্চে এক বাবু ট্রেন থেকে নামলো। বিকেলের বাতাসে মাথায় চুল খালের জল হয়ে দু-পাশে ভেঙে পড়ছিল। রিকশো সাইকেলগুলো প্যাঁক-প্যাঁক করে এগিয়ে এলো। একটাতেও উঠলো না বাবু। গায়ে ছাই রঙের বুশ শার্ট। চেক ট্রাউজার। জামার হাতার বাইরে দু-খানা ডানা মানুষটার হাঁটা-চলার টাল সামলে রাখছে সব সময়।

হাজরা নস্কর কোত্থেকে এক ধামা ধান কুড়িয়ে ফিরছিল। নিশ্চয় সাপ তাড়ানো গর্ত থেকে—ইঁদুরের জমানো ধান। সে বিজনবাবুকে আগেও দেখেছে। বিপিনবাবুর ছোট ভাই। চল্লিশ হয় নি। হাসিখুশি। হাজরাকে দেখে বললো, কেমন আছো হাজরা ?

ভালো। আপনি ?

ভালো। আমার দাদা বৌদি ?

সবাই ভালো। আপনার বউও ভালো আছে।

চিনলে কি করে ?

ও আমরা চিনি।

খানিক বাদে এই বিজন খালপাড় ধরে এগিয়ে এলো। বছর তিনেক আগে একবার এসেছিল। দাদার বাড়িটা সারা গায়ে ধানের ধুলো মেখে আগের চেয়েও হতশ্রী। ফাঁকা মাঠে এদিক-সেদিক এক-এক চৌকো সবুজ কার্পেট। বিজন চেনে। সে তার দাদাকে ও বস্তুটাকে বীজতলা বলে ডাকতে দেখেছে।

চারদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছিল বিজন। এখনো

বউদি তাহলে বিকেলের চায়ের জল চাপাতে ওঠে নি। শিবানী নিশ্চয় তার পাশে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আর মোটা হচ্ছে। শিবানীর একখানা পোস্টকার্ড সে কলকাতায় পেয়েছে। এই দু-মাসে। এখানকার ভাত খুব মিষ্টি। কচি পাঁঠার মাংসও খুব খেতে ভালো এখানে। কারণ বোধহয় এখানকার ঘাসই খায় শুধু।

লাইনটা মনে পড়তেই বাবু বিজন বসু—বয়স উনচল্লিশ—নিজে নিজেই একবার হাসলো। তার লেখার ইচ্ছে হয়েছিল—তাহলে এখন থেকে খিদে পেলেই দুটি দুটি করে মাঠের মিষ্টি ঘাস ছিঁড়ে খেয়ো। কিন্তু এ লাইনটি বিজনের আর লেখা হয় নি। কারণ চিঠির জবাব দেওয়ার আর ইচ্ছেই হয় নি। সে কোন রকম ইচ্ছে না-হওয়ার একজন রুগী।

অন্য একখানা চিঠি এখন তার বুক পকেটে।

খালের ওপরেই ইটের পোড়ো পাঁজায় বিজন একজন লোককে উবু হয়ে মাটিতে কান পাতা অবস্থায় দেখতে পেল।

খগেন তখন সেই বাঁশবাগানের গায়ে পাথুরে আলে খন্তা বসিয়েছে। খোঁচাচ্ছে—আর কান পেতে শব্দ শুনছে। ভেতরটা ফাঁপা হলে এক রকমের আওয়াজ হবে। ভরাট হলে আরেক রকম। বেজির গর্তের গোড়ায় খাবারের গুঁড়ো পাওয়া যাবেই। সাপগুলো অনেক অভিজাত। তারা তাদের আহারের কোন চিহ্ন রাখতে চায় না পারতপক্ষে। খগেন খোন্তা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এগোচ্ছিল। আর ভুঁইয়ে কান পেতে-পেতে গর্তের চেহারার আন্দাজ নিচ্ছিল। আর তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল একটা কথাই। শেষে মহাজনের কাছে নামটা খারাপ করে দিলি মেছুনী! এখনো বলি—ধরা দে—ধরা দে—

আষাঢ় মাসের লম্বা বেলায় ভাপ তাপ মাটি সারাদিন ধরে শোষে। আর ছাড়তে থাকে সন্ধ্যের দিকে। তখনই মাটির নিচের জীবরা অতিষ্ঠ হয়ে বাতাস খেতে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। ঠিক এই

বিকেল থেকে খোঁচাতে পারলে মেছুনী নিশ্চয় সন্ধ্যের মুখোমুখি বেরিয়ে আসবে।

খগেন এগোতে এগোতে হঠাৎ উঠে বসলো। তার মাথার কাছে জুতোসুদ্ধ দুটি ভিজে পা। একখানা মানুষ উলটো করে দাঁড় করানো।

কে আপনি?

খগেনের এ কথায় লোকটা কোন জবাবই দিল না। শুধু মিট-মিট করে হাসতে লাগলো। প্যাণ্টের দুটি পা ভিজে। খাল পেরিয়ে আসায় কিছু কাদা লেগেছে। তুমি খগেন?

হুঁ! আপনাকে চিনলাম না তো।

এখুনি চিনবে! তাড়া কিসের? উঠে এসো।

খগেন খন্তা হাতে উঠে দাঁড়ালো। বাবুটি তার চেয়ে প্রায় দশ বছরের ছোটই হবে।

কাকে চান আপনি?

তোমাকেই। সাপ ধরছিলে?

খগেন চুপ করে গেল। এ আবার একটা বলার কি আছে এমন। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। সরকারী লোক নয় তো? একবার কোথায় যেন শুনেছিল—কোন্ কোন জাতের সাপ ধরায় নাকি বারণ আছে। ধরলে শাস্তি। যেমন—ব ।র তিন মাস ব্যাঙ ধরা নিষেধ। ওরা তখন গাভিন হয়। সেজন্যে সরকার থেকে তাকে ধরতে আসে নি তো ভদ্রলোকটা? ধরতে এলেই সে খন্তার এক বাড়ি কষিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে যাবে। এত বড় লম্বা মাঠ সামনে।

আমায় একটা সাপ ধরে দিতে পারো? ছোটোখাটো। ইন্সট্রুমেণ্ট বক্সে করে প্যাণ্টের পকেটে বেশ রেখে দেবো।

সে আপনি লাউডগা রাখতে রাখতে পারেন। কালাচিতিও পারেন। কিন্তু আপনার পরিচয়টা?

আমাকে তুমি চেনো। আমি বিপিনবাবুর ছোট ভাই।

ওঃ! তাই বলেন। তা বাড়ির ভেতর যান নি? ওঁরা জানেন—আপনি এসেছেন?

আস্তে আস্তে জানবে 'খন। আমি তো তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

আমার সঙ্গে? আমি তো খগেন নস্কর। উই আমাদের বাড়ি। দেখতি পাচ্ছেন?

বিজন সেদিকে না তাকিয়েই বললো, আমি বাড়ি দেখতে আসি নি। আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। তুমি তো আমার বউকে দেখছো নিশ্চয়। শিবানীকে—

হুঁ।

কেমন দেখতে?

খগেন ভেতরে ভেতরে কেঁপে গেল। অনেক কাল আগে কাশতে কাশতে মাইতিমশায় তাকে তালগাছের নিচে দাঁড় করিয়ে কিরে কাটিয়েছিল। বলেছিল, আমি তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড় খগেন। অশক্ত। তুই জোয়ান। আমার বউটাও কচি। সুমতির দিকে তাকানো ছেড়ে দে বাবা। আমি আর কতদিন বাঁচবো। তুই কিরে কেটে বল এই তালতলায়—আমি আর পরনারীর দিকি চোখ তুলে চাবো না। ডাকলিও যাবো না।

ভদ্দরলোকের বউ যেমন হয়।

ঠিক জবাব দিলে না খগেন! তোমার কেমন লাগে?

এসব কথা বেছে বেছে আমাকে কেন বলা? আমি জন খাটি। তোমার দাদা আমার মহাজন। তার হয়ে সাপ ধরি। আমি খগেন নস্কর।

তা জানি বলেই তো বাড়ি না ঢুকে সিধে তোমার কাছে এলাম। ঘোড়ার মুখ থেকেই শোনা ভাল। শিবানীর তোমাকে কেমন লাগে?

এ তো মুশকিলে ফেললে বাবু। অন্যের মনের খবর কি করে পাবো? তবে গাঁ-গঞ্জ জায়গা তো দেখেন নি। খোলামেলা মাঠ। ঘুরে বেড়ান। সাপ ধরি বলে আমার সঙ্গে গল্প করতে অনেকেই ভালবাসে। তেমনি আপনার পত্নীও কথা বলেন আমার সঙ্গে।

তাই তো! তার বেশি কিছু না। তুমি শুধু খগেন নস্কর। খুব ভালো কথা তবে তুমি বাপু দক্ষিণ মালঞ্চের দরেও একটা আলাদা রকমের—

কি রকম বাবু?

এই যে ফতুয়াটি গায়ে দিয়েছো।

আগানে-বাগানে ঘুরি তো। গায়ে না দিলি কাঁটা ফুটে যায়। বিষাক্ত আঠা লেগে যায়।

ধুতিটি পরেছো হাফপ্যান্টের মতো।

আপনি ঠাট্টা করছেন বাবু।

মোটেই না খগেন। এসো। তোমায় সাবাস দিই।

খগেন সাবধানে এগোলো। বিপিনবাবুর মতোই যণ্ডাগণ্ডা বলা তো যায় না।

খগেনের হাতখানা ধরে ঝাঁকালো শিবানী বেচে গেল। বুঝলে খগেন। বেঁচে গেল। তোমার তো ইচ্ছে আছে—

ওঃ! সেই ইচ্ছের কথা বলছেন বাবু?

তুমি জানো নাকি?

একটু একটু! সবাই আজকাল বলে ইচ্ছে নেই! আসলে ষোল আনা ইচ্ছে আছে সবার। মনোমতো সময়মতে সুযোগ আসে না তো—তাই!

একদম বাজে কথা। আমার কোন ইচ্ছে নেই খগেন।

আমার আছে?

নিশ্চয় আছে তোমার খগেন। নয়তো অমন শুয়োরকুচি চুল ছেঁটে শরীর চেহারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছো কেন? তুমি

ভালো করেই জানো—তোমার চেহারার এই গড়নে—চুলের অমন ছাঁট—ফতুয়া, টাইট ধুতিই শুধু মানায়। ইচ্ছে না হলে এই মানানোটা আসে ?

তুমি বাবু তাহলে চুল ছাঁটো কেন ?

আমার এসবে কোন মানানোর ব্যাপার নেই। মনের মানুষেরও কোন ব্যাপার নেই। এটা শহরে থাকার জন্যে সবার ভেতর লুকিয়ে থাকার—হারিয়ে যাবার—ধরা না পড়ার বেশবাস। এই জামা ও এই জুতো। সবই খগেন—

ওঃ! খুব ভাল চাপান উত্তোর দিতে জানো তুমি। তবু তোমার বউ তোমায় চায় না ?

তাই তো লিখেছে বউদি। ভীষণ চিন্তায় পড়ে লেখা! বলতে বলতে হেসে উঠে বিজন চিঠিখানা পড়তে লাগলো। বাবু বিপিন বসুর বউয়ের লেখা চিঠি। তার মোদ্দা কথাটি—শিবানীকে এখান থেকে নিয়ে যাও—নয়তো চেরড়া কাল পস্তাবে। আর ফিরে পাবে না। সে এখন এক মাঝবয়সী সাপুড়ের কবলে। সে তোমার বউকে বশীকরণ করেছে।

চিঠিখানা শেষ করে বিজন বললো, দ্যাখো খগেন— আমার পক্ষে এটা কত বড় একটা আনন্দের খবর। আমি একটা ইচ্ছেশূন্য মানুষ। ভিড়ের ভেতর ভিড়ের পোশাক পরে হারিয়ে যেতে চাই। আর তার বউ কিনা ইচ্ছেয় টগবগে তোমার মতো একজন মানুষ পেয়ে গেল। এর চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে খগেন!

খগেন দিক-হারানো চোখে এই টগবগে জোয়ান মানুষটিকে দেখছিল। হঠাৎ বলে বসলো, তোমার মতো একটি সাপ আছে এখানে। তিনি আজ দু'মাস ধরে আমায় লেজে খেলাচ্ছে। গাছের, ঘাসের, আলের, পোড়ো ইটের রঙে গায়ের রঙ মিলিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। দেখা দেয়—আবার ডুবে যায়। কিছুতেই ধরা যায় না।

তারও ইচ্ছে নেই ?

তা জানি নে। সত্যি সত্যি বাবু—তোমার কোন ইচ্ছে নেই?

বিজন পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললো, কোন ইচ্ছে নেই।

এই পৃথিবীটা কেমন লাগে?

বুঝি না।

আচ্ছা, ধপাস করে এই আলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ো তো। যেন তুমি বাজে-পোড়া মরা একটি সুপুরি গাছ। ঝড়ে ঝরে পড়লে—

বলতে না বলতে বাবু বিজন বসু খোলা চোখে সিধে পাথুরে আলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধ্যাবড়া আওয়াজ হলো। গধাং—

মুখে কোন শব্দ করলো না বিজন। খগেন ছুটে গিয়ে চিত করে দিল। নাকে রক্ত। চোখের কোণে শুকনো ছুঁচলো ঘাস ঢুকে গিয়ে সেখানেও রক্ত। নিচের পাটির দাঁত চেপে গিয়ে ঠোঁটের কষেও রক্ত। একখানা হাত বেমক্কায় পড়েছে।

ভারি লাশ। খগেন অনেক কষ্টে মাটির ওপর তুলে দিয়ে বসালো। যেও না। আমি কয়েকটা পাতা নে আসি।

যেতে হবে না। দাঁড়াও। দাঁড়াও খগেন—

কেন?

ও একটু পরে সেরে যাবে। তার আগে বল তো—আমি পেরেছি ঠিকমতো?

কী জবাব দেবে খগেন। সে নিজের পায়ের পাতা থেকে এবার পাথর ফাটার আওয়াজ পেতে লাগলো।

ঠিক এই সময় শিবানী পেছনে বারান্দায় এসে চেঁচিয়ে ডাকলো। চা দিয়েছে খগেন—ডেকেই আবার ভেতরে চলে গেল।

খগেন বিজনকে বললো, পেরেছে।

জানতাম পারবো।

খগেন বললো, রক্তটা মুছে নাও।

নিলেই হবে এক সময়।

তার মানে ?

মুছে ফেলাও তো এক া ইচ্ছে। তাই না ?

ওঃ। তুমি চাও—সবাই দেখুক।

বিজন বসু সঙ্গে সঙ্গে হাতের চেটোয় রক্তটা মুছে ফেললো। ফেলে বললো, আসলে খগেন রাতের দিকেই আমি বিলিতি খাই। তখন খেতে ভালো লাগে। তার সঙ্গে চারটে করে কামপোজ। তারপর আমার এই ভারি লাশ বিছানায় ভাসে। পিঠের নিচে নদীর জল চলে আসে—-আমি আরও ভাসতে থাকি—

শরীরটা হালকা হয়ে যায়।

একদম। সিরিয়ালস খাওয়া তো একদম ছেড়ে দিলাম। তা বছরখানেক হয়ে গেল।

সূর্যটা খসে পড়ায় অন্ধকার লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আসছিল।

খগেন বললো, কি যে বলো—বুঝি নে।

ডাল, ভাত, রুটি আর খাই নে।

তবে কি খেয়ে থাকো ?

ফল খাই। দুধ খাই। সেদ্ধ মাংস। মাছভাজা—

খিদে পায় না তোমার ?

অভ্যেস হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে তিনশো বঠকি মারি। তিনশো করে বুকডন রোজ সকালে। বিলিতি যা থাকে শরীরের—সবটাই ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়। ঝরঝরে হয়ে যায় শরীরটা।

রাত্তিরে বিলিতি—ঘুমের বড়ি। সকালে এতখানি মেহনত। বয়স কত হলো বিজনবাবু ?

তা চল্লিশ প্রায়।

ঠিক হচ্ছে না বাবু। শরীরটা তো খাটের পায়া নয়। ইচ্ছেমতো টানা-হ্যাঁচড়া এ বয়সে কিন্তু সহ্য হবে না তোমার বিজনবাবু। শরীরেরও একটা অস্ত্র আছে—

আছেই তো। আমি দম বন্ধ করে যে কোন জায়গায় পড়তে পারি। ভেতরের কলকব্জা ইনট্যাকট্ থাকবে। বাইরে রক্ত পড়লেও ভেতরে কোন ইনজুরি হবে না।

এটা কি বলছো বিজনবাবু? বাইরে রক্ত পড়বে—আর ভেতরে কিছু হবে না। তা হয় নাকি?

আমার হয়।

তুমি ভগবানের তৈরি। আইন ভেঙে যাবে কোথায়? চলো, চা দিয়েছে।

সে তো তোমার জন্যে।

তোমার জন্যেও দেবে। বাড়িটা তো তোমার দাদার। চলো।

দুজনে যখন বাড়ির পেছনের দরজায় গিয়ে পৌঁছলো—তখন পুকুরের দিকের বারান্দায় আলো জ্বালানো সারা। বেতের চারখানা চেয়ার। সুন্দর টি-পট। তেমনি সুন্দর পেয়ালা।

বিজনকে দেখেই বিপিন লাফিয়ে উঠলো। তুই কখন এলি?

এই তো। আধঘণ্টার ওপর। খগেনের সঙ্গে গল্প করছিলাম।

সিধু তুমি নিজে গিয়ে চা করে আনো। তারপর বিজনকে বললো, এখানে এসে বোস।

বিজন গিয়ে বেতের ফাঁকা কেদারায় বসলো। খগেন বারান্দায়। বসেই বললো, কই গো বিপিনবাবু। আমার চা কোথ..?

এই তো নতুন চা হচ্ছে। এবারে নতুন করে খাবে।

সিদ্ধেশ্বরী অনেকদিন পরে নিজে চা করতে উঠে গিয়ে ফাঁকা রান্নাঘরে একা-একা দাঁড়িয়ে পড়লো। সে এখন ভয়ে কাঁটা। সিধু তার এই দেওরটিকে ভালো করে চেনে। তারই লেখা চিঠি পেয়ে বিজনের এখানে আসা—তা বুঝতে পেরেছে সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু একদম বুঝতে পারছে না যা—তা হলো—ওই চিঠি পাওয়ার পরেও খগেনের সঙ্গে গলায় গলায় হয় কি করে বিজন? বিশেষ করে পয়লা পরিচয়েই?

চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে এসে সিদ্ধেশ্বরী বসে পড়লো। আজ চা করবে শিবানী।

না। তুমিই করো, দিদি।

তোর বর এসেছে—তুই করবি। এ রসিকতা করেও সিদ্ধেশ্বরী দেখলো, শিবানী একটুও হাসলো না। বরং খগেনের দিকে ঝুঁকে হেসে হেসে কথা বলছে—তাও বিজনের সামনে। বিজন যদি এখন খগেনকে আচমকা এক লাথি কষায়? তাহলে কি হবে?

আমি তো আমার দেওরকে জানি। হাসতে হাসতেই গদাম করে ঘুষি বসাতে পারে।

চারদিকের মাঠ সবুজ হয়ে আছে। কিন্তু অন্ধকারে। এবার বর্ষাটা ভালো। সিদ্ধেশ্বরীর আচমকাই মনে হলো—তাহলে ওদের বাচ্চাটার কি হবে? চিরকালই হোস্টেলে-হোস্টেলে কাটাবে? তা হয় নাকি কখনো?

ওরই ভেতর শিবানী একবার বিজনকে বললো, কোন্ ট্রেনে এলে?

ট্রেনের নম্বর তো দেখি নি। স্টেশনে ঢুকতেই পেয়ে গেলাম। সবাই দেখলাম আমার ট্রেনটাতেই উঠছে।

আমার চিঠি পেয়েছিলে?

হু। সে তো মহাভারত একখানা।

তাতে যে খগেনের কথা বলেছিলাম—এই সেই খগেন নস্কর।

নিজেই তো আলাপ করে নিয়েছি। অনেকটা বার্ট ল্যাংকেস্টারের অল্পবয়সের চেহারা। দি রোজ টাট্টু দেখেছিলে তুমি?

আমি কি করে দেখবো? আমি তো তখন স্কুলে পড়ি। তোমার সঙ্গে তখন বিয়েই হয় নি।

তা ঠিক। হিরোইন ছিল বোধহয়—সিলভানো ম্যাঙ্গানিয়া। খগেন, তুমি হলিউডের ছবিতে ইজিলি হিরো হতে পারো এখনো।

অ্যাংলো-স্যাকসন কপাল তোমার। গালের চওড়া হাড়, ঝিক—সবই বার্টের মতো।

কি বলছো বিজনবাবু—কিছুই বুঝতে পারছি নে।

হাওয়াটা ঘুরে গেল বিপিনের কথায়। তুই এত মদ খাস কেন আজকাল? গরমের দেশ। শরীর নেবে না।

যার যেমন সহ্য হয়।

তাই বলে বেহেড্ হয়ে খাবি? শিবানী কষ্ট পায় মনে।

বেহেড্ হতে আমার ভালো লাগে। এই জন্মটাই ভুলে যাই।

পরদিন সকালে তো সব মনে পড়ে।

বড়দা। আমি আর কিছু মনে করতে চাই না। আমি এখন সব ভুলতে চাই।

ও সে রোজ অতটা করে মদ খাবি?

তুমি সাপ ধরাও কেন?

ধরি। ধরাই আর কি। এটা তো কারোবার একটা—

তোমার সুখ দালালিতে। ঘরে বসে যা পাওয়া যায়। আর খগেনটা মাঠে মাঠে সাপ ধরে ধরে মরে!

জিজ্ঞেস কর খগেনকে—ও পয়সা চেয়েছিল কিনা? নিজের এলেমে পয়সা?

খগেন নস্কর এই প্রথম ঝামরে উঠলো। এতদিন পরে। ও বিজনবাবু, এতদিন পরে এলে। কেন খামোকা বড় ভাইয়ের সঙ্গে তকরার করছো?

সিদ্ধেশ্বরী সেই সুযোগে পেয়ালায় পেয়ালায় চা দিয়ে দিল।

রাগে রাগে বিপিন বললো, তোর নিজের জীবনটাই নষ্ট করলি?

বিজন দাঁতে দাঁত চেপে বললো, জীবনটা যখন আমার—তখন নষ্ট করতে দাও না! তোমারটা তো নষ্ট হচ্ছে না।

হাজার হোক তুই আমার ভাই।

তায় আত্মীয়। কি বল?

রাতে ছাইপাঁশ গিলছিস। দিনে ওই অতগুলো বুকডন—

ছাখো একবার। আমার কোমর এখন তিরিশ। চেস্ট থার্টি-টু। একস্ট্রা ফ্যাট নেই কোথাও তোমার মতো। তুমি তো মাংসের একটা দলা।

সব জিনিস একসঙ্গে হওয়া যায় না বিজন। তুই অ্যাপোলো হয়েই থাক! কিন্তু তোর শরীর এই ধকলের দাম দেবে?

দিলে দেবে। কিছু করার নেই।

একদিন পট করে মরে যাবি বিজন।

গেলে যাবো—বড়দা।

শিবানী বললো, আপনার ভাই চেহারায় গ্রীক গড হয়ে থাকতে চায়। দিন না থাকতে!

গ্রীক গডেদেরও হার্ট অ্যাটাক হয় শিবানী। তোমারই দোষ শিবানী। তুমি থাকতেও ও এত বেহেড্ হবে কেন?

খগেনও বললো, সত্যিই তো বিজনবাবু। তুমি তাড়ি খেলে পারো। তোমার দাদা তো খায়। কখনো অত বেহেড্ তো হয় না।

বড়দার বেহেড্ হলে চলে? তোমায় দিয়ে সাপ ধরানো আছে না?

শুধু শুধু নিজির দাদার কুচ্ছো করছো তুমি। আমিই তো পয়সা চেয়েছিলাম। নিজির এলেমে যে পয়সা আসে। সে জন্যি বিপিন-বাবু কলকেতায় ফোন করে করে কারোবার বাঁধালো। এর মধ্যি কুচ্ছোর কি আছে?

বিজন কি একটা শানানো কথা বলতে যাচ্ছিল।

সিদ্ধেশ্বরী চেঁচিয়ে উঠলো। ও ঠাকুরপো। তোমার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

ও কিছু না।

খগেন ছুটে এলো। আগেই বলিছিলাম—

ও শিবানী। ঠাকুরপোর কি হলো গ্যাখ।

বিপিন উঠে দাঁড়ালো। বিজন হাত দিয়ে মুছে ফেলে বললো, শরীরের আশি ভাগ অসুখ আপনাআপনি সেরে যায়। দশভাগ অসুখ অষুধে সারে। বাকি দশ ভাগ ডাক্তারি বিভ্রাটে গোলমাল হয়ে যায়। জানো বড়দা—সক্রেটিস ডাক্তারদের উদ্দেশে বলে গেছে— চিকিৎসা করতে গিয়ে—ডু নো হার্ম।

খগেন কি একটি পাতা এনে হাতের ভেতর ডলে-ডলে রস বানালো। তারপর বিজনের মাথাটা কত করে নিজের বুকে নিল। বিজন ওভাবে কিছুতেই মাথা রাখবে না। টানাটানি করে ছাড়িয়ে নিতে চায়। কিন্তু বেমাক্কা বসেছে বলে মাথা সরিয়ে আনতে পারলো না।

খগেন রোসো বলে অনেকটা রস রক্তে ভেজা নাকে চালান করে দিয়ে মাথাটা ধরে রাখলো খানিকক্ষণ। নিজের বুকে। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললো, যত ইচ্ছে বকবক করো এখন—রক্ত কিন্তু আর বেরোবে না।

আমি ইচ্ছে করলেই রক্ত বের করতে পাবি। দেখবে—

শিবানী শুধু বললো, ওই দেখুন বড়দা। এ মানুষকে আপনি কি করবেন?

বিপিন অনেক দুঃখে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, বিজনটা চিরকালই গাধা। কিছু করার নেই.

বিজন চমকে সবার মুখের দিকে তাকালো। ও কিসের শব্দ বৌদি?

কোথায়?

ও যে—ভাল করে কান পেতে শোন।

বিপিন বললো, ও কিছু না। তোর মন দিতে হবে না।

না। আমি ঠিক শুনেছি। আমাকে চেপে যাচ্ছো তোমরা। কিসের শব্দ ও?

খগেন বললো, বৈশাখী পূর্ণিমায় ধরা পড়েছিলো। মেছো কেউটে। ভয়ঙ্কর জিদী। উনি বন্দী থাকতে চান না!

তা ছেড়ে দাও।

ছাড়লে ওর মাদীটি ধরতে অসুবিধা হবে।

তাই বলে আটকে রাখবে? তুমি কেমন গুণীন গো খগেন। আমার বউ তোমার এত প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছে আমায়—আর তুমি এ রকম? এখুনি গিয়ে ছেড়ে দাও।

না বিজন। এটা কারোবারের ব্যাপার।

গুলি মারো তোমার কারোবারে!

এটা আমার বাড়ি বিজন!

জানতাম। এইটাই তোমার শেষ যুক্তি বড়দা।

সিদ্ধেশ্বর এতক্ষণ কাঁটা হয়েছিল। তারই লেখা চিঠি পেয়ে তার ঠাকুরপো এসেছে জেনে। কিন্তু এখন সে আরও জেনেছে—খগেনের কথা লিখে শিবানীও তার স্বামীকে চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠি পেয়েও ঠাকুরপো এখানে আসতে পারে। তাহলে কেলেঙ্কারী বা গোলমাল—যা-ই হোক না কেন, তার জন্যে পুরোপুরি দায়ভাগ এখন তাকে আর বইতে হচ্ছে না। কিন্তু খগেনকে নিয়ে কোন গোলমালের চিহ্ন তো দেখাই যাচ্ছে না। বরং উলটোটাই যেন হচ্ছে। সিদ্ধেশ্বরী ভেবেছিল—কারোবারের চেয়ে ঠাকুরপো, জায়ের জীবন অনেক বড়। সে কথা বিপিনকে বলেও বোঝাতে না পেরে সে একটা অপারেশনের আশা করে ঠাকুরপোকে চিঠি লিখেছিল। আর তার ফল এই!

রাতে খেতে বসে শুধু তিন পিস মাছভাজা আর একটু লাউ শাক খেল বিজন। মুখ ধুতে উঠে বললো, আমি কালই ভোরের ট্রেনে চলে যাবো।

বিপিন কোন কথা বললো না। সে তার এই ভাইটির জন্যে কষ্ট পাচ্ছিল। এক সময় মনে হচ্ছিল—বিজনটা একটা সেলফিস

ফুল। আবার মনে হচ্ছিল—কী ভ্রান্ত! একে ফেরাবে কে? শিবানীর কম্ম নয়। খেতে বসে দুই ভাইয়ে একটাও কথা হয় নি। সিদ্ধেশ্বরী দেরিতে এসে খেতে বসলো। সে এতক্ষণ ছোট জা আর ঠাকুরপোর জন্য ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করেছে। আলো জ্বেলে মাথার বালিশে কাচা ওয়াড় পরিয়েছে। ফুল আঁকা। মাথার কাছে একজোড়া জলের গ্লাস ঢাকা দিয়েছে।

শুতে গিয়ে দোর দিল শিবানী। দিয়েই পাশ ফিরে চোখ বোজা সারা।

বিজন একবার বললো, আমায় একটু জল দাও। একদম নীট খেতে পারি নে।

এখানেও সঙ্গে করে এনেছো?

কেউ টের পায় নি। পকেটে ছিল। একটা বড়ি খাবে?

মরতে আমি কেন খাবো?

কেন? বিয়ের সময় তো আমাদের খুব ভালোবাসা ছিল।

সে কবেই চুকে-বুকে গেছে।

বাবু বিজনকুমার বসু তার পত্নীর সঙ্গে আর একটাও কথা বললো না। নিজের রোজগার কোটা শেষ করে যখন শিবানীর পাশে শুতে এলো—তখন বাগানের দিকে খোলা জানলায় অন্ধকার আকাশ থেকে তিনবার বিদ্যুৎ চমকালো। পরিপাটি বিছানা। মাঠের ভেতর বাড়ি। অথচ মাথার কাছে বেড-সুইচ। পিঠের নিচে শীতল পাটি।

আলোটা নিভিয়ে দিয়েই আবার জ্বালালো বিজন। ও কিসের শব্দ হচ্ছে? সেই শব্দ?

শিবানীর দিক থেকে কোন জবাবের বদলে ফিকে একটা নাকের ডাক শুনতে পেল।

এবার শব্দটা আরো জোরে। এই মেছো কেউটে? বলে একবার চেঁচিয়ে উঠলো বিজন।

পাশের ঘরে বিপিন সিদ্ধেশ্বরীকে বললো, একবার উঠে দেখবো ?

না। কোন দরকার নেই।

বিপিন বললো, উঠেই বা কি হবে ? এতক্ষণ নিশ্চয় ঘুমের বড়ি খেয়ে বসে আছে।

কি করে বুঝলে ?

লক্ষ্য করে দ্যাখো—গলার স্বরটাই কেমন অচেনা হয়ে গেছে বিজনের।।

ঠাকুরপো মানুষটাই কী রকম অচেনা হয়ে গেল।

বাবু বিজনকুমার বসু ততক্ষণে তার পত্নী শিবানী বসুকে কাঁচা ঘুম থেকে তুলেছে। শিবানী ঝাঁঝ দিয়ে বললো, এখানে এসেও অসভ্যতা ?

এখনো করি নি। করতে পারি। জানলায় গিয়ে দ্যাখো—কী তোড় বাতাসের। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির ছাঁট।

আষাঢ় মাসে এসব দ্যাখো নি নাকি কোনদিন ?

সারা জীবনই তো মাসগুলো দেখে আসছি। শুধু তোমাকেই দেখা হয় নি ঠিকমতো।

আমি আর তোমার নেই বিজন।

সে তো জানিই। জেনেশুনেই আমি এসেছি এখানে। আসলে তুমি কে বল তো ?

আমিও ঠিক জানি নে। তবে তোমাকে তো সবই খুলে লিখেছি। এক একদিন রাতে মনে হয়—আমার মাথার ভেতরে নগর বসেছে। আমি অস্পষ্ট আলো আর ঠাণ্ডা বাতাসের ভেতর দিয়ে নিশুতি রাতে মাঠ ভেঙে কোথায় চলে যাই। ভোরে উঠে কিছু মনে করতে পারি নি একদিনও। একটা উঠোন। উঁচু অস্পষ্ট জঙ্গলের ওপারে খগেন। মুখটা ভালো করে দেখাও যায় না। ভোরবেলা বড়দি বলে—হ্যাঁরে শিবু, তোর শাড়ির পাড়ে এত

চোরকাঁটা এলো কোথেকে? অথচ আমি কিছুই বলতে পারি না— আমার যে স্পষ্ট কিছুই মনে থাকে না। সব আবছা।

ফাইন আইডিয়া। শেষবারের মতো একটু কাছে এসো। আমারও কাল সকালে কিছু মনে থাকবে না।

এক পাঁইট রাম খেয়েছো ঢক-ঢক করে। চারটে ক্যাম্পোজ। তোমার তো কিছুই মনে থাকবে না। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে ঢক-ঢক করে জল খাবে দু গ্লাস। একদম ফ্রেশ।

আমার রুটিন একটুও পালটায় নি? তাই না?

একটুও না।

ভোরে এখানে ডন বৈঠকের জায়গা আছে?

অঢেল মাঠঘাট পড়ে আছে বিজন। যত ইচ্ছে দাও গে। আমাকে এখন ঘুমোতে দাও। দোহাই!

এক্ষুণি ঘুমোবে। আচ্ছা, তুমি তো তাহলে এখন পরনারী?

শিবানী কোন কথা বললো না।

তাহলে তুমিই তো এখন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং।

এবারও কোন জবাব দিল না শিবানী। সে জানে, বিজন একটু পরেই অজ্ঞান হয়ে ঘুমোবে। আর কয়েক মিনিটের ভেতর। মন্দা কেউটেটা আজ বড় বাড়াবাড়ি করছে। বাইরে বাতাসের গোঙানি। হয়তো বড় ফোঁটার বৃষ্টি এলো। সেই সঙ্গে মেঘের গজরানি। অসহ্য।

মাঠঘাট তো সবই খগেনের দখলে। আমায় কি ডনবৈঠক দিতে হবে শেষে?

উলটো পিঠে শুয়েছিল শিবানী। সেই অবস্থাতেও তার হাসি এসে গেল। কিন্তু হাসতে গিয়ে দেখলো, কান্না আসছে। কি ব্যাপার? সে বিজনের দিকে পাশ ফিরে বললো দেবে। আমি খগেনকে রিকোয়েস্ট করবো। যদি না দেয় তো তুমি খালপাড়ে দৌড়ুতে পারো।

খালপাড়ও তো খগেনের এক্তিয়ারে।

কী ভাবলো শিবানী। তাও সত্যি। তারপর বললো, ঘুমোও তো এখন।

না। ঘুম আসছে না।

শিবানী চোখ দেখে বুঝলো, যেহেতু বিজন এখুনি অজ্ঞান হবে।

কিন্তু বিজনই চোখ খুলে বললো, তুমি একটু ল্যাংটো হও।

না। কিচ্ছু হবো না।

আমি কিছু করছি না শিবানী। তুমি তো এখন পরনারী। সেজন্যেই তো ইন্টারেস্টিং। ইচ্ছেটাও তাই জাগলো—

আচ্ছা! তা হলে ইচ্ছে হয় তোমার? এই না বলেছিলে—কোন আর ইচ্ছে নেই তোমার।

তুমি নিশ্চয় জাগাতে পারো।

তাই নাকি? আমাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তাহলে?

কেন একথা বলছো? তুমি খগেনের মতো লোককে জাগিয়ে তুলেছো। এ কি কম কথা।

খগেন কেমন?

দারুণ শিবানী। জীবনে আজই প্রথম আমি জেলাস হচ্ছি।

কেন? একথা কেন গ্রীক গড্। এত দিন পরে? খগেন তো শুধু সিরিয়াল খায়। পান্তা ভাত। মাঝে মাঝে তাড়ি।

গালের ঝিক দুটো কী সুন্দর উঁচু। গালের দু-পাশে একসেস ফ্যাট নেই কোন। মাথার চুলগুলো শুয়োরকুচি। গায়ে ফতুয়া। হাঁটু অব্দি ধুতি। কেমন হাড়েমাসে পাকানো শরীর।

তুমি শরীর ছাড়া আর কিছু চিনলে না বিজন?

ভালো কথা। ল্যাংটো হলে না?

খুশি হবে হলে?

ফার্স্ট তুমি ল্যাংটো হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকো। তারপর চিত। আমি দেখবো।

জামা খুলতে খুলতে শিবানী বললো, হঠাৎ এ ইচ্ছে হলো কেন?

সেদিন বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ছুটো পেইন্টিং দেখলাম। অ্যানাটমি ঠিক করেছে কিনা—তোমায় দেখে চেক করে নেব।

তাই বলো। আমি ভাবছিলাম—আমার শরীরে বুঝি তোমার ইচ্ছে জেগেছে।

শেষ অবধি শিবানীকে ল্যাংটো হতে হলো না। আচমকাই বিজন নাক ডাকতে লাগলো। এখন বিজন একটানা চার-পাঁচ ঘণ্টা পাথর হয়ে থাকবে।

বেড স্যুইচ্ টিপে ঘর অন্ধকার করে ফেললো শিবানী।

একই স্যুইচ্ টিপে ঘর আলো করে ফেললো বিজন। হাতঘড়িতে সাড়ে চারটে। গলা শুকিয়ে কাঠ। উঠে ছু-গ্লাস জল খেয়ে ফেললো পর পর। তারপর অন্ধকার জানলায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বাতাস মাথায় মুখে মেখে নিতে লাগলো। এখানে কোথায় সে এক্সারসাইজ করবে। ডন দিতে দিতে আড়াইশোতে পৌঁছে বিজনের আজকাল আলাদা একটা আনন্দ হয়। আর পঞ্চাশটা দিতে পারলেই তিনশো। ছুশো একানব্বইয়ের সময় একটা মুক্তি এসে ঘেমে-যাওয়া শরীরের সামনে দাঁড়ায়। শরীরের ভেতর সব কলকজায় তখন গ্রিজ পৌঁছে যায়।

এবার গোহাল ঘর থেকে সেই সন্ধ্যেবেলার গজরানি ফেটে পড়ছে। বিজন ছু-বার শিবানীকে ডাকলো। কোন সাড়া নেই। মেছো কেউটের শাসানি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। বিজনের খুব খারাপ লাগলো। তখনো তার চোখের ছুই পাতা রীতিমতো ভারি। মাথার ভেতরে আস্ত একখানা পাথর। নাকের জায়গাটায় কোন সাড় নেই। তবু একটা ভারি মস্ত আরাম তার সারা শরীরে।

এখান থেকে ফার্স্ট ট্রেনে কলকাতার বাজারগুলোর জন্যে মাছ যায়। আর যায় ভিখারী। ঠিকে ঝি। ডাবওয়ালা। চোর। তাড়ির পিপে। গোল গোল। কাঠের তৈরি। মাঝে মাঝে ছুধও যায়। বিজন অঙ্ক করে দেখলো, এখুনি বেরিয়ে পড়তে পারলে, কলকাতার ফ্ল্যাটে সাড়ে ছটার ভেতর ডন-বৈঠক দেওয়া শুরু করা যায়।

একদম শব্দ না করে বিজন তার ট্রাউজার, বুশশার্ট, শু পরে ফেললো। বুক পকেটে বৌদি আর শিবানীর চিঠি।

খুট করে পুকুরের দিকের দরজা খুলে বিজন অন্ধকার বারান্দায় এলো। তারপর লাল বারান্দা। মাথায় ছাদ। এখানে তার বড়দা আসর করে তাড়ি খায়। সঙ্গে চিতি কাঁকড়া ভাজা।

বাড়ির সামনের লনটুকু পেরোতে পারলো না বিজন। খোলা আকাশের নিচে মেছো কেউটের গজরানি এখন একদম নির্জন।

এ কি অন্যায় খগেন? মনে মনে বলেও বিজন বাকি যুক্তি গুলিয়ে ফেললো। সে বলতে চাইলো—তুমি খগেন নস্কর একজন গুণীন। তোমার তো কিছু অসাধ্য থাকার কথা নয়। তবে তুমি ওকে কেন আটকে রেখে কষ্ট দিচ্ছো? দাদার কারোবার? গুলি মারো কারোবারে।

বিজন গিয়ে গোহালে ঢুকলো। সেখানে তখন ধুন্দুমার কাণ্ড। দুটো গাই বড় বড় স্তূপে গোবরের মন্দির বানিয়ে ফেলেছে। বাছুর-গুলো বাঁধা। সিমেণ্টের চৌবাচ্চায় অঢেল জাবনা। ফেলে ছড়িয়ে একাকার করেছে।

বিজন শব্দ ফাঁলো করে একটা মেছলার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মুখে ডিজেলের পিপের কাট। মুখ পাথর চাপা দিয়ে বসানো। আর ভেতর থেকে শুধু গর্জন। অন্ধকারেও বিজন সাপটাকে দেখতে পাচ্ছিল। মোটা পাতের টিনের ওপারে লেজে বিড়ে পাকিয়ে ঠেলে উঠছে। আর ফণার মাথা দিয়ে টিনটাকে গুঁতোচ্ছে। আর অমনি প্রচণ্ড গর্জন। সেই সঙ্গে ফোঁসফোঁসানি।

খেলাটা মন্দ না। বিজন একপাশে সরে দাঁড়িয়ে পাথরখানা ঠেলে ফেলে দিল। আর অমনি ফণার ধাক্কায় টিনটা পড়লো—বিচুলির আঁটিতে—নিঃশব্দে।

এবার বিজন পরিষ্কার দেখলো—মোটা কালচে একটা রবার ছিটকে পড়লো। গোহালের মেঝেতে—তারপর মাঠে।

দশ

আজ ভাদ্র সংক্রান্তি। কাল রান্নাপুজো। আজ সারা রাত ধরে ঘরে ঘরে রান্না। মাঠে মাঠে আমন ধান। স্থির। গর্ভবতী থোড় এখন গোল হচ্ছে। চালতার অম্বল কুটছিল বেম্পতি। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠোনে বসা বজরাকে বলছিল—ওই পোড়ো বাড়িটা লোকজন করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারিস। যা খরচা লাগে আমি দেব।

বজরা বললো, পঞ্চাশটা টাকা দিও। আমি সব করে দেব।

অত পারবো না বাবা। তিরিশ টাকার ভেতর করে দে। তোর বাবা আবার রাত-বিরেতে কখন ওর ভেতরে গিয়ে বসে থাকবে—আর শেষে সাপে কাটবে।

হাজরার বউ কচু শাকের বোঝা নিয়ে এসে দাঁড়ালো। কোথায় রাখবো?

বেম্পতি ঝাঁঝিয়ে উঠলো। আমার মাথায়! কেন? নিজি বসে বসে কাটো না।

বঁটি কোথায়?

আমি খুঁজে দেব!

এর ভেতর হাজরা এসে বললো, মা। ওদের ডালনা বানাও দিকি নি। কত দিন খাই নে। মাখো-মাখো করে ঝোল।

তা দুটো চিংড়ি ধরে আন না খাল থেকে—ডালনায় দেব।

ওদিকে যাবার উপায় নেই। বাবা বসে আছে।

সে মাদী কেউটেটা কবে ধরা পড়বে বল তো? আমার আর সয় না।

কচুডাঁটার ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে হাজরার বউ বললো, সে-মাদীকে আর ধরেছে! মদ্দাটি কেটে যাবার পর—

বেম্পতি চালতা থেঁতো করছিল। সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, সরষে। সেই অবস্থাতেই খুব গম্ভীর মুখে বেম্পতি বললো, তাও তো বটে। এখন কী ওদের ধরা এত সহজ হবে?

উঠোনে বাঁশের মাচায় বসে বজরা। তার বাঁ পায়ের গোড়ালিতে একটি বাবলা কাঁটা বিঁধে আছে। ঘটি সেফটিপিন পুড়িয়ে সেই কাঁটা বের করে দিচ্ছিল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

ভাদ্র আশ্বিনে দক্ষিণ মালঞ্চের বাতাসে ভয়ঙ্কর তাত। বেলা বাড়লে পায়ের নিচে মাটি থেকে তাপ ওঠে। বেশি বেলায় তালের তাড়ি গাদসুদ্ধ খেলে পেটের ব্যথা কে আটকায়? সারা পৃথিবী রসস্থ। এই সময়টায় মুখ ফেরাবার জন্যে মা মনসার পুজোর নাম করে এই রান্নাপুজো—কিংবা পেট পুজোও বলা যায়।

তবে খানাখন্দ, খাল বিল, বাড়ির পুকুর—সব জায়গা এখন জলে জল। গাছপালা সব জলে ভিজে সপ সপ করে। তাই ডাঙা জায়গা বেছে নিয়ে মা মনসার সাঙ্গোপাঙ্গোরা সেখানে উঠে যায়। তখন মানুষ আর ওরা পাশাপাশি—কাছাকাছি থাকে। কেউ কারও কোটে যায় না। মাটির দেওয়ালে গোল হয়ে বিঁড়ে পাকিয়ে তখন ওনাদের বসবাস। সে গর্তের দেওয়াল অব্দি তেল-পেছল।

এর ভেতরে আহার, মানে জলের কিনারায় গিয়ে বোকা-সোকা পুঁটি, তে-চোকো মাছ, বাদুলে পোকা, কখনো-সখনো ভুঁইপোকা—না হয় উচ্চিংড়ে।

আহারের সময়টা নিশুতি রাত—নয় তো ভর দুপুর। দুপুর—কেননা, ওই সময়টা বাসায় থাকা যায় না। ভ্যাপসা গরমে দম বন্ধ হয়ে আসে।

এখন সকালবেলা। বেম্পতি গরু বেঁধে দিয়ে এসেছে রেল-লাইনের গায়ে। ছাড়া রাখা যায় না। তাহলে ধানে মুখ দেবে। উঠোনের বাইরেই সাত আটখানা রং। ধানের কালচে সবুজ। মাটির ছাই কালো। হাজরা বজরা তামাটে। গাইগুলো ফ্যাকাশে

—টাটকা ঘাসের অভাবে। ঘরের গোলপাতার ছই তিন বর্ষায় পচে-পচে মাটি কাদা। শুধু দক্ষিণ মালঞ্চের ধর্মের ষাঁড়টি স্টেশন বাজারে জিলিপী খেয়ে, গমকলের ঝড়তি-পড়তি ভুষি খেয়ে আর বিড়ির দোকানে রেডিও শুনে শুনে সমান স্বাস্থ্যবান—সমান উদাসী হয়ে ধীরে-সুস্থে হেঁটে বেড়ায়। ছাড়া থাকে। কিন্তু কখনো ধান-ক্ষেতে নামে না। জানে, ওভাবে নেমে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে পাবলিক নিদারুণ মার দেয়।

মেজদার পায়ের কাঁটাটি তুলে ফেলে একখানা দশ পয়সা পেল ঘটি। বললো, আমি দুটো চিংড়ি আনতে পারি মা। আনবো?

কোত্থেকে?

খালের তেমাথানীতে। বাবা জানে না জায়গাটা। জানলেও সেদিক পানে যায় না।

তোর বাপ জানে না—এমন জায়গা দক্ষিণ মালঞ্চে আছে নাকি?

ঘটি বেরিয়ে পড়লো। সারা পৃথিবী এখন তার বুক সমান। ধান গাছ দিয়ে ঢাকা দুনিয়া এখন এই অমরলতার মাথা অব্দি ফেঁপে ফুলে উঠেছে। সারা তল্লাটে।

তেমাথানীতে ঘটি এসে দেখলো, কাশের ফুলঝাঁটা মাথাগুলো বাতাসে একদিক কাত হয়ে হাওয়া খাচ্ছে। পাশেই বাঙালদের পুকুরে নাল ফুলের ছয়লাপ। দুটো জিনিসই কাল ভোরে লাগবে। বাবা শুদ্ধাচারে রান্নাপুজোর চুলোর ছাইয়ে নাল ফুলের মালা আর কাশের গোছা রেখে গড় হয়ে পেন্নাম করবে। ফি বছর তাই করে আসছে খগেন নস্কর।

সিদ্ধেশ্বরীও আজ খুব ভোরে উঠেছে। উঠে ছোট জাকে ঘুম থেকে তুলেছে। কলকাতায় যাবি নে? আজ না তোর হোস্টেলে গিয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা করার কথা।

তোমার দেওর যাবে 'খন।

সে তো তোর কেউ নয় এখন আর।

শিবানী কোন কথা বললো না। মুখ হাত ধুয়ে ভালো করে মাথা আঁচড়ালো। তারপর সোজা ভাসুরের ঘরে গিয়ে হাজির হলো। বাবু বিপিন বসু ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্টেশনে লোক পাঠিয়ে কাগজ আনায় রোজ। তারপর সম্পত্তি বাড়ি জমির কলমগুলো তন্ন-তন্ন করে পড়ে। সেগুলো মুখস্থ হয়ে গেলে ভাবতে বসে – তাহলে পৃথিবীতে আকাশের নিচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার মতো দক্ষিণ মালঞ্চ আছে। সব দক্ষিণ মালঞ্চেরই কি একটা করে খাল থাকে?

ভাদ্রবউকে ঘরে দেখে বিপিনবাবু তাকালো, কি শিবু?

আমার জন্যেই আপনার কারবার লাটে ওঠার যোগাড় বড়দা।

একদম না। ওই যে একদিন বিজন এলো—এসেই সব ভণ্ডুল করে দিয়ে চলে গেল। নিজের ওপর দিয়ে মানবতা প্র্যাকটিস করতো তো বুঝতাম।

একথা এই দু-মাসে অনেকবার বলেছে বিপিন। মানেটা জানে শিবানী। সেদিন শেষরাতে কলকাতায় কেটে পড়ার আগে কেন যে মদ্দা কেউটেটাকে ছেড়ে দিয়ে হিউম্যানিটি দেখাতে গেল? তারপর থেকে খগেনকে আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখা যায় না। তার ঘরবাড়ি এখন খালপাড়, বাঁশবাগান, ঝামা ইটের পোড়ো পাঁজা, আর আতাবাগান। দিন নেই, রাত নেই, খগেন নস্কর খালের জলের কিনারে কিনারে। আতাবাগানের লতা ধরে ঝুলে দেখে। ওই বুঝি মেছুনী সড়সড় করে নেমে পালালো—রেলের জাঙালের দিকে।

আপনি ঠিক জানেন বড়দা? আপনার ভাই-ই মেছোটাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে?

আমার ভাই ছাড়া কে আর শেষ রাতে অমন ক্ষ্যাপা সাপ হ্যাণ্ডেল করবে? ওর কি জীবনের মায়া আছে? না অন্যের জন্যে কোন চিন্তা আছে?

আমি চলে যাই বড়দা। আমি নিজে খারাপ। আমি এসেই আপনার কারবার খারাপ করে দিলাম।

তা কেন শিবু? বিজন এসে মেছোটা রিলিজ করে দিল। আর অমনি মেছুনী উধাও। মেছুনীকে না ধরা অব্দি খগেনও অন্য কোন সাপে হাত দেবে না। কেন যে এই ধনুকভাঙ্গা পণ—আমি বুঝি নে শিবু। বুঝে উঠতে পারি নে। আর এদিকে আবার কলকাতার তাগ দা।

একঝাড় কাশ। খালের তেমাথানী অব্দি ধান রুয়েছে। সবুজ ধানগাছে পৃথিবীটা উঁচু হয়ে গিয়ে আকাশে মিশেছে। শাদা মেঘের এক ধামা আকাশে মাঝে মাঝে কালো ফুটকি বসানো চিল।

ঘটি খলবল করে এগোচ্ছিল। সারাটা মাঠ সবুজ। তাব ভেতর শাদা কাশের এই ঝাড়—একদিকে হেলে পড়ে ঘটির মতো নিত্য রসচোরাকেও অনমনা করে দিল। সারা মাঠে যে কত রং—চোখের আ বাম—এলোমেলো ছড়িয়ে থাকে। ঘটি এগিয়ে গিয়ে যেই না কাশের গোছা ধরে ওপড়াবে বলে টান দিয়েছে—অমনি—

একজোড়া সাপ একসঙ্গে মাথা ঠেলে উঠল। হে মা মনসা! এ তুমি কি করলে? আজ সারারাত তোমাব জন্যে রান্না। কাল সকালেই তোমার পুজো। এমন দিনে তুমি অমন হ য় যাচ্ছো কেন?

ঘটি অসুবিধের ভেতর এক খারাপ জায়গায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরম মাটির নিচেটা যে ফাঁপা, তা সে বুঝতে পারে নি গোড়ায়। আরে! এ যে সেই মেছো আর মেছুনী! বোসো। এত তেজ ভালো না। আমি খগেন নস্করের ব্যাটা; ছোট ব্যাটা। ঘটি নস্কর। অ মার বেকাদায় পেয়েছো বলে তাই—

সাপজোড়া আঁষটে গন্ধ ছড়িয়ে প্রমাণ সাইজের ফণা তুলে ঘটির বাঁ পা-খানা তাগ করেছে। জোড়া ~ণার জোড়া চিত্তির। বাতাসে মাছের গন্ধ। মাছের খটিতে নীলামে এ গন্ধ পেয়েছে ঘটি। শেষ রাতে ল্যাটা, শোল, পাঁকাল চুরি করতে গিয়ে।

মিহি বাতাসে এই শেষবারের মতো কাশের ঝাড় দুলছিল। সেই দুলুনিতে মেছো-মেছুনীও দুলছে। ঘটি জানে—এ হলো গিয়ে ছোবলানোর আগের শেষ মহড়া। কেন যে ওদের ডালনায় জন্যে চিংড়ি ধরতে এলাম খালে। আজ এখানেই আমার জানাশুনো পৃথিবীর শেষ। মাগো—

ঘটি খেয়ালই করে নি—এতক্ষণ আধা ওপড়ানো কাশের গোছা ধরে সে টাল সামলে বেকাদায় দাঁড়িয়েছিল। যেই না কাশের গোছা উপড়ে তার হাতে চলে এসেছে—আর অমনি—

ঘটির সারাটা শরীর ডিগবাজি খেয়ে ধানক্ষেতে গিয়ে ছিটকে পড়লো। মাথাটা মোটা আলে পড়ে ভারি শব্দ হলো তার শরীরের ভেতর। পায়ের নিচে মাটি ভেঙে পড়ে মেছো-মেছুনীর মাথায় ঝুরঝুর করে ছড়িয়ে পড়েছে নিশ্চয়।

নয়তো ওরা ছোবলালো না কেন? আশ্চর্য! এইভাবে কেউ বাঁচে?

গড়িয়ে পড়া ঘটির ডান হাতখানার পাশ দিয়ে দু-খানা কালো বিদ্যুৎ পরিষ্কার দিনের আলোয় সিধে গিয়ে বাঙালদের পুকুরের পাতিঘাসে ডুবে গেল। পুকুরটা তখন নাল ফুলের লালচে পাপড়িতে জলের খানিকটা আভা ধরিয়ে দিয়েছে।

ঘটি ভালো করে কাশের গোড়ার ঝুরঝুরে মাটি দেখলো। জায়গাটা নির্ঘাত ইঁদুরের গর্ত। গত সনের গর্তই হবে। মাটি নয় তো এত ঝুরঝুরে হয় কখনো! ইঁদুর খেদিয়ে জোড়ে এসে বাসা বেঁধেছিল। বড়দাকে খবরটা দিতে হয়। তাহলে এখুনি খোন্তা আর ধামা হাতে ছুটে আসবে। হাজরাদার কাজ এখন একটাই। গর্ত খুঁজে বেড়ানো। সাপ খেদিয়ে ইঁদুরের মজুত ধানটা হাতানো।

কোনদিন না প্রাণ দেয় বড়দা এভাবে। মা যে কেন হাজরাদাকে আমাদের হেঁসেলে ভর্তি করে নেয় না, বুঝি নে। আমরা খাবো।

আর সহোদর ভাই না খেয়ে বসে বসে দেখবে? আমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বো, আর বড় ভাই খিদে পেটে বসে থাকবে? এ হয় নাকি কখনো? না চলে এসব?

ঘটি জানে—এই ভ্যাপসা গরমে মেছো-মেছুনী বাঙাল পুকুরে নামবে। নেমেই কোথায় যেতে পাবে তার জানা। সে তো ফি বছর পুজোর জন্যে নাল ফুল তোলে। মালা গাঁথে। বাবা পুজোয় বসার আগে সে নিজে কাশের গোছা, নাল ফুলের মালা চুলোর ছাইয়ের ওপর সাজিয়ে দেয়। ডুব দিয়ে দিয়ে সে নাল ফুলের গোড়া অব্দি গেছে ঘটি—একদম পুকুরের পাতালে—অন্ধকার—কা অন্ধকার—সেখানে নালে নালে মা-মনসার লোকজন পাক দিয়ে জড়িয়ে পড়ে আছে। পৃথিবী তখন গরম—তখন ওরা ওখান থেকেই ঠাণ্ডা খায়—ঠাণ্ডা পায়। এক সনে তো ঘটির পা মা-মনসার ওই মরণ জটায় আটকে যাচ্ছিল প্রায়।

আজ খুব বাঁচা বেঁচে গেছি।

তেমাথানী ছাড়িয়ে বাপের মুখোমুখি হলো ঘটি—খালের পাঁক-মাটির গায়ে জলের কিনারায়। খগেন নস্কর আজ বাড়ি যায় না প্রায় তিন চার হপ্তা। শোওয়া বসা এই খালপাড়েই। চলাফেরা এক গর্ত থেকে আরেক গর্তে। কেউ কেউ বলে—নিশুতি রাতে নাকি খগেনের গলা পাওয়া যায়। আয়! আয় বাবা—এবারে ধরা দে।

খগেনের চোখে তাকিয়ে ঘটি কোন কথাই বলতে পারলো না। সে জানে, মেছো-মেছুনী এখন কোথায়?

খুব ভয়ে ভয়ে বললো, বাপ, দুটো চিংড়ি মাছ দরকার ছিল।

বাজার থেকে কিনে নে গে।

বাজার উঠে গেছে, বাবা। তুমি একদিকটা যদি পাঁক দিয়ে বেঁধে দাও—আমি ছেঁচে-ছেঁচে জল মেরে ঠিক মাছ পেয়ে যাবো।

ঘটি সত্যি কথাই বললো। গণে গণে মাছের ডিম ভেসে আসে

এখানে। খোসারহাট থেকে। সেখানে নোনা নদীর সঙ্গে এ-খালের বে হয়েছে। ছানাপোনাও ভেসে আসে। তাই খানিক জল ছেঁচলেই চিংড়ির গুঁড়োগাঁড়া পাওয়া যায়।

ঘটির কথায় খগেন খেঁকিয়ে উঠলো। জলে নামলে পা ভাঙবো তোর।

কাল রান্নাপুজো বাবা। আজ তুমি চান-টান করে ঘুমোলে পারতে।

পালা। মেছুনীকে ধরে পর আমি চানে যাবো। এখন পালা।

মা ওলের ডালনা বসাবে মা-মনসার জন্যি। দুটো চিংড়ি যদি—

ডালনা ছাড়াই চলে যাবে মা মনসার। এখন জলে নামিস নি। আমি গণ্ডী টেনেছি—

ও বাপ! এ কাজ করলি কেন? অনেক বোকা-সোকা প্রাণ যাবে যে বাবা।

যাবে তো কিছু ব্যাঙ। তা যায় যাক।

নিশুতি রাতে যারা আহারে যাবে—তারা তবে কি খেয়ে থাকবে বাবা?

সে ভাবনা তোর নয়। এমনিই তো সাপের আহার হয়ে নিৰ্বংশ হচ্ছে ব্যাঙগুলো। তার চেয়ে জলে জলেই শীতলে মরুক।

ঘটি তার বাপের সঙ্গে ঘোরা লোক। গণ্ডীর মানে সে জানে। খগেন খানিক জায়গা ঘিরে শ্বেত আকন্দের নরম ডালের খুঁটি বসিয়ে দেয় চার কোণে। তার ভেতর গর্তে প্রাণী পড়লেই সাবাড়। চিত চিত হয়ে ভাসতে থাকবে খানিক পরে। একটা দুটো কচি কাঁচা ব্যাঙ এরই ভেতর ভাসতে লেগেছে।

এ ব্যাঙ মারার ব্যবসা ধরলি কবের থে, বাপ? ঘটি প্রায় কেঁদে উঠলো। ওদের সে ব্যাঙাচি অবস্থা থেকে চেনে। তখন ওদের সঙ্গে ঘটি বাঙাল পুকুরের ঘাটলার চান করে। গামছার কাঁদে ধরে আবার ছেড়ে দেয়। এই দক্ষিণ মালঞ্চে প্রায় সব ক'টা

পুকুরের উঁচু পাড়ে চেনা গর্ত দেখে খুঁড়ে যাচ্ছিল। কেমন ফাঁপা-ফাঁপা শব্দ। মাথার ওপর শুধু একটা জিওল গাছের ছায়া। তাতে পিঠ ঢাকে না। সেখানে রোদ্দুর নেমে এসে ঘামের হরিহর ছত্রে মেলা বসালো। গর্তটা বড় মতো। পাশেই ধান হয় ফি সনে। চাই কি ধেড়ে ইঁদুরেরা তিরিশ সের মতো ধান এনেও মজুত করে রাখতে পারে। সাপ থাকতে পারে। নাও থাকতে পারে। থাকলেই বা। খেদিয়ে লাট বানাবো। আমি খগেন নস্করের বড় ব্যাটা। কালই তো মনসার পুজো। আজ রাতভোর রান্না যাবে। কাল সকালেই শুদ্ধাচারে ভোগ। পুজো। ঘটি এসে কাশের গোছা যোগাড় করে নে গেছে। নাল ফুলের মালা গাঁথবে বিকেলভোর। দেশসুদ্ধ এমন কত গর্ত ছড়িয়ে রেখেছে ভগবান। কত খুঁড়বে হাজরা? ভালোমতো এমন কিছু গর্তের হদিস পেলে সে কয়েক মাস দিব্যি ঘুরে বসে সংসার চালিয়ে দিতে পারে। কেন রে সাপ, তুই গর্তের ইঁদুর খেদিয়ে ঢুকিস? ধান তো তোমার খাবার নয়। তবে? ব্যাং খাও। পুঁটি খাও। উচ্চিংগে খাও। আমরা তো ভাগ বসাতে যাচ্ছি নে। কেন রে সাপ তোর এই মতি?

সাপ নয়। খগেন নস্কর এসে তার ঘাড় ধরলো। গণ্ডী খুঁটি বসাতে বসাতে সে এগোচ্ছিল। ওরে হাড়হাবাতে হারামজাদা। শেষে পরের ধানে পোদ্দারি? ভাত জোটে না?

ভরা দুপুর। খটখটে পুকুরপাড়। বাতাস নেই। গাছপালাগুলো স্থির। গর্তথোড়ে বুঁদ ধানগাছগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে। হাজরা তার বাপকে লক্ষ্য করে খোন্তা তুললো। বাঞ্চোৎ, বাপ হয়ে লজ্জা করে না তোর? নিজির বড় ব্যাটারে একটা বিদ্যেও না শিখিয়ে একা-একা খাল গাড়ে মজা মারা? দেখাচ্ছি তোরে আজ—

হাজরা খোন্তা ছোড়ার আগেই খগেন ধরে ফেললো। ছেলেরা তার চেয়ে বেঁটে। রোগা। ভীতু। বজরা যে-সব যন্তর নিয়ে ঘোরে, ভীতু বলেই তো অত যন্তর ওর কাছে। খুন করবি নাকি?

হাজরা মরীয়া হয়ে আধলা ইঁট কিংবা ভাঙা ঝামা খুঁজছিল। আজ সে দূর থেকে ইট মেরেই এ গুণীন শালার নিকেশ করবে। চেঁচিয়ে বললো, লজ্জা করে না বাঞ্চোৎ। জন্ম দিয়ে আর দেখার নাম নেই। নিজির খুশিমতো নিজির ক্ষ্যামতা দেখানো? বাণ মারা? মুখুণ্ডী করা? আজ শালা তোর নিকেশ দেখে তবে আমি যাবো। লাল চোখ করে সাপের স্যাঙাত হয়ে খালপাড়ে বেড়ানো?

খগেন হাজরার হাত থেকে খোন্তাখানা কেড়ে নিয়েছিল। তার এখনো অনেকখানি জলকরে গণ্ডী-খুঁটি পোঁতা বাকি। কাল মনসার পুজো। যা কিছু আজই করতে হবে তাকে। খুব ঠাণ্ডা গলায় বললো, কি চাই তোর?

তোমার মুণ্ডু।

আমার মাথা তুই কি খাবি?

চিবোবো বাঞ্চোৎ! তোমার জন্যিই আমাদের ফেমিলির এ দশা। বলতে বলতে ইঁট হাতে হাজরা নস্কর হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলে পুকুরের উঁচু পাড়ে বসে পড়লো। ঠিক তখনি গম্ভীর ভোঁ দিয়ে একখানা লোক্যাল দক্ষিণ মালঞ্চ ছাড়লো।

আমার জন্যি বজরা তার কাটে?

তোমার জন্যি বাপ। শুধু তোমার জন্যি। আমরা কেন ভদ্দরলোক হলাম না? কেন চোর আমি? কেন বজরা গুণ্ডামি করে বেড়ায়? মা কেন আদ্ধেক দুধি আদ্ধেক জল ঢালে? কাছারি বাজারে বজরায় কেন মেয়েছেলে থাকে?

সব আমার জন্যি বাপ?

তোমার জন্যি বাবা। তুমি এত বিদ্যে জানো। তুমি আমাদের ভদ্দরলোক বানাতি পারতে। তোমার কোন বিদ্যে আমাদের কাজে আসে নি। ইচ্ছে করলিই পারতে—

ইচ্ছে কি এমনি এমনি হয় বাবা? একতরফার ইচ্ছেয় সব হয়?

তোমাদের ইচ্ছেগুলো সব কোথায় ছিল? তোমরা নাও নি কেন আমারে?

তুমি তো পথ দেখাও নি বাপ।

খগেন নস্কর ভালো করে তার বড় ছেলেকে দেখলো। ধামাটা উপুড় হয়ে পড়েছিল। গর্তখানা আধখোলা। সে নিশ্চিত যে, মেছুনী মেছোকে সঙ্গে নিয়ে দূর থেকে তার এই দশা রসিয়ে-রসিয়ে দেখছে। দেখে—তারিয়ে-তারিয়ে হাসছে।

এই নে। বলে খোন্তাটা এগিয়ে দিল খগেন। ধামাটা তোল। কি চাই তোর?

কিচ্ছু না।

বাড়ি যা। ছেতলায় মোটা খুঁটিতে, দাওয়ার তিন গেরো উচুতে বাঁশের খোপে নোট আছে। খুচরো আছে। সব নে যা তুই। নিয়ে আনন্দ কর হাজরা। তুই আমার বড় ব্যাটা। কাল রান্নাপুজো। জুয়ো খেলিস। বউমারে একখানা শাড়ি দিস। যত ইচ্ছে ওড়া। তোর ছানাপোনা নিয়ে কলকেতা দেখে আয় বাপ।

হাজরা উঠে দাঁড়িয়ে খগেনের চোখে তাকালো। লালচে। পিঁচুটি বোঝাই। এ ক-মাসে মাথায় আধখানা পেকে ওঠার যোগাড়।

আর এক পলকও দাঁড়ালো না হাজরা। ছুটে ধামাটা নিয়েই খোন্তা কাঁধে তুললো, এখানে যদি ধান থাকে বাপ? গর্তটা তো বড়—

কেউ হাতাবে না—ভয় নেই। আমি তো আছি। অন্য সময় এসে ধান থাকলে নে যাবি বাপ।

তাহলে তুমি দেখো।

দ্যাখবো 'খন। ভয় নেই তোর বাপ। যাঃ। এই বেলা যা।

খানিকবাদে খগেন দেখলো, ধামা কাঁখে তার বড় ব্যাটা কাঁধে

খোস্তা বাগিয়ে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটছে। যত তাড়াতাড়ি ছেঁচতলায় পৌঁছানো যায়।

ফাঁকা তল্লাটে একা একাই হো হো করে হেসে উঠলো খগেন। এর নাম টোপ। সংসারের টোপ। ভাল থাকার লোভ। আরাম। আনন্দ। ফুর্তি। আরও কত কি। দাড়িবাবা বলতো—আমের নীল মাছি আমেই লেগে থাকে খগেন। যার টোপ যাতে লাগে বাবা। কখনো লোভ করিস নে।

আমি তো কোনোদিন লোভ করি নি বাবা। আমার জেবনটাই তো ঘোরাঘুরিতে গেল।

আচমকাই টোপ কথাটা খটাং করে খগেনের ডান কানের নিচেতে রগে গেঁথে গেল। ভরা দুপুরে সে বাঁশবাগানের মোটা পাকা কঞ্চি ভেঙে তাতে সুতো বঁড়শি ঝোলালো। ফাতনার পেখম ডাঁটিও সঙ্গে ছিল। কখন কোনটা কাজে লাগে তো বলা যায় না।

সবই সঙ্গে-সঙ্গে বাঁশের খোলে থাকে খগেনের। থাকে কিছু শেকড়। মূল। পাতা আর লতা। তিনটে কড়ি। দাড়িবাবার দান। কূল ভেঙে পারে ওঠার কড়ি। সব সময়ে কোমরে থাকে খগেনের।

বর্ষার পর ভরা খাল। খানিক হাতড়াতেই এই ল্যাটাছানা উঠে এলো। ততক্ষণে এক ধড়িবাজ বেজি গণ্ডীটানা জলে মরে ভেসে উঠেছে।

বঁড়শি বিঁধিয়ে ল্যাটাকে ছাড়তেই মরণযন্ত্রণায় তির-তির করে খালের জলে ঘুরতে লাগলো সে। সেই সঙ্গে ফাতনা ভাসে। ডোবে। আবার দৌড়ে বেড়ায়।

মেছুনী তখন মেছোকে নিয়ে বাঙাল পুকুরের ঘাটলায়। পুরু শ্যাওলা। ভাত খুঁটে খেতে এসে এক মৌরল্লা তো আঁতকে উঠে ভেসে ওঠার যোগাড়। স্বয়ং যম। তাও একজন নয়। দুজন।

মোরল্লাটাকে হিসেবে না এনে মেছুনী বললো, কে ছেড়ে দিল তোমায় ?

মেছো বললো, আমি তখন দিশেহারার দশায়। অমাবস্যা, পূর্ণিমায় দফে দফে বিষ গেলে নেয়। কী অপমান মেছুনী—সে যে কী অপমান—কী বলবো তোমায়। গুচ্ছের কচি আর তেতো ব্যাঙ দিত।

খেতে ?

কি করবো? উপোস দেব ?

কাউকে দংশাতে পারলে না ?

সে সুযোগ পাই নি। আর যখন ছাড়া পেলাম—তখন ওসব মনেও ছিল না।

আমি আজ খগেনকে কামড়াবো।

কাল মনসার পুজো। আজই কামড়াবে ?

হ্যাঁ। আজই। ওর খালপাড়ে ঘোরাঘুরি আমার আর সহ্য হয় না মেছো।

দেখো মেছুনী—আমি তো বেরিয়ে এলাম—তুমি না শেষে নিজিই আটকে বসে থাকো !

আমি সিধে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে ওর গোড়ালির ওপর ছোবলাবো। ওষুধ করেও কোনো কাজ হবে না ওখানে।

আয় মেছুনী। আরেকটু নিচে যাই। এখানটায় জল বড় গরম।

চল না, নাল ফুলের গোড়ায় গিয়ে গা জুড়োই।

সারা দেশের লোকজন আজ চালতা থেঁতো করছে। চিংড়ি দিয়ে ওদের ডালনায় বাড়ির বউ-ঝিদের কেরামতি দেখানোর রাস্তা। তাই খুব যোগাড়যন্তর। তার সঙ্গে মাছের কাঁটা দিয়ে কচুর শাক। কেউ বা কাঁটার অভাবে ছোলা দিয়ে ঘ্যাঁট পাকাবে। যার যেমন অবস্থা।

হা-ঘরে মানুষজন পাড়াপড়শীর কাছে নেমন্তন্নর আশায় দিন গুনছে। কারও নেমন্তন্ন পাওয়া সারা। কেউ এখনো পায় নি। তাই ভাসা পুকুরে তাল কুড়োতে নামবে কাল সকালে। বড় বড় দীঘির বুকে সারারাত ধরে বৃষ্টির ভেতর পাকা তাল পড়ে ভাসতে থাকে।

বিকেলের পড়তি-আলোয় সবই মনে পড়ছিল খগেনের। সূর্য খসে পড়ার আগে ফেলে আসা পৃথিবীর কথা মানুষের মনে ভাসে। এই সময় নরম আলোর ভেতর অন্ধকার পর্দা হয়ে ঝুলতে থাকে। খগেনের মনে হলো, কে আসে নি। কেন যে সে আসে নি, সে জানে না। তা কি মৃত্যুর জন্যে? অসুখের জন্যে? আর হয়তো কোনোদিনই দেখা হবে না।

তখন বাঙাল পুকুরে নাল ফুলে জটা-শেকড়ে মেছুনী বললো, জানো—আমার বিষটা বোধহয় মাথায় উঠছে। মাথাটা ভার-ভার ঠেকছে।

ভালোই তো। একটু আগে বললে না—আজই দংশাবে।

কখন বললাম? কাকে দংশাবো?

কি হয়েছে তোমার মেছুনী? ঘাটলার শ্যাওলায় শুয়ে শুয়ে বললে। এর ভেতর ভুলে গেলে?

আমার যে কি হয়েছে মেছো, কি বলবো। এই একটুক্ষণ আগের কথাও মনে রাখতে পারি নে। সব কথায় মনে হয়—কে যেন আসে নি। কার যেন আসার কথা ছিল।

আমি তো ফিরে এসেছি। তবু চিন্তা যায় না কেন?

শিবানী বললো, তুমি এখানে? এই অন্ধকারে? আমি সারা খালপাড় খুঁজে খুঁজে তবে এখানে এলাম।

কেন? কি দরকার?

তুমি কি ওই এক মেছুনীর পেছনেই চার চার মাস কাটাবে?

এ কথা জানতে কে পাঠালো? বিপিনবাবু?

না। আমি নিজেই জানতে এসেছি।

ছ্যাখো শিবানী। তুমি শহুরে মেয়েছেলে—

ও কথাটা অসভ্য। বলো—মেয়ে—মহিলা।

তা যাই বলো। তুমি তোমার ধম্মপতিকে ছেড়ে দিলে। আর সে ছেড়ে দিয়ে গেল মেছোকে।

ও কথা শুনে আসছি আজ দু-মাস! তুমি কেমন গুণীন? একটা গর্তের জীবকে ধরতে এতগুলো দিন যায়?

আমি তো খারাপ গুণীন না শিবানী। তুমি আমার সঙ্গে শঙ্খ হয়েছো ক-দিনে?

শিবানী আর কথা বলতে পারলো না। এখন খালপাড় একদম অন্ধকার। কয়েকটা ডিমের খোলা কুড়িয়ে রেখেছে খগেন। জোনাকি বেরোলেই কয়েক মুঠো ধরে ওই খোলাগুলো বোঝাই করবে। তারপর খালের জলে ভাসাবে। কালোকিষ্টি অন্ধকারে এই ভাসন্ত আলো মাছকে ডাকে। মেছুনীকে ডাকবে।

আমার জীবন তো কোনোদিকে যায় না খগেন।

কোন্ দিকে চাও?

সে আমিও জানি না। আমিও বুঝি না। কার রিকশো সাইকেলে এখানে চলে এলাম? কার রিকশো সাইকেলে চলে যাবো জানি না খগেন। ভোরে ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারি, মাথার ভেতর এতক্ষণ একটা নগর বসেছিল। একখানা উঠোন। একটা গাছতলা। সব মুছে যায় মাথা থেকে। দিদি নাকি আমার শাড়িতে চোরকাঁটা পেয়েছে। তাও সারারাত ঘুমোনোর পর।

শিবানী কথা শেষ করতে করতে দেখলো, খালপাড়ে ঘাসের ওপর বসে থাকা খগেন নস্কর কখন উঠে দাঁড়িয়েছে। ওপারের রেল প্ল্যাটফর্ম থেকে ছিটকে পড়ে এক খাবলা আলো খগেনের গালে, কপালে। লম্বা সাঁড়াশি আঙুলে খগেন শিবানীর দু-খানা হাত ধরতেই সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, লাগছে। ছাড়ো বলছি।

খগেনের গলা ততক্ষণে এলিয়ে গেছে। হাতদু-খান. কাঁপছিল।

উঃ। লাগে। ছাড়ো—

তুই কে? তুই কে সুমতি?

খগেন নিজেই এত কাঁপছিল—তার আলগা হাত গলে শিবানী বাড়ির দিকে ছুটে গেল।

স্টেশন বাজারে ডিমভাজার খুব চল। সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা ডিমের খোলাগুলোয় এখন জোনাকিরা ভাসছে। কিছু উড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসছিল। একবার অল্প বয়সে ধোসারহাটের নোনা খালে বোয়াল মাছ ধরার টোপ দিতে দেখছিল খগেন। বড় বড় নোনা বোয়াল। তারা এই জোনাকি ভর্তি ডিমের খোলা নিশুতি রাতে গিলে বসে থাকত। তখুনি ভাগ্য ঠিক হয়ে যেত বোয়ালের। বঁড়শি যে খোলার ভেতরেই! দূরে সুতো। খোঁটায় বাঁধা।

কলকাতার লাস্ট ট্রেন চলে গেল।

আকাশের আর বোধহয় বৃষ্টি নেই। রেল বাজারের চায়ের ধোঁয়ার রঙ মেঘ ভাসলেই খগেন বুঝে নেয়—শরৎকাল। তার অজান্তেই কাশের গোছা কখন ডাঙা জায়গায় হেলে পড়ে। রাত বাড়লে একটু-একটু ঠাণ্ডা চুরি করে বাতাসে ঢুকে যায়। এই তো এখন আকাশ বাতাসের হাল হদিস। দিনে একটা সূর্য। ভয়ঙ্কর তিনি এখনো। রাতে পক্ষ বুঝে আলো, নয় তো অন্ধকার।

খগেন ভাসন্ত ডিমের খোলার আলোর উলটো দিকে অন্ধকারে খালের জলে নেমে পড়লো। এই তো এখন খালের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাবে। এই তো আহারে বেরোবার টাইম এসে গেল। কচি ব্যাঙ, ভুঁইপোকা—তোমরা সবাই তফাত যাও। এখন বাতাসের সঙ্গে চেরা জিভ মিশিয়ে দিয়ে ওরা আশপাশের গন্ধ নেবে। সবাই সাবধান। আমি দক্ষিণ মালঞ্চর খগেন নস্কর। আমার কথা আলাদা।

কিন্তু তোমরা সাবধানে থেকো। নয়তো আহার হয়ে যাবে। কোনো কানা ফড়িং যদি বাসা হারিয়ে থাকো, তবে আমার পরামর্শ শোন। এই খগেন নস্করের কথাটা মনে রেখো। কোনো আলে গিয়ে বোসো না। আলকেউটেরা আগে আগে খবর পায়। খবর্দার পাখনা মেলে দিয়ে ফরফর কোরো না। ওরা সব টের পেয়ে যায়। সারা চরাচরের বাতাসে ওরা এখন চেরা জিভের ছুরি বসাবে।

খগেন খালের কিনারায় হাঁটু ডুবিয়ে এগোচ্ছিল। একটা বড় তেচোকো মাছ পায়ের বুড়ো আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গেল। ওকেও সাবধান করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল খগেনের। অল্প জলে থাকিস নে এখন। গহীনে যা—গহীনে—

বাঙাল পুকুরের কাছাকাছি এসে খালের বুক উঁচু। এখানটায় সে আনমনা ছিল। নিজি নিজিই হাসছিল। বাবু বটে বিজনবাবু। যেমনি তিজী—তেমনি সাধু। এলো দাপটে। ফিরেও গেল দাপটে। একটা রাতে কী এমন করে গেল লোকটা? এত দিনের বিয়ের গাঁটছড়াটি নিজিই কেটে দিয়ে চলে গেল। কোনো হা-হুতোশ নেই। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পড়লো তো পড়লো—একদম সিধে। বাজে পোড়া সুপুরি গাছ! দমাস!

খগেনের চোখের নিচে বিদ্যুৎ খেলে গেল। হেই! এসে গেছিস? আয় বাবা—আজ ধরা দে।

মেছো বাঙাল পুকুরের উঁচু পাড়ে। মেছুনী সিধে নেমে গিয়ে খগেনের কাপড় তোলা উরুতে তাগ্ করেছিল। ফসকে গেল। বাঞ্চোত কোথাও এক জায়গায় এক লহমার বেশি দাঁড়ায় না। মেছুনী ফুঁসে উঠলো। জলে ভেসে তাগ্ করলে শরীর তো সরে যাবেই। ফণা যত ওপরে তোলা— তার ভারে শরীর ততটাই প্রায় তলিয়ে যায়। চেরা জিভখানা হিসিয়ে উঠলো।

খগেন অন্ধকার খালের বুকে শুনতে পেল— ধরা দেবার কথা

তো তোর আজ! খালপাড়ে যম এসে বসে আছে তোর জন্যে।

খগেন নস্কর তার চারদিকের জলে শ্বেত আকন্দের তিন পাতার মূলী ডাল ছড়িয়ে দিয়ে বললো, কার সঙ্গে কোন্ ভাষায় কথা বলতে হয়—ভুলে যেও না মেছুনী। জীবন আর কদ্দিনের! থাকে তো কথা।

অত ভাল-ভাল কতা তোর মুখি মানায় না খগেন।

কেন? আমি জাত খোয়ালাম কোথায়?

আমায় শঙ্খের ভান দেখালি। আর নিজি গিয়ে শুকনো বাঁশ পাতায় ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেটার সঙ্গে শ[illegible]হলি! ছিঃ!

ওটা অসভ্য কথা। বল মেয়ে, কিংবা মহিলা।

খগেন কথায় কথায় ভুলিয়ে রাখছিল মেছুনীকে। আর অন্ধকার আকাশ থেকে হাত বাড়িয়ে লোভ, বিভ্রমের জিনিসপত্তর জলে নামিয়ে দিচ্ছিল। অন্ধকারের যে জায়গাটায় মেছুনী—তার চারপাশে খগেনের সভ্য তৈরি বানানো সব মাছ খলবল-খলবল করে জল মাতিয়ে ছিল। তাদের কুচো লেজের ঝামরে খালের জল গুঁড়ো হয়ে আকাশে উঠছিল। খগেন নিজের মনেই বললো, নে! এবার নিজির লোভের সঙ্গে যুদ্ধ করে মর। মুখে বললো, মেছোকে আনলি নে কেন সঙ্গে? জোড়ে ধরা দিতিস আজ। দিনটা ভালো দিন। আজ ভাদ্র সংক্রান্তি।

এ কথা শুনে মেছো আর দাঁড়ায়! সে ক-মাস মানুষের জেলখানায় থেকে এসেছে। সে জানে—মানুষ ভগবানের এক আজব জীব—যে একাই দুনিয়ার সবটুকু লুটেপুটে খেতে চায়। পুকুরপাড়ের নিচু দিকটায় দুপুরবেলা জিওলগাছের গোড়ায় হাজরা যে গর্ত খুঁড়েছিল—সেটা ফাঁকা পেয়ে মেছো ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। এ গর্তের বাসিন্দার এখন ফিরতে-ফিরতে সেই শেষরাত।

মেছুনী আজ গোড়া থেকে সাবধান। এই খলবলানো কুচো

মাছের ঝাঁকের বাইরে বেরিয়ে এলো সে। যে-করেই হোক খগেন নস্করকে আজ সে দংশাবে। বিষের ভারে মাথাটা সামান্য ভারি।

মেছুনী এবার তার শরীটা জলের কিনারায় পাঁক মাটিতে বিড়ে পাকিয়ে নিল। তারপর ভেতরকার পেশীগুলোকে একটার সঙ্গে আরেকটার গুঁতো দিয়ে মেছুনী তার মাথাটা ঢেলে দিতে গেল খগেনের বাঁ হাতের পাতায়। ওর শরীরের ওই জায়গাটাই ছিল সবচেয়ে কাছে।

এবারও ফসকে গেল খগেন। জলে-ভেজা পাঁক মাটি পেছল ছিল। তবু গায়ের ভরে মেছুনী পাঁকের ওপর থেবড়ে বসে নিয়েছিল। কিন্তু কাজ হয় নি। ছোবলের সময় শরীরটাই সরে যায় তার।

এভাবে ছোবলানো বিপজ্জনক। কেননা, একটুর জন্যে বেঁচে গেল মেছুনী। খগেন পড়তি ছোবলের পেছন থেকে মাথাটা ধরতে গিয়েছিল তার। খপ করে।

কিন্তু পারে নি। খগেনেরও পা হড়কে গিয়ে বিপত্তি। ডান বগলের নিচে খানিকটা মাংস বোধহয় খুবলে গেল। কে জানতো—ওখানে এক কচি বাবলা ডালপালায় কাঁটা সাজিয়ে বসে আছে।

এমন সময় ফাঁকা আকাশের নিচে মালগাড়ির শান্টিংয়ের আওয়াজ খালের জলেও তির-তির করে ছড়িয়ে পড়লে দুজনই একসঙ্গে প্রায় বলে উঠলো—একি! মালগাড়ি এসে গেল?

তখন ডিমের খোলায় জোনাকিগুলো দলা পাকিয়ে বসেছিল। দু-একটা খোলা তীরে ধাক্কা খেয়ে উলটো পাকে ঘুরে আসছিল। খগেনের বানানো খলবলানো মাছের ঝাঁক এবার বাতাসে আঁশটে গন্ধ চারিয়ে দিল।

মেছুনীর চেরা জিভ আপনাআপনি বাতাসে বেরিয়ে এলো। রাত তো কম নয়। রোজ রাতের সেই মালগাড়িটাও এসে গেল। ভাদ্র সংক্রান্তির রাতখানা তো এক সময় ফুরোবেই।

খগেন তার তৈরি মাছের ঝাঁকটাকে বঁড়শি গাঁথা ল্যাটাপোনার

দিকে চালান করলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই আঁষটে গন্ধটাও সেদিকে রওনা হলো। খগেন জানে এ গন্ধে মেছুনীর অস্থির হয়ে পড়ার কথা।

পথ দেখাতে ভাসন্ত সব ডিমের খোলা। এখানে এখন বোয়াল নেই। থাকলে নির্ঘাত গিলে বসতো জোনাকি সমেত। মালগাড়িটাও এসে গেল। কালই সকালে রান্না পুজো। আবার কাল বেলা বাড়তে বাড়তে বাতাস গরম হয়ে উঠবে।

মেছুনী একবার ভাবল, নেমে পড়ি খলবলানো মাছের ঝাঁকে। কি হবে একটা মানুষকে দংশে? ওদের তো কিছুদিন পরেই হরিবোল দিয়ে নিয়ে যায়। আমি শুধু শুধু এগিয়েছি কেন? আমার কি আর কোনো কাজ নেই?

খগেন নস্কর এবারো মেছুনীকে ভালো হতে দিলো না। তার সাঁড়াশি হাত মেছুনীর মাথায় চেপে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে মেছুনী মাথাটা পাঁক মাটিতে মিশিয়ে দিলো। খগেনের সারা শরীরের ঝোঁক পেতে তার হাতের চার আঙুলের সাঁড়াশি পাঁকে গেঁথে গেল। নিজে ঠেলা দিয়ে উঠে দাঁড়াবে, না মেছুনীর মাথাটা শক্ত করে ধরবে? পাঁকে ছিল ঝিনুক ভাঙা। আঙুলের ডগায় ফুটে গিয়ে ফিনিক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। অন্ধকারে রক্ত একটু ঠাণ্ডা হয়। মেছুনী গলে গিয়ে জলে নামলো। এই-ই চাইছিল খগেন। গণ্ডী টানা জল। তবে তেজের জিনিস। তায় মাথায় বিষ। সহজে কাবু হবার নয়।

মাছের ঝাঁক তখন ভাসন্ত ডিমের খোলার আলো ধরে ধরে বঁড়শি-বেঁধা ল্যাটাপোনার গায়ে গায়ে। এই-ই চাইছিল খগেন। বাতাসে আঁষটে গন্ধ ভুর-ভুর করছে। মেছুনীটা আবার শ্বেত আকন্দের খুঁটি উপড়ে দিলো না তো লেজে? তাহলে খগেনের মহা বিপদ। তখন সে একদম আড়াল-আবডাল ছাড়াই মেছুনীর মুখোমুখি হয়ে পড়বে।

দক্ষিণ মালঞ্চ রেল স্টেশনের সাইডিংয়ে দু-খানি মালগাড়ি ঘটাং শব্দ তুলে কাঁপতে কাঁপতে জুড়ে গেল।

আর ঠিক তখনই। ঠিক তখন।

জলের ভেতর অবিশ্যি কোন সময়েই পুরোপুরি কাজ হবার নয়। তবু মেছুনী বিষের দাঁতটা খগেন নস্করের বাঁ পায়ের গোড়ালিতে চেপে ধরেই তুলে নিল। নিজের চোখ দিয়েই বুঝলো, ওখানটায় জল অন্য রকম হয়ে গেল।

খগেন চেঁচিয়ে উঠলো, এ তুই কোথায় দংশালি? ও বেহায়া! এ তুই কোথায় দংশালি?

ততক্ষণে মেছুনী সরে গেছে। সরে গিয়ে জোনাকিদের একটা আলোর দলার পাশে ভেসে উঠলো। সামনেই সেই খলবলানো ঝাঁক। তাতে এমনই আঁষটে গন্ধ—মেছুনীর শরীরটা নেচে ওঠার জোগাড়।

খগেন নস্কর জল ভেঙে উঠে পোড়ো পাঁজার দিকে ছুটলো। জানি মরবো না। জলের ভেতরে বিষ জলেই ভেসে যায়। শরীরে ভরা যায় না—ভরলেও সামান্য। তবু সাবধানের মার নেই। খগেন বসে পড়ে অন্ধকারের ভেতরেই চওড়াপাতার বেঁটে গাছটাকে চিনতে পারলো। হাত দিয়ে-দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাছটাকে টেনে তুললো শেকড়সুদ্ধ। তারপর ঝুরঝুরে মাটি সমেত শেকড়টা দাঁতেই থেঁতো করলো। সে-অবস্থায় জায়গামত শেকড়ের রস লেপে দিতে দিতে খগেন বুঝলো, তার মুখটা তেতো হয়ে যাচ্ছে। নাকের সামনে একটা মিষ্টি গন্ধ এসে থমকে দাঁড়িয়ে ভাসছে। মেছো কেউটের বিষের স্বাদ সে কোনোদিন নেয় নি। তাই জানে না। এই কি বিষক্রিয়ার শুরু? নাঃ! বোধহয় শেকড়ে কোনো ভুঁইপোকা ছিল। সেটা চিবিয়ে খেয়েই এই দশা।

মেছুনী যতবারই খলবলানো মাছের ঝাঁক থেকে একগাল তুলে নিতে চায় মুখে, ততবারই শুধু জল উঠে আসে। মাছ কোথায়? ও মনসা! এও যে দেখি ভানের ঝাঁক। ও খগেন? কোথায় গেলে? আহার নিয়েও মস্করা? কোন হায়া নেই তোমার? একটুও না? ছিঃ! ছি।

শেষবারের মতো আরেকটা চেষ্টা করলো মেছুনী। দেখার ইচ্ছে—সত্যিই কি খগেন নস্কর এতটা দুর্জন? আগাগোড়া ঝাঁকটাই জাল? কী খলবলানো! কী সুন্দর আঁষটে বাস বাতাসে চারিয়ে যাচ্ছে। ওরে গুণীনের গুষ্টি মারি আমি। মাছ কোথায়? বলে ফিরতে থাকে মেছুনী। তখন। খলবলানো ঝাঁকের ভেতর বঁড়শি-বেঁধা ল্যাটাপোনাটা তখন মেছুনীর গরাসে চলে গেল। আর অমনি মেছুনী টের পেল—কোথায় ঝাঁক ধরে খলবলানো? কোথায় আঁষটে গন্ধ? সব ভোঁ-ভোঁ। তার টাকরায় তখন ল্যাটাপোনার রক্ত মাখানো বঁড়শির উকো—সরে আসতে গিয়ে আরও বিঁধে গেল। ও মেছো রে—

মেছুনীর চোখ ভরে খালের পাঁক ঘোলা জল ঢুকে গেল। সারা তল্লাট তখন তার গলার সেই—ও মেছো রে—ডাকে ভরে যাচ্ছিল।

আবার মালগাড়ির ঘটাং একটা শব্দ এসে পোড়ো পাঁজায় আছড়ে পড়লো। এই দু-মাস খগেন নস্কর খালপাড়েই রাত কাটায়। রাত নেই, দিন নেই—এই খালপাড়ই সই। হাতঘড়ি নেই খগেনের। এই তিন নম্বর ঘটাংয়ের পরেই চিত্ত বাঘের খোটিতে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে মাছের নীলাম শুরু হয়। কথা বোঝা যায় না এতদূর থেকে। কিন্তু অন্ধকার আকাশে শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে। খানিকবাদেই তখন কলকাতার জন্যে পয়লা লোক্যাল এসে দাঁড়াবে।

খগেনের মাড়ি অব্দি তেতো। নাকটা ভারি বোধ হচ্ছিল। অথচ নাকের সামনেই সেই মিষ্টি গন্ধটা এসে দাঁড়িয়ে আছে। এটাই কি যমের গায়ের গন্ধ? খগেন চমকে উঠলো। ওই তো বঁড়শি ঝোলানো কঞ্চিখানা দুলছে। ওরে! সেই তো ধরা দিলি। মেছুনী—সেই তো দিলি।

খগেন নস্কর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারলো না। কেউটেকাটা

পা গোড়ালির গিঁটে কোন কাজই করছে না। এ মা! এতদিনে তা হলে কী বিত্তে আর হলো? পা গেল। এর পর তো উরুও যাবে।

খগেন নস্কর বুঝলো, সারা শরীরটা পড়ে যাবার আগে তার কঞ্চির গোড়ায় যাওয়া দরকার। বিপিনবাবু চার মাস ধরে বসে আছে তার জন্যে। এই মেছুনী পাকড়াও হলেই দেখাশোনা গর্ত-গুলোয় গিয়ে খগেন নস্কর দাঁড়াবে। তাই তো কথা হয়ে আছে। শেষে ছিপসুদ্ধ বঁড়শি না টেনে নিয়ে পালায়। ও মেছুনী, কঞ্চির গোড়া আধ হাত পোঁতা।

খগেন নস্কর হেঁটে এগোতে পারলো না। তাকে হেঁচড়েই এগোতে হচ্ছিল। উঃ! মেছুনীর কী লাফালাফি! দেখার মতো।

টাকরায় বেঁধা বঁড়শির বাঁকটা রক্তে মাখামাখি। ও মেছো রে—

জলের ওপর মাথা তুলে মেছুনী দেখলো, তার ডাকে অন্ধকার ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

বাঁশ বাগানের সামনে পাথুরে আলে পা বেঁধে খগেন-নস্কর উলটে পড়লো। একদম সিধে। যেভাবে বিজনবাবু পড়েছিল। যার কোন ইচ্ছে নেই। খগেনের মাথা দিয়ে গধাং করে আওয়াজ বেরিয়ে এলো। চোখে ছুঁচলো ঘাসের ডগা ঢুকে গেল। খগেন বুঝলো, চোখের রক্তে ঘাস মচমচ করছে। এবার তার মাথাটা তোলা দরকার। কিন্তু তখন তখনই পারলো না।

পারলো যখন—পরিষ্কার ভোরবেলা এসে গেছে তখন। পয়লা লোক্যাল এতক্ষণে কলকাতায়। খগেনের চোখ একটু একটু করে খুলে ঘাসের ডগাদের ভেতর দিয়ে যা দেখতে পেল, তা অনেকটা এই রকম—

এখনো খালপাড়ে লোকজন বেরিয়ে পড়ে নি। লাল সুরকির রাস্তায় ভগবানের রিকশোখানা এসে সবে দাঁড়ালো। সীটে কেউ নেই। মেছুনী লাট খেয়ে ডাঙায় উঠে ছিপের গায়েই টোন সুতোর অনেকটা জড়িয়ে ফেলে—এখন মরা ল্যাটাপোনার টোপ গালে

শূন্যে ঝুলছে। লেজ পাঁক মাটির কাছাকাছি। সেখানে তিন বেজি বসে। মুখে হাসি-হাসি ভাব। এক একজন শূন্যে লাফিয়ে উঠছে—আর অমনি মেছুনীর লেজের এক খাবলা খসে পড়ছে। তাতে সঙ্গে সঙ্গে মেছুনী যন্ত্রণায় দলা পাকিয়ে গুটিয়ে গেল। সেভাবে থাকা যায় না বলেই আবার ঝুলে পড়ে সোজা হলো। আর অমনি আরেকটা বেজি পেছনের পায়ের ভর দিয়ে আবার লাফ দিল।

আবার। আবার এইভাবে। ফের গোড়া থেকে আবার। গুটিয়ে সোজা হওয়া। ভোরের ময়লা আলোয় হাসিমুখে নির্জনে তিন বেজির সেকি টুইয়ে-টুইয়ে লাফানো। আর মাংস খাবলানো। দৃশ্যটা বড় ভাল লাগলো খগেনের।

খগেনের চোখ বুজে এলো। বুজতে গিয়েও ঘাসের ডগা চোখে লেপটে যাচ্ছে। তার ভেতরেই খগেন নস্কর টের পেল, শরতের জ্যোচ্ছনায় শিবানী এসে পাকুড়তলা পার হলো। নিশুতি রাতের আলোয় চোরকাঁটা টের পাচ্ছে না। কিন্তু পুট পুট করে গেঁথে যাচ্ছে শাড়ির পাড়ে। কাল ভোরে বাঁজা মেয়েছেলেটা ঠিক ধরে ফেলবে। এখন শিবানী পোড়ো বাড়ির উঠোনে।

খগেন নস্করের মাথার ভেতর দিয়ে একগোছা কাশ হেলে পড়লো। তার তখনো একটু একটু মনে পড়ছে—আজ রান্না-পুজো। নাল ফুলের মালা। সারারাত রান্না গেছে কাল বেস্পতির। এখন শুকনো থালার ছাইয়ে সব সাজিয়ে দেবে। চালতের অম্বল। মাছের কাঁটা দিয়ে কচুর শাক। ওলের ডালনা।

আরেক গোছা কাশ খগেন নস্করের মাথার ভেতর আবার হেলে পড়লো।

তখনো ফুর্তিবাজ তিন বেজি টুইয়ে-টুইয়ে লাফাচ্ছিল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে। বেড়ে ফুর্তিবাজ তো।